ভাঙা বাংলা ও বাংলা সাহিত্য

অশ্রুকুমার সিকদার

সাহিত্যলোক
৩২/৭ বিডন স্ট্রীট। কলিকাতা-৭০০০০৬

প্রথম প্রকাশ ডিসেম্বব ২০০০

প্রকাশক নেপালচন্দ্র ঘোষ
সাহিত্যালোক । ৩২/৭ বিডন স্ট্রীট। কলিকাতা - ৭০০০০৬

প্রচ্ছদ পূর্ণেন্দু পত্রী

মুদ্রাকব নেপালচন্দ্র ঘোষ
বঙ্গবাণী প্রিন্টার্স। ৫৭/এ কাববালা ট্যাঙ্ক লেন। কলিকাতা - ৭০০০০৬

কম্পিউটাব টাইপসেটিং মা দুর্গা লেজাব
৩৭ জি সি ঘোষ বোড। কলিকাতা - ৭০০০৪৮

সন্তান না হয়েও যারা আমাদের সন্তান, সেই দুই ভাই

শ্রীউজ্জ্বল চৌধুরী

ডা. উন্মেষ চৌধুরীকে

'আমার সন্ততি স্বপ্নে থাক।'

মুখবন্ধ

আমরা যদিও পূর্ববঙ্গের ফরিদপুর জেলার মানুষ, বর্তমান বাংলাদেশের কুষ্টিয়া জেলায় ছিল আমাদের আদিবাড়ি, তবু বাবা যেহেতু স্বাধীনতার অনেক আগে থেকে দার্জিলিং জেলায় চাকরি করতেন, তাই দেশভাগজনিত ছিন্নমূল হওয়ার বেদনা আমাদের পরিবারকে ভোগ করতে হয়নি। কিন্তু দেশভাগ নিয়ে ইতিহাস, দলিল, সৃজনাত্মক সাহিত্য পড়তে-পড়তে, অনেক আত্মীয়-বন্ধুর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা শুনতে-শুনতে, এইসব উচ্ছিন্ন মানুষ সম্বন্ধে এক তীব্র মমত্ববোধ আমার মনে জেগে ওঠে। মনে হতে থাকে আমিও যেন বাবা-মা'র হাত ধরে ভিটেমাটি ছেড়েছিলাম। সেই মনে হওয়া থেকেই লেখা হয়ে গেল এই বইয়ে সংকলিত প্রবন্ধচারটি।

অনেক আত্মীয় বন্ধু ছাত্র এই বই লেখার উপকরণ বই ও কাগজপত্র জোগাড় করে দিয়েছেন। তাঁদের নামের তালিকা দীর্ঘ; তার মধ্যে আছেন উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সঞ্জয় রায় ও শেখ রহিম মণ্ডল, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের তনয়া গুপ্ত ও রণজিৎ মিত্র, শিলিগুড়ির সমীর ও মন্দিরা ভট্টাচার্য, সমরেশ রায়, শেষাদ্রিশেখর বসু, বিপুল দাস, পল্লবকান্তি রাজগুরু, সত্য মণ্ডল, শেখর বন্দ্যোপাধ্যায়, রাহুল মিশ্র, তপন মজুমদার, জলপাইগুড়ির প্রসাদ রায়, কোচবিহারের শিখা আর সুব্রত রুদ্র, শিলচরের বিকাশ রায়, ঢাকার মীজানুর রহমান। বীতশোক ভট্টাচার্য ও শচীন দাশ দু-তিনটি বইয়ের খবর দিয়েছেন। নীতীশ বিশ্বাস একটা বড়ো বইয়ের দুই খণ্ড পুরোপুরি জেরক্স করে পাঠিয়েছিলেন এবং ধার দিয়েছিলেন অন্যকিছু বই। এই বইয়ের ক্ষেত্রেও শঙ্খ ঘোষের কাছে আমার অনেক ঋণ। কিছু পুরনো কাগজ পাঠিয়ে দিয়েছিলেন প্রবীণ সাংবাদিক নিরঞ্জন হালদার। এইসব মানুষের কাছে ঋণী থাকতেই আমার ভালো লাগবে।

সংকলিত প্রবন্ধের সবগুলি স্বয়ংসম্পূর্ণ। সেইকারণে অনেক সময় একই কথা বারবার চলে এসেছে। সেইসব পুনরুক্তির দোষ মোচন করতে গেলে প্রবন্ধগুলির বর্তমান কাঠামো বজায় থাকত না। তাই

সেই উদ্যোগ নিইনি। প্রবন্ধগুলির প্রথম প্রকাশের তথ্য প্রবন্ধগুলির নীচে দেওয়া থাকছে। তবে প্রথম প্রবন্ধদুটি পত্রিকায় প্রথম প্রকাশের পর গ্রন্থবদ্ধ হওয়ার সময়, নতুন তথ্যাদি সংযোজিত হওয়ায়, অনেক সম্প্রসারিত হয়েছে। দীর্ঘতম প্রথম প্রবন্ধটি এই বইয়ের মূল প্রবন্ধ, অন্য রচনাগুলি এই সন্দর্ভের পরিপূরক। এই অতিদীর্ঘ লেখাটি পত্রিকার এক কিস্তিতে ছেপে 'অনুষ্টুপ' সম্পাদক অনিল আচার্য ও তাঁর সহযোগী গৌতম সেনগুপ্ত আমার কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন। দ্বিতীয় প্রবন্ধটি সত্যপ্রিয় ঘোষ স্মারক বক্তৃতা হিসাবে ২২ মে ২০০৫ তারিখে নেহরু চিলড্রেন্স মিউজিয়ামে পাঠ করি। প্রথম সত্যপ্রিয় ঘোষ স্মারক বক্তৃতা দেবার জন্য আমাকে আমন্ত্রণ করায় আমি কালপ্রতিমা সাহিত্যসংস্থার কাছে, বিশেষভাবে নলিনীকুমার চক্রবর্তীর কাছে ঋণী। তৃতীয় রচনাটি লিখিয়ে নিয়েছিল 'মল্লার'-সম্পাদক শুভময় সরকার। শেষ প্রবন্ধটি গোড়ায় লেখা হয়েছিল বড়ো আকারে। রবিবাসরীয় আনন্দবাজারে, স্থানাভাবে, তার একটি সংক্ষিপ্তরূপ সেমন্তী ঘোষের আগ্রহে প্রকাশিত হয়। আর এই প্রবন্ধটি বাংলা সাহিত্য নিয়ে নয়, উর্দু একটি উপন্যাসকে কেন্দ্র করে লেখা। কিন্তু সেই উপন্যাসটির সঙ্গেও যেহেতু জড়িয়ে আছে বঙ্গবিভাজনের ইতিহাস, তাই অন্য তিনটি রচনার সঙ্গে এই রচনাটিকেও একই গ্রন্থে সংকলিত করা হলো।

সূচিপত্র

ভাঙা দেশ, ভাঙা মানুষ, বোবা বাংলা সাহিত্য

গোড়ায় আত্মপক্ষ সমর্থন

গোড়াতে উদ্ধৃত করছি মে ১৯৬৬-তে লেখা কবি অডেনের একটি কবিতা। কবিতার নাম Partition ; যে ইংরেজ বিচারপতি স্যার সিরিল র‍্যাডক্লিফের উপর ভারত ভাগ করে ভারত ও পাকিস্তানের সীমানা নির্ধারণের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল তাঁকে নিয়ে কবিতাটি।

Unbaised at least he was when he arrived on his mission
Having never set eyes on this land he was called to partition.
Between two peoples fanatically at odds,
With their different diets and incompatible gods....
But in seven weeks it was done, the frontiers decided,
A continent for better or worse divided.

এই বিভাগের দুটো অংশ। একটা অংশ বঙ্গবিভাজন।

এই প্রবন্ধে আমি আলোচনা করেছি ১৯৪৭ সালের বঙ্গ-বিভাজনের ফলে লক্ষ লক্ষ হিন্দু-বাঙালির পূর্ববঙ্গ ত্যাগ করে ভারতে চলে আসা নিয়ে এবং সেই বিরাট বিপর্যয়কর ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় পশ্চিমবঙ্গে লেখা বাংলা সাহিত্য কীভাবে লিখিত হয়েছে বা লিখিত হয়নি, তাই নিয়ে। কেন এই একপেশে লেখা, কেন বঙ্গ-বিভাজনের ফলে ভারত থেকে পূর্ববঙ্গ/পূর্ব পাকিস্তানে মুসলমান-বাঙালির চলে-যাওয়া নিয়ে এবং তার প্রতিক্রিয়া পূর্ববঙ্গে লেখা বাংলা সাহিত্যে কীভাবে পড়েছে, তা নিয়ে লিখছি না, তার জবাবদিহি গোড়াতেই দেওয়া দরকার। প্রথম অসুবিধা, পশ্চিমবঙ্গে বসে পূর্ববঙ্গের সব সাহিত্যিক নমুনা এবং দেশভাগ সম্পর্কিত ইতিহাস বিষয়ে ও সমাজতত্ত্ব বিষয়ে সব গুরুত্বপূর্ণ কাজ জোগাড় করা কঠিন। দ্বিতীয়ত, তথ্য যা বলে সেই নেহাত-সত্যের স্বীকৃতি আছে রফিকুল ইসলামের 'বাংলাদেশের সাহিত্য : ছোটগল্প' প্রবন্ধে। "যে বিপুল সংখ্যক বাঙালি হিন্দু পূর্ববঙ্গ ত্যাগ করে গেছে, ততো বাঙালি মুসলমান উদ্বাস্তু হয়ে পূর্ববঙ্গে আসেনি—এসেছে অবাঙালি মুসলমান মোহাজের। ফলে দেশভাগজনিত মানবিক সমস্যাগুলো তেমন গুরুত্ববহ হয়ে ওঠেনি

সাহিত্যিকদের কাছে।" এই কথার সমর্থন মেলে ১৯৫১-র আদমশুমারিতে। গোটা পাকিস্তানে ভারত থেকে সত্তর লক্ষ মোহাজের বা শরণার্থী গিয়েছিল। তার মধ্যে তেষট্টি লক্ষই গিয়েছিল পশ্চিম পাকিস্তানে। পূর্ব পাকিস্তানে গিয়েছিল মাত্র সাত লক্ষ—তার মধ্যে একটা বড়ো অংশ অবাঙালি মুসলমান। ১৯৫৬ সালে প্রকাশিত পশ্চিমবঙ্গ সরকারের একটি রিপোর্ট জানায় যে, এই সাত লক্ষের মধ্যে পাঁচ লক্ষই আবার ফিরে এসেছিল। অন্যদিকে যে কথা বিধানচন্দ্র রায় মন্ত্রিসভার পুনর্বাসন-মন্ত্রী রেণুকা রায় *My Reminiscences* গ্রন্থের And Still They Come অধ্যায়ে লিখেছিলেন, সেই কথাটা হলো, মোটের উপর 'The exodus was an one-way affair.' পূর্ববঙ্গ/পূর্ব পাকিস্তান/বাংলাদেশ থেকে ভারতে মানুষের চলে আসা এক 'continuing process'। অমলেন্দু দে বাঙালি-হিন্দুর পূর্ববঙ্গ ত্যাগের পর্বগুলি চিহ্নিত করেছেন। ১৯৪৬-৪৭ সালে নোয়াখালির ত্রিপুরার দাঙ্গায়, ইসলামিক রাষ্ট্রে হিন্দুদের দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকে পর্যবসিত হওয়ায়, হায়দ্রাবাদের মতো পূর্ববঙ্গেও ভারত আক্রমণ করতে পারে এই অনুমানে হিন্দুদের উপর অত্যাচারের ফলে তাদের দেশত্যাগ ঘটে। ১৯৫০-৫১ সালে দাঙ্গার ফলে বন্যার জলস্রোতের মতো বাঙালি-হিন্দুর নির্গমন ঘটে।

লিয়াকত-নেহরু চুক্তি পশ্চিমবঙ্গের মুসলমানদের নিরাপত্তা দেয়, অনেক চলে যাওয়া মুসলমান-বাঙালি ফিরেও আসে। Still They Come : Migrants in the Post-Partition Bengal নিবন্ধে রণবীর সমাদ্দার জানিয়েছেন, ১৯৪৭ সালে যে মুসলিমরা পূর্ববঙ্গে চলে গিয়েছিল তাদের অনেকে বা তাদের অনেক উত্তরপুরুষ আবার এদেশে ফিরে এসেছে। পূর্ববঙ্গের হিন্দুদের ক্ষেত্রে তা হয় না। বরং যারা চলে এসেছে তাদের সম্পত্তি সম্পর্কে কঠোর আইন প্রবর্তিত হয়। ১৯৫২-৬০ কালপর্বে বাঙালি হিন্দুর দেশত্যাগ ঘটে পাসপোর্ট প্রবর্তনের ফলে, দাঙ্গার ফলে, সম্পত্তি বিক্রয় সংক্রান্ত আইনের ফলে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আবুল বারকাত ও শফিকউজ্জামানের সমীক্ষায় বলা হয়েছে, শত্রু সম্পত্তি ও অর্পিত সম্পত্তি আইনের দরুন সংখ্যালঘু সম্প্রদায় কুড়ি লাখ একরের বেশি জমি হারিয়েছে। বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পরেও এই নির্গমণ অব্যাহত। খালেদা জিয়ার নির্বাচন-জয়ের পর এই চলে আসা হিন্দুর পরিমাণ আরো বেড়ে গেছে। ১৯৯৪ সালে *Holiday* পত্রিকায় প্রকাশিত The Missing Population প্রবন্ধে মহীউদ্দিন আহমদ এই সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়েছিলেন যে, ১৯৭৪ সাল থেকে গড়ে প্রতিদিন ৪৭৫ জন হিন্দু বাংলাদেশের ভূখণ্ড থেকে হারিয়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশ হিন্দু-বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ প্রকাশিত 'বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক বৈষম্য : তথ্য ও দলিল' সংকলনে প্রমাণ করা হয়েছে 'হিন্দুদের কমে যাওয়ার কারণ মাইগ্রেসন ছাড়া আর কিছু নয়।' আর মাইগ্রেসনের কারণ? মতিউর রহমান 'নিজদেশে পরবাসীদের কথা' প্রবন্ধে লিখেছেন, "এটা সত্যি অত্যন্ত দুঃখজনক যে পাকিস্তানের সাম্প্রদায়িক দ্বিজাতিতত্ত্বকে প্রত্যাখ্যান করে জাতীয়তাবাদ ও

অসাম্প্রদায়িক চেতনার ভিত্তিতে স্বাধীন বাংলাদেশ গঠিত হলেও হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রতি বৈষম্য ও নির্যাতনমূলক ব্যবস্থার অবসান হলো না।" শরিফা বেগমের হিশাব অনুসারে ১৯৬১-৭৪ এই পনেরো বছরে বাংলাদেশ থেকে, এই 'Malthusian nightmare' থেকে, পনেরো লক্ষ মানুষের নির্গমন ঘটেছে। গ্রেম্ হুগো তাঁর Illegal International Migration in Asia প্রবন্ধে বাংলাদেশের এক কোটি হারিয়ে যাওয়া মানুষের কথা বলেছেন। এই বাংলাদেশত্যাগী মানুষেরা, শুধু হিন্দু নয়, মুসলমানও, বেশিরভাগ ভারতে এসেছে। রণবীর সমাদ্দার তাঁর *The Marginal Nation* বইতে বলেছেন, বাংলাদেশের রাষ্ট্রনায়ক ও জাতির বিবেকরক্ষকদের কাছে, এই বহির্গমন 'an embarrassment to be philosophized, explained away, or to be glossed over in silence.' আর এই পরিস্থিতিতেই তৈরি হয়েছে ভারতের প্রাক্তন নির্বাচন কমিশনার শেষনকে নিয়ে 'ফ্লপ্‌মাস্টার শেষন' নামের এই ছড়া,

তোর তাতে কী
আমি যদি বাংলাদেশী হই
বাড়ি আমার রাজসাহীতে
ইন্ডিয়াতে রই।

দীর্ঘ দিন ধরে এই হারিয়ে যাওয়া প্রতিফলিত হয়েছে পূর্ববঙ্গ/পূর্ব পাকিস্তান/বাংলাদেশের আদমশুমারিতে। ১৯৫১ সালে হিন্দু ছিল ঐ দেশের মোট জনসংখ্যার ২২%, ১৯৬১ সালে ছিল ১৮.৫%, ১৯৭৪ সালে তা নেমে দাঁড়ায় ১৩.৫%। ১৯৮১ সালে আরো নেমে হয় ১২.১%। ১৯৯১ সালের জনগণনা অনুসারে বাংলাদেশে হিন্দু এখন মোট জনসংখ্যার মাত্র ১০.৫%। 'বাংলাদেশ বাদ দিয়ে পৃথিবীর কোথাও সংখ্যালঘুর হার গত পঞ্চাশ বছরে এক-তৃতীয়াংশে নেমে আসেনি।' বাংলাদেশের কিছু মুক্তবুদ্ধি শ্রদ্ধেয় বুদ্ধিজীবীর আন্তরিক উদ্যোগ সত্ত্বেও মনে হয় আগামী পঞ্চাশ বছরে বাংলাদেশে সংখ্যালঘু সমস্যার একটা চূড়ান্ত সমাধান হয়ে যাবে, ধর্মান্তরের মাধ্যমে অথবা শেষ হিন্দুর বহির্গমনের মাধ্যমে। জিল্লুর রহমান সিদ্দিকীর নেতৃত্বে গঠিত বুদ্ধিজীবীদের সমিতির অত্যন্ত প্রশংসনীয় অনুসন্ধান ও প্রতিবেদন সত্ত্বেও, শাহরিয়ার কবিরের মতো অকুতোভয় সাংবাদিকের বহুমুখী উদ্যোগ সত্ত্বেও, তসলিমা নাসরিনের কিছু-কিছু রচনা, সালাম আজাদের 'হিন্দু সম্প্রদায় কেন বাংলাদেশ ত্যাগ করছে?' বা কঙ্কর সিংহের 'রাষ্ট্র সাম্প্রদায়িকতা ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়' ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশ সত্ত্বেও রাষ্ট্রীয় সংবেদনশীলতার কোনও লক্ষণ নেই। হতাশ হয়ে তাই শাহরিয়ার কবির বলেছেন, 'শুধু লেখার যদি কোন কার্যকারিতা থাকত তাহলে সাম্প্রদায়িকতা ও মৌলবাদ বাংলাদেশ থেকে বহু আগেই নির্মূল হয়ে যেত।' ('অনুষ্টুপ' বিশেষ শীত সংখ্যা ১৪০৮) তাঁর প্রবন্ধের পুরো নাম 'বাংলাদেশে মৌলবাদ ও সাম্প্রদায়িকতা বিরোধিতায় রাজনৈতিক দলগুলির ভূমিকা', কিন্তু আসলে তিনি দেখিয়েছেন

রাজনৈতিক দলগুলির ভূমিকাহীনতা। তাই বাংলাদেশের বহুল-প্রচারিত প্রগতিশীলতা অনেকটাই বিবৃতিনির্ভর, এমন ভাবেন কবি নির্মলেন্দু গুণ। এই অনুযোগ যে পুরোটা সত্য নয় তার প্রমাণ শাহরিয়ার কবিরের মতো মানুষ রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগে অভিযুক্ত হয়ে জেলে যেতে দ্বিধা করেননি। বি এন পি, জামাতে ইসলামি তীব্রভাবে সাম্প্রদায়িক; আওয়ামি লীগ, কম্যুনিস্ট পার্টি দ্বিধাগ্রস্ত। সংখ্যালঘুরা আওয়ামি লীগকে ভোট দেয়, সুতরাং অত্যাচার করে তাদের তাড়ালে আওয়ামি লীগের ভোটে ভাঙন ধরবে, এমন কথা ভাবে আওয়ামি লীগের বিরোধীরা। পরিস্থিতির এতোটাই অবনতি হয়েছে যে, সংখ্যালঘুরা অনুরোধ করছে তাদের ভোটাধিকার প্রত্যাহার করে নিয়ে তাদের শান্তিতে থাকতে দেওয়া হোক।

অন্যদিকে ১৯৪৭ সালে ও পরবর্তী কয়েক বছরে যাও-বা বাঙালি-মুসলমান ভারত ছেড়ে চলে গিয়েছিল, তার পরে যে আর যায়নি তার প্রমাণ পশ্চিমবঙ্গের জনগণনা। ১৯৬১ সালে পশ্চিমবঙ্গে মুসলমানের সংখ্যা ছিল সমগ্র জনগোষ্ঠীর ২০%, ১৯৭১ সালের আদমশুমারিতে সেটা হয় ২০.৪৬%, ১৯৮১ সালে ২১.৫১%, ১৯৯১ সালের আদমশুমারিতে সেটা অনেকটা বেড়ে দাঁড়ায় ২৩.৬১%, ২০০১ সালের জনগণনায় ২৫% ভাগের সামান্য বেশি। বাবরি মসিজদ ধ্বংস, গুজরাটের নরহত্যা, পূর্ববর্তী অনেক দাঙ্গা সত্ত্বেও, হিন্দুত্ববাদীদের ইতর উত্থান সত্ত্বেও, বিপরীত নির্গমন সৌভাগ্যবশত ঘটেনি। ফলে পূর্ববঙ্গ থেকে পশ্চিমে বিপুল পরিমাণ ছিন্নমূল উদ্বাস্তু মানুষ আসায় যে সংকট তৈরি হয়, পশ্চিম থেকে পূর্ববঙ্গে তার চেয়ে অনেক কম মানুষ চলে যাওয়ায় তেমন সংকট তৈরি হয়নি। সংকট তৈরি হয়নি বলে, তার অভিঘাতও পূর্ববঙ্গের সাহিত্যে উল্লেখযোগ্যভাবে পড়েনি। যতো বাঙালি-মুসলমান চলে গিয়েছিল তার চেয়ে অনেক অনেক বেশি বাঙালি-হিন্দু চলে আসায় পূর্ববঙ্গে উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনেও অসুবিধা হয়নি। সংখ্যাতে যেমন তারা অনেক বেশি চলে এসেছিল, তেমনি হিন্দুরা তুলনায় অনেক বেশি সম্পদশালী ছিল; ফলে তাদের জমিতে, বাড়িতে, চাকরিতে, পেশায় পূর্ববঙ্গে চলে আসা মুসলমানদের সহজেই পুনর্বাসিত করা গিয়েছিল। ঋত্বিক ঘটকের 'সড়ক' গল্পে ইজরাইল পূর্ব পাকিস্তানে চলে গিয়েছিল। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্পে লম্পট প্রমথ'র প্ররোচনায় দাঙ্গা বাধলে মুসলিম পরিবারকে দেশত্যাগ করতে হয়েছিল। পশ্চিমবঙ্গে আগত ছিন্নমূল হিন্দুদের মতো তাদের দীর্ঘ দিন কোন ক্যাম্পে থাকতে হয়নি, পুনর্বাসনের জন্য সংগ্রাম করে জবরদখল কলোনি গড়ে নতুন করে ভিটেমাটির সংস্থান করতে হয়নি।

দীপেশ চক্রবর্তী তাঁর *Economic and Political Weekly*-তে প্রকাশিত Remembered Villages প্রবন্ধে নির্ভুলভাবে বলেছেন, ১৯৪৭ সালে পূর্বপাকিস্তানের বাঙালি মুসলমানের কাছে দেশবিভাগের চেয়ে বড়ো হয়ে উঠেছিল স্বাধীনতা। তাদের কাছে এই স্বাধীনতা ছিল দ্বিগুণ স্বাধীনতা, একবার ইংরেজের শাসন

থেকে, সঙ্গে-সঙ্গে হিন্দুদের আধিপত্য থেকে। ফলে দেশভাগের বেদনার চেয়ে উল্লাসই ফুটে উঠেছিল বেশি। 'দুই যুগের দেশ মানুষের কথা' প্রবন্ধে হাসান আজিজুল হকের দুঃখ থেকে গেছে, 'দেশবিভাগ বিষয় করে যে মহৎ সাহিত্য সৃষ্টি হতে পারত, তা আর হলো না।' দেশভাগের ফলে মুসলমান মধ্যশ্রেণী লাভবান হয়েছিল, আর এই মধ্যশ্রেণীর দৃষ্টি দিয়েই এই ঐতিহাসিক ঘটনাকে দেখা হয়েছে। আর এই লাভবান মধ্যশ্রেণীর ভিতর থেকেই লেখকেরা উঠে এসেছিলেন। দেশভাগের ক্ষতির চেয়ে তাৎক্ষণিক শ্রেণীগত লাভটাই বড় হয়ে উঠেছিল তাঁদের চোখে।

বাংলা ছোটগল্পের দেশভাগ নিয়ে তাঁর গবেষণাসন্দর্ভে সনজিদা খাতুন আরো দুটি কারণের কথা উল্লেখ করেছেন, যে-দুটি কারণে দেশভাগের ঐতিহাসিক ঘটনা পূর্বপাকিস্তানে পশ্চিমবঙ্গের সমান অভিঘাত তৈরি করেনি। তিনি বলেছেন, 'বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন এবং আটান্নর সামরিকশাসন জারিতে পূর্ব বাংলায় দেশবিভাগের গুরুত্ব অনেকটাই হ্রাস পেয়েছিল।' স্বাধীনতা-দেশবিভাগের পর-পর ভাষা-আন্দোলন ভাঙা-বাংলার যন্ত্রণা থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নিয়েছিল। এ ছাড়াও সনজিদা খাতুন দেশভাগের প্রসঙ্গ নিয়ে লেখা বাংলা ছোটগল্প খুঁটিয়ে আলোচনা করে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে, পূর্ববঙ্গের, অন্তত প্রথম দিককার রচনায়, দেশবিভাগের বেদনা ও প্রাসঙ্গিক মানবিক সমস্যার চেয়ে বড়ো হয়ে উঠেছিল 'নবীন পাকিস্তানকে সব পেয়েছির দেশে পরিণত করার স্বপ্ন কল্পনা।' এই প্রসঙ্গে পড়া যেতে পারে সেলিনা হোসেনের 'গায়ত্রীসন্ধ্যা' গল্প। স্বামী আলি আহমেদের সঙ্গে রেলগাড়িতে পাকিস্তানে পালাচ্ছে পুষ্পিতা। নবজাত পাকিস্তানে সে তার নবজাতকের জন্ম দিতে চায়। নবজাত শিশুর কান্নায় গল্প শেষ হয়। ট্রেন রাজসাহী পৌঁছোয়। সদ্যোজাত শিশুর নাম হবে প্রতীক আহমেদ, পাকিস্তান জন্মের প্রতীক। এই আশাবাদ পুব বাংলার দেশভাগের গল্পের বৈশিষ্ট্য। যশোধরা বাগচী ও শুভরঞ্জন দাশগুপ্ত সম্পাদিত *The Trauma and the Triumph* সংকলনের অন্তর্গত মেঘনা গুহঠাকুরতা তাঁর Uprooted and Divided প্রবন্ধে লক্ষ করেছিলেন, 'the voices of Hindu migrants from East Bengal have been more prominent than Muslim migrants from West Bengal.' তিনি বলেছেন, এই তারতম্যের কারণ অনুসন্ধানের বিষয়। এতক্ষণ যা বলা হলো তার থেকেই কারণটা জানা হয়ে যায়। অনুসন্ধানের আর কোনও প্রয়োজন থাকে না।

মুসলিম লীগের ডাকা প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবসে The Great Calcutta Killing শুরু হয়। লীগের প্রচারপত্রে বলা হয়, "এই রমজান মাসেই ইসলাম ও কাফেরদের মধ্যে প্রথম প্রকাশ্য যুদ্ধ শুরু হয়।... আল্লার ইচ্ছায় পাকিস্তান লাভের জন্য নিখিল ভারত মুসলিম লীগ এই রমজান মাস ঠিক করিয়াছেন।" কলকাতার দাঙ্গায় মুসলমান পক্ষে নেতৃত্ব দেয় মূলত পশ্চিমা মুসলমানেরা, মীজানুর রহমানের ভাষায় 'কলকাত্তিয়া

কুট্টি ও খোট্টা সম্প্রদায়ের লোক।' সতীর্থ রবিনের ঠাকুমা মৃতের স্তূপ থেকে উঠে পালাতে গেলে আক্রান্ত হয়ে মারা যান। মীজানুরের মনে হয়েছিল যেন তার নিজের দাদীমা মারা গেলেন। লুটতরাজ চলতে থাকে, 'সারা রাস্তা জুড়ে বিভিন্ন দেহভঙ্গির পোড়া লাশ।' ব্যায়ামবীর বিষ্টু ঘোষ মীজানুরদের পরিবারকে বাঁচিয়ে ছিলেন। আর প্রধানত মুসলমান ট্রাম-শ্রমিকরা বাঁচিয়েছিল ভিক্টোরিয়া কলেজের হিন্দু ছাত্রীদের। শিল্পী প্রকাশ কর্মকার 'আমি' নামক স্মৃতিকথায় জানিয়েছেন, মানুষকে মেরে ফেলার অনাচারবৃত্তি সেই কৈশোরে তিনি রপ্ত করেছিলেন। প্রকাশের সহ-দাঙ্গাবাজ নিজের শিল্পী বাবার মৌলবি মডেলকে প্রকাশের সামনেই হত্যা করে। প্রকাশ কর্মকার অকপটে জানিয়েছেন, আক্রান্ত মুসলমান শিকার 'খোঁচাতে খোঁচাতে নিথর না হওয়া পর্যন্ত' তারা নৃশংসতা চালিয়ে যেতেন। এইসব অনাচারের পর প্রকাশ ন্যাকা সেজে লিখেছেন, "মুসলমানরা তাদের সর্বস্ব ছেড়ে কেন চলে গেল, এতো লোক তাদের ঘর বাড়ি সংসার, আবাল্য স্মৃতি ছেড়ে, রুজি-রোজগার ছেড়ে কোথায় চলে গেল বা চলে যাচ্ছে, তা হঠাৎ বুঝতে পারলাম না। মায়াহীন এই পরিত্যক্ততা আমি মানতে পারিনি।" অদ্ভুত এই মানতে না পারা! প্রকাশ কর্মকারদের জন্যেই মীজানুরেরা ভারত ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন, কমলালয়া কলকাতা ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন। তবু হিন্দু যতো সংখ্যায় চলে এসেছিলেন, মুসলমান বাঙালি তার চেয়ে অনেক কম চলে গিয়েছিলেন।

এইসব কারণ বিবেচনা করে, এই প্রবন্ধে দেশভাগের ফলে বাঙালি-হিন্দুর পূর্ববঙ্গ ত্যাগ ও তার অভিঘাতে পশ্চিমবঙ্গে লেখা বাংলা সাহিত্য নিয়েই আলোচনা করতে হলো বাধ্যত।

অখণ্ড কম্যুনিস্ট পার্টির ভূমিকা

বাঙালির ইতিহাসের সম্ভবত সবচেয়ে বড়ো ঘটনা বঙ্গসংহার। সেই মর্মান্তিক ঘটনা বিষয়ে পূর্বের বাংলা সাহিত্যে যতোটা নীরবতা, পশ্চিমের বাংলাসাহিত্যে ততোটা নয়। কিন্তু এখানেও এক মোটামুটি নীরবতা বিরাজমান। দেশভাগ-দেশত্যাগ জনিত বিষয়ে এই বাংলার সাহিত্যের মৌনের কারণ বুঝতে গেলে অখণ্ড কম্যুনিস্ট পার্টির ভূমিকা জানা দরকার। কম্যুনিস্ট পার্টি মনে করত মুসলিম লীগের তোলা পাকিস্তানের দাবি ন্যায্য এবং যুক্তিসংগত। কারণ, এই দাবির পিছনে রয়েছে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের স্বাভাবিক তাড়না। জাতি আর ধর্মকে সমার্থক করে দেওয়া হলো উদ্ভটভাবে। ১৯৪২-এর আগস্টে *People's War*-এ প্রকাশিত প্রবন্ধে গঙ্গাধর অধিকারী 'recognition of the right of separation of individual nationalities'-র কথা বলেন। বাঙালি-হিন্দু আর বাঙালি-মুসলমান হয়ে গেল স্বতন্ত্র জাতি, পাঞ্জাবের মুসলমান আর পাঞ্জাবের শিখ হয়ে গেল পৃথক জাতি, দ্বিজাতিতত্ত্ব অনুসারে। এই তত্ত্ব অনুসারে মধুসূদন আর বঙ্কিমচন্দ্র স্বতন্ত্র

'nationality'-র মানুষ, যেহেতু একজন খ্রিস্টান, অন্যজন হিন্দু। কাজী আবদুল ওদুদ তাঁর *Creative Bengal* বইতে এই কথাই বলেছিলেন। ভারতীয় খ্রিস্টান যদি নিজেকে ইউরোপীয় খ্রিস্টানের 'kith and kin' মনে করে, সেটা যেমন 'absurd' হবে, তেমনি উদ্ভট হবে যদি বাঙালি মুসলমান নিজেকে সিন্ধু আর পাঞ্জাবের মুসলমানের সঙ্গে এক জাতিভুক্ত মনে করে। অথচ কম্যুনিস্ট পার্টি দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে 'মুসলমান জাতি'-র আত্মনিয়ন্ত্রণের জন্য পাকিস্তান দাবিকে সমর্থন করল। *Facts are Facts* গ্রন্থে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের কংগ্রেস নেতা ওয়ালি খান এই বলে দুঃখ করেছেন যে ইংরেজের ধনবাদ ও ঔপনিবেশিকবাদের স্বার্থে পরস্পরের শত্রু ইসলাম আর কম্যুনিজম্ সহযোগী হিশেবে কাজ করল। অখণ্ড কম্যুনিস্ট পার্টি মুসলিম লীগের পাকিস্তান দাবি সমর্থন করায় রফিক জ্যাকারিয়া হতবাক হয়েছিলেন। তিনি *The Price of Partition* গ্রন্থে লিখেছেন কম্যুনিস্ট পার্টি 'Put an intellectual cover on a reactionary communal demand.' ১৯৪৭ সালের গোড়ায় হাউজ অব কমন্সে ভারতের স্বাধীনতা সম্পর্কিত আইনের আলোচনার সময় কম্যুনিস্ট সদস্য কোনি জিলিয়াকাস জিন্নাহ্র পক্ষ সমর্থন করে বলেন 'new Indian Constitution should make provision for sub-nationalities', আর তাঁকে জোরালো সমর্থন করেন কম্যুনিস্টবিদ্বেষী, সাম্রাজ্যবাদী, ভারতের স্বাধীনতার শত্রু চার্চিল। 'আমার পার্টিও এই তত্ত্বের ভিত্তিতে দেশভাগে সায় দিয়েছে', সখেদে বলেছেন মণিকুন্তলা সেন, তাঁর 'সেদিনের কথা' বইতে। মোহিত সেনও তাঁর আত্মজীবনী *A Travellar and the Road*-এ বলেছেন, মুসলিম লীগের পাকিস্তান দাবিকে কম্যুনিস্ট পার্টির সমর্থন করা ছিল 'serious error'। মোহিত সেন বলেছেন, পাকিস্তান দাবির পক্ষে মুসলিম লীগের চেয়ে ভালো ওকালতি করেছিল তাঁর পার্টি। মজা হলো এই দুই জাতিতত্ত্বের কথা প্রথম উচ্চারণ করেছিলেন বীর সাভারকর হিন্দু মহাসভার সম্মেলনে মুসলিম লীগের লাহোর সম্মেলনের আড়াই বছর আগে। অবশ্য তারও অনেক আগে আলিগড়ের এম এ ও কলেজের অধ্যক্ষ বেকের প্রভাবে স্যার সৈয়দ আহমেদ উপলব্ধি করেন, ভারতের মুসলমানেরা এক স্বতন্ত্র জাতি। মুসলমানেরা স্বতন্ত্র জাতি, তাদের পৃথক বাসভূমি চাই, এমন কথা কবি-দার্শনিক স্যার মুহম্মদ ইকবালের রচনায় মেলে। এই উদ্ভট দ্বিজাতিতত্ত্ব খণ্ডিত হয়ে গেল কিন্তু ডেমিনিয়ন হিসেবে পাকিস্তানের আত্মপ্রকাশের আগেই, ১৯৪৭ সালের ১১ আগস্টে মুহম্মদ আলি জিন্নাহ্-র বিখ্যাত বক্তৃতায়, যেখানে তিনি 'secular, multi-religious' পাকিস্তানের কথা বলেছেন। তখন তিনি আর হিন্দু-মুসলমানকে স্বতন্ত্র 'nation' বলছেন না, বলছেন 'community'। সাংবাদিক সুখরঞ্জন সেনগুপ্ত তাঁর 'বঙ্গসংহার এবং' গ্রন্থে ১৯৪৭ সালের সেপ্টেম্বরে লেখা সোহরাবর্দি ও চৌধুরি খালিকুজ্জামানের পরস্পরকে লেখা যে চিঠি উদ্ধৃত করেছেন, তাতে বোঝা যায়,

একমাস যেতে-না-যেতে দ্বিজাতিতত্ত্ব বিষয়ে লীগের দুই প্রধান নেতার মনে সংশয় জন্মেছিল। এই উদ্ভট দ্বিজাতিতত্ত্ব আবার খণ্ডিত হয়েছে বাংলাদেশের আত্মপ্রকাশে, মুসলিম জাতীয়তাবাদের তত্ত্বকে ভেঙে বাঙালি জাতীয়তাবাদের প্রতিষ্ঠায়। এই দ্বিজাতিতত্ত্ব আবার খণ্ডিত হয় যখন পাকিস্তানের সিন্ধুপ্রদেশের মুসলমানেরা উদ্বাস্তু হয়ে আসা বিহারি মুসলমানদের পুনর্বাসন ঠেকাতে 'বিহারি ঠেকাও' আন্দোলন গড়ে তোলে। আর এখনো দ্বিজাতিতত্ত্ব প্রতিদিন খণ্ডিত হচ্ছে বাংলাদেশ থেকে ইসলাম ধর্মাবলম্বী মানুষের ভারতে অনুপ্রবেশে। রণবীর সমাদ্দার তাঁর পূর্বোল্লিখিত প্রবন্ধে যথার্থই বলেছেন, "The Muslim 'comes back', he/she has to negate partition, the Muslim homeland could not provide sustenance and succour."

অমলেন্দু সেনগুপ্ত অবশ্য তাঁর 'উত্তাল চল্লিশ, অসমাপ্ত বিপ্লব' গ্রন্থে জানাচ্ছেন, "১৯৪৬ সালের এপ্রিলে ভারত সফরে এসে রজনী পাম দত্ত সরাসরি দেশবিভাগের বিরোধিতা করেন এবং মুসলিম লীগের পাকিস্তান দাবিকে প্রতিক্রিয়াশীল বলে চিহ্নিত করেন।" অমলেন্দু সেনগুপ্ত আরো জানান, কম্যুনিস্ট পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেসে রণদিভে বলেন, রজনী পাম দত্ত-ই প্রথম মুসলিম লীগের সাম্প্রদায়িক চরিত্র সম্বন্ধে পার্টিকে সজাগ করেন এবং কংগ্রেস ও লীগকে একই আসনে বসানোর চেষ্টাকে খণ্ডন করেন। ভারতে কম্যুনিস্ট আন্দোলনের, দলিল সংকলনের পঞ্চম খণ্ডে ক্যাবিনেট মিশনের প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে জুলাই ১৯৪৫-এ প্রকাশিত রজনী পাম দত্তের প্রবন্ধে বলা হয়েছে, "The unity of India is desirable from a progressive point of view. The demand to base nationality on religion encourages communal antagonism and is doubtful from a practical point of view, since the Hindus and Muslims are in reality intermingled all over India." ১৯৪৭ সালের জুলাই মাসেও তিনি বলেছেন, 'proposed partition of the Mountbatten Plan ... has nothing in common with national self-determination.' পার্টির চিন্তায় দোলাচল ছিল। ১৯৪০ সালে মে-র গোড়ায় ৭ নম্বর নিউজ লেটারে পাকিস্তান প্রস্তাবের বিরোধিতা করা হয়েছে, কারণ 'it is a slogan to mislead the Muslim masses.' কিন্তু ১৯৪২ সালের সেপ্টেম্বরে গঙ্গাধর অধিকারী Pakistan and National Unity নামে যে রিপোর্ট পেশ করেন তার সিদ্ধান্ত, পাকিস্তান দাবি হলো 'It was a just democratic demand'. যেহেতু এই দাবির ভিত্তি হলো 'Muslim nationalities'-এর আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার। এই সিদ্ধান্তই কম্যুনিস্ট পার্টির সিদ্ধান্ত হিসেবে বজায় থেকে যায়। ১৯৪৬ সালের ১৬ আগস্ট মুসলিম লীগের ডাকা প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবসে, যে-দিনকে সোহরাবর্দি মুক্তির দিন বলেছিলেন, সেই দিনে হিন্দু-মুসলিম ঐক্য ও শ্রমিক শ্রেণীর সংহতি অটুট রাখার

অজুহাতে কম্যুনিস্ট পার্টির নেতৃত্বাধীন শ্রমিক ইউনিয়নগুলি ধর্মঘটে সামিল হয় এবং প্রকারান্তরে মুসলিম লীগকেই সমর্থন করে। মীজানুর রহমান ছিলেন কলকাতা হত্যাকাণ্ডের প্রত্যক্ষদর্শী। তিনি তাঁর 'কৃষ্ণ ষোলোই' বইতে অনুমান করেছেন, শ্রমিকশ্রেণীর বিরাট অংশ মুসলমান হওয়ায় ও পাকিস্তান দাবির প্রতি তাদের প্রচ্ছন্ন সমর্থন থাকায় কম্যুনিস্ট পার্টি এই অবস্থান নিয়েছিল। আর 'আমার জীবন ও বিভাগপূর্ব বাংলাদেশের রাজনীতি' গ্রন্থে মুসলিম লীগ নেতা আব্দুল হাশিম জানিয়েছেন, 'বাংলার কম্যুনিস্ট পাটির সঙ্গে মুসলিম লীগের বামপন্থীদের সম্পর্ক খুবই ভালো ছিল।' ১৯৪৬-এর নির্বাচনে কম্যুনিস্ট পার্টি ও মুসলিম লীগ পরস্পরের দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়। তারপর যখন বঙ্গবিভাগ হবে কি হবে না সেই সম্পর্কে ভোটের সময় এল, বাংলার বিধানসভায় তখন বঙ্গবিভাগের পক্ষেই ভোট দিলেন অখণ্ড সি পি আই-এর সদস্য তিন জনপ্রতিনিধি জ্যোতি বসু, রতনলাল ব্রাহ্মণ ও রূপনারায়ণ রায়।

পার্টি-লাইনে গান বাঁধতে গিয়ে কেমন নাজেহাল হতে হয়েছিল হেমাঙ্গ বিশ্বাসকে তার একটা চমৎকার গল্প আছে তাঁর 'উজান গাঙ বাইয়া' স্মৃতিকথায়। আসাম বিধানসভার নির্বাচনে সিলেটে এক কম্যুনিস্ট নেতা প্রার্থী। দীর্ঘ নির্বাচনী বক্তৃতা শোনার পর এক কংগ্রেসপন্থী গ্রাম্যমোড়ল জানতে চান, "আপনারা তো পাকিস্তান মানেন?" জবাবে বলা হয়, "না, কিছুতেই না।" তখন মোড়ল নিতান্ত ভালো মানুষের মতো হেমাঙ্গের একটি গানের বই থেকে পড়ে শোনান—

দেশের ভাব দেখিয়া মরি,
ভাবের অভাব হৈল দেশে
ভাইয়ে-ভাইয়ে বিবাদ করি
..... শোন কংগ্রেস নেতাগণ
মুসলমানের আত্মশাসন
না মানিলে হয় না মিলন
দেখ চিন্তা করি।

বিপন্ন কম্যুনিস্ট নেতা তখন হেমাঙ্গের উপর রাগে ফেটে পড়েন। হেমাঙ্গ বিশ্বাস লিখছেন, "যেন দোষটা শুধু আমার। লেনিন-স্তালিনের নীতিকে বরবাদ করে পণ্ডিতপ্রবর ড. অধিকারী তত্ত্ব দিয়েছিলেন 'মুসলিম আত্মনিয়ন্ত্রণে'-র। সেই তত্ত্ব পার্টি গ্রহণ করেছিল, সেই তত্ত্ব অনুসারেই আমি ঐ-গান লিখেছিলাম মুকুন্দদাসী সুরে।"

শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় থেকে জ্যোতি বসু পর্যন্ত সকলের সমর্থনে দেশভাগ তো হয়ে গেল। পূর্ববঙ্গ থেকে চলে আসতে শুরু করল অগণিত উদ্বাস্তু শরণার্থী। *The Marginal Men* গ্রন্থের রচয়িতা প্রফুল্ল চক্রবর্তী মনে করেন, কম্যুনিস্ট পার্টির

সদস্যরা যেহেতু ছিলেন কঠোর মনোবলসম্পন্ন, সম্পূর্ণ আত্মনিবেদিত, সেইজন্য তাঁরা নেতৃত্ব দিলে এই পলায়মান বিশৃঙ্খল হিন্দু জনতা রূপান্তরিত হতে পারতো 'into militant bands of men glowing with faith and creativity'। সেক্ষেত্রে শরণার্থীরা ভারতের ভূমিতে অসহায় অপ্রস্তুত 'flotsam and jetsam' হিশেবে হাজির হতো না—'They could have hit the Indian shore with a bang'। কিন্তু আগস্ট আন্দোলনে কম্যুনিস্ট পার্টির ভূমিকার ফলে, জনযুদ্ধ-নীতির দরুন, পাকিস্তান-প্রস্তাবকে সমর্থন করায়, রণদিভে নেতৃত্বের হঠকারিতায়, কম্যুনিস্ট পার্টি তখন বিচ্ছিন্ন, বিভ্রান্ত এবং দুর্বল। রণদিভে-পর্বে তেলেঙ্গান-কাকদ্বীপে কৃষক-অভ্যুত্থানের ফলে পার্টি মনে করছিল, বিপ্লব আসন্ন। বিপ্লব হলেই দেশভাগের সমস্যা মিটে যাবে, সীমান্ত অবান্তর হয়ে যাবে। দেশভাগ হলেও পার্টি ভাগ করা হলো না। জ্যোতিপ্রকাশ চট্টোপাধ্যায় প্রশ্ন করেছেন, 'দেশভাগ যে ঘটে গেছে এই বাস্তবতাই যে মানে না ... তার কাছে বাস্তুহারার কান্না কতোটা বাস্তব হতে পারে?' তাছাড়া পার্টি মনে করত উদ্বাস্তুরা স্বভাবতই সাম্প্রদায়িক এবং তাদের সমর্থন করলে সাম্প্রদায়িকতাকে প্রশ্রয় দেওয়া হবে। ফলে যে-সব উদ্বাস্তু-কম্যুনিস্ট উদ্বাস্তু আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছেন তাঁরা দলীয় পরিচয় গোপন রেখেছেন উদ্বাস্তুদের মধ্যে গৃহীত হওয়ার প্রয়োজনে। অন্যদিকে পার্টির সঙ্গেও বারেবারে তাঁদের মতের অমিল হয়েছে। বিজয় মজুমদার, ইন্দুবরণ গাঙ্গুলির অভিজ্ঞতা থেকে এইসব আমরা জানতে পারি। ইন্দুবরণ তাঁর 'কলোনি-স্মৃতি' প্রথম খণ্ডে লিখেছেন, "বহু কলোনি ছিল যেখানে কোন কমিউনিস্ট কর্মী ছিলেন না। কংগ্রেস, হিন্দু মহাসভা বা অপর কোন বামপন্থী দলের কর্মী বা সমর্থক অথবা কোন দলেরই নহেন এমন সমাজসেবকগণ অগ্রণীভূমিকা পালনে এগিয়ে এসেছিলেন বাস্তব অবস্থার প্রয়োজনে।" অধিকাংশ উদ্বাস্তু পুরুষ যখন কম্যুনিস্টবিরোধী তখন মেয়েদের মধ্যে সমর্থন পাবার প্রয়োজনে মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির সদস্যরা সমিতির নাম গোপন করে সেবা-প্রতিষ্ঠান হিশেবে মেয়েদের মধ্যে কাজ করেন।

১৯৪৯ সালের ১৪ জানুয়ারি কলকাতায় প্রথম উদ্বাস্তু মিছিল হয়। সেইদিন কলকাতার সঙ্গে প্রথম নতুন শক্তির পরিচয় হলো, বলেছেন প্রফুল্ল চক্রবর্তী। ছিন্নবেশ, ভিখারিপ্রায় শরণার্থীরা সহসা প্রদর্শন করলো তাদের বামমুখ। এতদিনে কম্যুনিস্ট পার্টি এই নতুন শক্তির গুরুত্ব বুঝতে পারে। কিন্তু হিন্দু সাম্প্রদায়িকতা বিষয়ে পার্টির বিবমিষা তখনো কাটেনি। নেহরুকে সমর্থনের জোশি লাইনও উদ্বাস্তুকে সমর্থন করে নেহরুকে বিব্রত করতে চায়নি। মুসলিমতোষণের ঝোঁক তো ছিলই। এইসব কুণ্ঠা বাধা পরে অনেকটা কাটিয়ে ওঠে কম্যুনিস্ট পার্টি এবং গ্রহণ করে 'a policy of confrontation with the Government'।

নীলাঞ্জনা চ্যাটার্জি তাঁর The East Bengal Refugees : A Lesson in Survival প্রবন্ধেও জানিয়েছেন কম্যুনিস্ট পার্টি গোড়ায় 'actually suspicious of refugees as being potentially reactionary and anti-Muslim'। কিন্তু পার্টি পরে এই বিরূপতা, সন্দিগ্ধতা কাটিয়ে ওঠে। ইন্দুবরণ গাঙ্গুলি অভিযোগ করেছেন, "কমিউনিস্ট নেতৃত্ব উদ্বাস্তু সমস্যার ওপর কোনদিনই গুরুত্ব আরোপ করেননি। অথচ তাঁদের প্রয়োজনে উদ্বাস্তুদের কাজে লাগানোর আগ্রহের অভাব ছিল না।" উদ্বাস্তু-আন্দোলন ক্রমে-ক্রমে বামপন্থী রাজনৈতিক আন্দোলনের শরিক হয়ে ওঠে। বিরূপতা যে ছিল তা অমলেন্দু সেনগুপ্তের গ্রন্থে উদ্ধৃত একজনের বিবৃতি থেকে বোঝা যায়। সেই বিবৃতিতে বলা হয়েছে, বাস্তুহারা আন্দোলন সারা বাংলায় 'বিষফোঁড়ার মত' গজিয়ে উঠেছে। উপমাতেই বিরূপতার প্রমাণ। সঙ্গে সঙ্গে অবশ্য এও বলা হয়েছে, যে-পার্টি এদের সাহায্যে এগিয়ে আসবে না, তারা ভবিষ্যতে মাথা তুলতে পারবে না। কম্যুনিস্ট পার্টি বাস্তুহারাদের সাহায্যে, তাদের সংগঠিত করার কাজে এগিয়ে এসেছিল। বিভিন্ন উদ্বাস্তু সমিতির মিলিত সংগঠন United Central Refugee Council-এর নেতৃত্ব কম্যুনিস্ট পার্টির হাতে চলে যায়। সেই নেতৃত্ব উদ্বাস্তুদের প্রতি সহানুভূতিহীন সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন সংগঠিত করে এবং বামপন্থার সমর্থক করে তোলে উদ্বাস্তু আন্দোলনকে। বাস্তুহারা আন্দোলনের নেতৃত্বের উপর পার্টির কর্তৃত্ব এতোটাই প্রতিষ্ঠিত হয় যে, UCRC 'appendage of the Party'-তে পর্যবসিত হয়। প্রফুল্ল চক্রবর্তীর ভাষায় উদ্বাস্তুরা হয়ে ওঠে কম্যুনিস্ট পার্টির 'striking arm'। পূর্ববঙ্গ থেকে স্রোতের মতো আগত ছিন্নমূল মানুষকে জবরদখল কলোনি থেকে উৎখাত করা যাবে না, তাদের দণ্ডকারণ্যে আন্দামানে নির্বাসনে পাঠানো যাবে না, পশ্চিমবঙ্গেই তাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে হবে, এইসব দাবির সমর্থনে আন্দোলনের মধ্য দিয়ে শরণার্থী নেতৃত্ব ও কম্যুনিস্ট পার্টির নেতৃত্বের মধ্যে একাত্মতা প্রতিষ্ঠিত হয়। বিশেষত ১৯৫২ সালের নির্বাচনের এই ছিন্নমূল মানুষেরা এক নিয়ামক শক্তিরূপে আত্মপ্রকাশ করে। এতদিন তারা ছিল যেন 'exiles in an alien land', এই নির্বাচন তাদের সামনে সুযোগ এনে দিল 'to assume their place in this society'। এই নির্বাচনে তারা সংঘবদ্ধভাবে কম্যুনিস্ট পার্টি ও অন্যান্য বামপন্থী পার্টির প্রার্থীদের হয়ে কাজ করে। এইভাবে এই নির্বাচনে পূর্ববঙ্গ আগত উদ্বাস্তুরা অর্জন করলো 'a sense of belonging'। প্রফুল্ল চক্রবর্তী যথার্থই বলেছেন, এইবার উদ্বাস্তুরা কলোনির গণ্ডিবদ্ধতা বিচ্ছিন্নতা ভেঙে বেরিয়ে এল এবং ঝেড়ে ফেলে দিল নির্বাসিত প্রবাসীর মানসিকতা। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় বা দাঙ্গার আতঙ্কে নিরাপত্তাহীনতায় ছিন্নমূল মানুষেরা পশ্চিমবঙ্গে এসে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা সৃষ্টি করতে পারত। বাঙালি-হিন্দুর হয়ে সেই সময় সবচেয়ে উচ্চকণ্ঠে যিনি সওয়াল করেছিলেন সেই

শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ছিলেন হিন্দু-মহাসভা/জনসঙ্ঘের সর্বভারতীয় নেতা। তা সত্ত্বেও উদ্বাস্তুরা জনসঙ্ঘের নেতৃত্ব মেনে নেয়নি। তারা হয়ে উঠেছিল বামপন্থী রাজনৈতিক দলগুলির, বিশেষত কম্যুনিস্ট পার্টির প্রধান শক্তি। কম্যুনিস্ট পার্টির সর্বহারার দল হওয়ার কথা, উদ্বাস্তুরা ছিল যথার্থই সর্বহারা।

মুখরের নীরবতা

আডোর্নো এক বিখ্যাত বাক্যে বলেছিলেন, আউশভিট্‌শ্‌-এর পর কবিতা লেখাই বর্বরতা। যেমন পারমাণবিক বোমায় বিধ্বস্ত হিরোশিমা-নাগাসাকির অভিজ্ঞতা, তেমনি আউশভিট্‌শ-বেলজেন-ট্রেবলিংকার অভিজ্ঞতা, হলোকস্টের অভিজ্ঞতা মানুষের কল্পনা-শক্তিকে অসাড় করে দেয়, তাই এইসব অভিজ্ঞতা নিয়ে কোন শিল্পকর্ম রচনা সম্ভব নয়। এই পরিস্থিতিতে উচিত মৌন থাকা, কারণ জর্জ স্টিনারের ভাষায়, "The world of Auschwitz lies outside speech as it lies outside reason." বরশার্ট In May, In May Cried the Cuckoo-তে লিখেছিলেন, কবি অরণ্যে যাও, মাছ ধরো, কাঠ কাটো, 'and do your most heroic deed, Be silent.' এই অবস্থায় নীরব থাকাই সবচেয়ে বীরত্বের কাজ। কোন কোন হিংস্রতা 'non-narratable'; সেই বীভৎসতা এতোই অতুলনীয়, 'uniquely unique' যে তার বর্ণনার কোন ভাষা হয় না। তবু বরশার্ট, এলি হ্বিজেল, আনটনি হেশ্‌ট, প্রাইমো লেভি, পোল সেলানের মতো কবি ও লেখক এই নৃশংসতার একটি ভাষা আবিষ্কারে উদ্যোগী হয়েছেন। বাস্তব দুঃস্বপ্নের ভয়ংকরতায় দিনযাপনের অভিজ্ঞতাকে অবলম্বন করে গড়ে তুলতে চেয়েছেন এক নতুন 'art of atrocity'। কারণ তাঁরাও কবি হানস মাগনুস এনসেটসেনবার্গারের মতো বুঝেছিলেন, নীরবতার কাছে আত্মসমর্পণের অর্থ হবে 'surrender to cynicism'। জানি না, জাপানি সাহিত্যিকরা হিরোশিমা-নাগাসাকি বিষয়ে এই সিনিসিজমের কাছে আত্মসমর্পণ করেছেন কিনা। কিন্তু পঞ্চাশের মন্বন্তরে পঞ্চাশ লক্ষ মানুষ মারা গেলেও, সেই ঘটনার মর্মান্তিকতা নিয়ে বাংলায় কোন উল্লেখযোগ্য উপন্যাস রচিত হয়নি, যদিও খুচরো কিছু গল্প কবিতা লেখা হয়েছে। নীরবতার কাছে সেদিনও আত্মসমর্পণ করেছিলেন বাঙালি লেখকেরা। অথচ মুখরতাই তো লেখকের স্বভাব।

সাহিত্যের বিখ্যাত মার্কসবাদী তাত্ত্বিক গেয়র্গ লুকাচের *Theory of Novel* নামে একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ আছে। তিনি দেখিয়েছেন এপিক লেখা হয় 'settled culture'-এ যেখানে আত্মপরিচয় স্থিতিশীল, জীবন অপরিবর্তনীয়, কিন্তু উপন্যাস হলো 'transcendental homelessness'-এর রূপকল্প। একথা সত্য হলে দেশভাগ-দেশত্যাগের 'homelessness'-এর দিনগুলিতে মহৎ উপন্যাস রচনার সব

উপাদানই প্রস্তুত ছিল। কিন্তু সেইসব উপন্যাস লেখা হলো না। দুঃখ করে তাই হাসান আজিজুল হক তাঁর 'কথাসাহিত্যের কথকতা' বইতে লিখেছেন, "যারা কখনোই, কোনো কারণেই দেশত্যাগ করবে না, দেশত্যাগের কল্পনা পর্যন্ত যাদের মাথায় আসেনি, তাদের যখন হাজারে হাজারে, লাখে লাখে ভিটেমাটি থেকে উৎখাত হয়ে ছিন্নমূল উদ্বাস্তুতে পরিণত হতে হয়েছে—আমাদের সাম্প্রতিক ইতিহাসের সেই বৃহত্তম বেদনা ও যন্ত্রণার কথা কেউ লেখেননি।"

কেন লেখেননি? পাঞ্জাবের দেশভাগে মেয়েদের অভিজ্ঞতার মর্মান্তিকতা নিয়ে তাঁর *The Other Side of Silence* বই লেখার জন্য উর্বশী বুটালিয়া মেয়েদের সাক্ষাৎকার নিয়েছিলেন। তিনি লক্ষ করেছিলেন, দুঃস্বপ্নময় অভিজ্ঞতা পার হয়ে এসেছেন যে-মহিলারা তাঁরা চুপ করে থাকেন; মনের গভীরে ক্ষত এত গভীর যে তাঁরা মুখ খুলতে চান না। কথা যখন বলেনও, তখনও কথা বলতে বলতে হঠাৎ একেবারে চুপ করে যান—'words would suddently fail speech as memory encountered something too painful, often too frightening to allow it to enter speech'। অভিজ্ঞতার মর্মান্তিকতা বীভৎসতা ভাষার এলাকায় প্রবেশ করতে পারে না। কোন্ ভাষায় ধর্ষিতা প্রকাশ করবে ধর্ষণের বীভৎস অভিজ্ঞতাকে? একি প্রকাশ করা আদৌ যায়? পাঞ্জাবের দেশভাগ-জনিত গৃহযুদ্ধের সময় পুরুষতান্ত্রিক চাপে অনেক মেয়ে আত্মহত্যা করেছিল, অনেক পুরুষ নিজের পরিবারের মেয়েদের সম্মান রক্ষার জন্য তাদের হত্যা করেছিল। মৃতদের ফোটোগুলি রক্ষিত আছে। যারা সেদিন বেঁচে গিয়েছিল তারা মাঝে-মাঝে ছবিগুলি দেখে, চুপ করে দেখে, সে বিষয়ে কোন কথা তাদের মুখে ফোটে না। সেইসব দেহে-মনে উৎপীড়িতা মহিলাদের নীরবতা যে কারণে সেই কারণেই কি লেখকদের মৌন? *The Partitions of Memory* প্রবন্ধ সংকলনের ভূমিকায় সুবীর কাউল, রাজেন্দ্র কৌর নামে এক মহিলার কথা উদ্ধৃত করেছেন। তিনি বলেছিলেন, দুঃসময়ের দিনগুলি বিষয়ে আমরা নীরব থাকি। আমাদের ধর্মে খারাপ কাজের কথা বলা বারণ। খারাপ কাজ বিষয়ে আলোচনা করলে সেই খারাপ কাজটাই ঘটে। ঋতু মেনন ও কম্‌লা ভাসিন তাঁদের *Borders and Boundaries* গ্রন্থে বলেছেন, দেশভাগের কাহিনী 'reverberate with things unsaid'। লেখকেরাও কি সচেতনভাবে চেয়েছেন অনেক কথা 'unsaid' থেকে যাক? কম্‌লাবেন পটেল তাঁর গুজরাটিতে লেখা স্মৃতিকথায় বলেছেন, দেশভাগের ঘটনার হিংস্র বীভৎসতা তাণ্ডবনৃত্যের তুল্য। সেই বীভৎসতা প্রত্যক্ষ করে নিজেকে তিনি প্রশ্ন করেছেন, এ নিয়ে কি লেখা যায়? কেন আমি লিখবো? সেই তীব্র বিবমিষাময় দিনগুলির কথা মনে করলেই মানসিক ভারসাম্য নষ্ট হয়। অনেকে মনে করে সেই স্মৃতি খুঁড়ে তোলা নিরর্থক। অনেকে আর সেই ভয়ংকর দিনগুলির

মুখোমুখি হতে চায় না, পারিবারিক ক্ষত তারা ভুলে যেতে চায়। বলা আর লেখা মানেই তো আবার সেই পুরনো ক্ষতকে খুলে দেওয়া। উর্বশী বুটালিয়ার ভাষায়, 'Partition was difficult to forget but dangerous to remember.' *My People Uprooted* গ্রন্থে তথাগত রায় একটি কাহিনী বলেছেন। কম্যুনিস্ট পার্টির অন্যতম নেতা প্রশান্ত শূর উদ্বাস্তু আন্দোলনের নেতা ছিলেন, পরে কলকাতার মেয়র ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মন্ত্রী হন। তাঁর বাবা রায়সাহেব নগেন্দ্রকুমার শূরকে নিজের কবর খুঁড়তে বাধ্য করে হত্যা করা হয়। উদ্বাস্তুর অভিজ্ঞতা নিয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে তাঁর বাবার নিষ্ঠুর হত্যার কথা উঠলে প্রশান্ত শূর চুপ করে যেতেন। এই কাহিনী উল্লেখ করে The Marginalization of Bengal প্রবন্ধে সোমদত্তা মণ্ডল মন্তব্য করেছেন, 'An entire community, it would seem, went into a state of denial about its collective misfortune'. গোটা জনগোষ্ঠীই যদি ভুলে যেতে চায় তাহলে লেখক কীভাবে সেই দুর্ভাগ্যের স্মৃতিকে রক্ষা করবেন, পুনরুদ্ধার করবেন? এইসব কারণ মিলিয়েই কি বাঙালি লেখকের এই নীরবতা? দেবযানী সেনগুপ্ত সম্পাদিত *Mapmaking : Partition stories from 2 Bengals* সংকলনের ভূমিকায় আশিস নন্দী সবিস্তারে আলোচনা করেছেন এই নীরবতার কারণ। হয়তো, 'our imagination of evil failed to cope with it.' কে জানে, নতুন দেশগড়ার গৌরবে মুগ্ধ নাগরিক মধ্যশ্রেণী হয়তো তাদের চেতনা থেকে এই 'genocidal fury'-কে নির্বাসিত করতে চেয়েছিল, 'silence became their main psychological defence.' কিন্তু ভুলতে চাইলেও ভোলা যায় না। রক্তাক্ত অতীত পরবর্তী প্রজন্মগুলির উপর ছায়া ফেলে যায়।

দেশভাগের অনেক পরবর্তী পর্বের ঘটনা নিয়ে অমিতাভ ঘোষ তাঁর ইংরেজিতে লেখা বাংলা উপন্যাস *The Shadow Lines* লিখেছেন। লেখক জানান, ১৯৬৪ সালের দাঙ্গা নিয়ে লেখা এই উপন্যাসের প্রতিটি ঘটনা নীরবতার সঙ্গে যুদ্ধ করে লেখা। এই নীরবতা স্মৃতির অস্বচ্ছতাজনিত নয়, দমনকারী রাষ্ট্রশক্তির দ্বারা চাপিয়ে দেওয়া নয়, 'it lies outside the reach of my intelligence, beyond words–that is why this silence must win, must inevitably defeat me.' নীরবতার প্রতিপক্ষ ভাষা, শব্দ ছাড়া তো ভাষা হয় না; আর শব্দের অর্থ থাকবেই। তাহলে যে ঘটনাপ্রবাহের কোনও অর্থবোধ হয় না, সেই ঘটনা নিয়ে কিছু বলাও যায় না। অনিবারণীয়ভাবে মূক হয়ে যেতে হয়। কিন্তু সিসিফাস যেমন পাথর গড়িয়ে পড়ে যাবে জেনেও আবার পাথর ঠেলে তোলে, তেমনি স্তব্ধতার কাছে হার মানার সম্ভাবনা জেনেও লেখককে নীরবতা খোদাই করে ভাষার ভাস্কর্য গড়ে তুলতে হয়। মহাযুদ্ধের, হলোকস্টের, হিরোশিমা-নাগাসাকির সামূহিক দগ্ধতার, ভিয়েতনাম যুদ্ধের স্মৃতিস্তম্ভ

আছে, রাজসাহীতে মুক্তিযুদ্ধের একটি স্মারক মিউজিয়াম আছে, দেশভাগে মরে-যাওয়া হারিয়ে-যাওয়া মানুষের উদ্দেশে কোন স্মারকসৌধ নেই। অন্তত সাহিত্যেও কি সেই প্রলয়ংকর ঘটনার চিরন্তন স্মৃতিস্তম্ভ গড়ে উঠবে না?

পশ্চিম ভারতের দেশভাগ-জাতি অভিজ্ঞতা নিয়ে তবু কিছু সাহিত্য রচিত হয়েছে, লিখিত হয়েছে গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক ইতিহাস, কিন্তু পূর্ব ভারতে নীরবতা যেন আরো বেশি প্রগাঢ়। আশিস নন্দী এই কথাই বলেছেন Too Painful for Words? প্রবন্ধে—"Though half the killings had taken place in that part of world (অর্থাৎ বাংলায়), the literary imagination there had obstinately refused to rise to the situation." এই নীরবতা অসতর্কতার ফল, না জেদি নীরবতা, তা জানি না। কিন্তু বাংলা সাহিত্যের নীরবতা যে আছে সে বিষয়ে সংশয় নেই। *The Collected Novels*-এর যে খণ্ডের অন্তর্গত *Train to Pakistan* তার ভূমিকায় খুশবন্ত সিং লিখেছেন, সাম্প্রদায়িক হিংসার বিস্তার তাঁর বন্ধুমণ্ডলীকে স্পর্শ করেনি; মুসলিম, হিন্দু, শিখ, খ্রিস্টিয় বন্ধুরা সেই হিংসার দিনগুলিতে আগের মতোই সান্ধ্য মদিরার আসরে মিলিত হতেন। বাংলাভাষার লেখকেরাও, যেহেতু সর্বসাধারণের অংশ নন, তাই তাঁরা কি দেশভাগ ও বিপর্যয়ের দ্বারা তুলনায় কম বিচলিত হয়েছিলেন? তাই কি তাঁদের নীরবতা? তাঁরা সবটাই যেন দেখেছিলেন খানিকটা দূর থেকে। 'দেশভাগ : বাংলা সাহিত্যের দর্পণে' প্রবন্ধে সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় বাঙালি লেখকদের এই নীরবতার দুটো কারণের কথা বলেছেন। এক, মন্বন্তরের মর্মন্তুদ স্মৃতি মেলাতে-না-মেলাতে এসে পড়েছিল দেশভাগের প্রচণ্ডতা। আঘাতের পর আঘাতে লেখকদের চিত্ত যেন অসাড় হয়ে গিয়েছিল। দুই, প্রধান লেখকেরা ছিলেন পশ্চিমবঙ্গীয়, উদ্বাস্তুর অভিজ্ঞতার সঙ্গে তাঁদের প্রত্যক্ষ পরিচয় ছিল না। এই দুই যুক্তি খুব সারালো মনে হয়নি আমার কাছে। অনেক বেশি বিবেচনার যোগ্য দেবেশ রায়ের কথা। দেশভাগের গল্প নিয়ে 'রক্তমণির হারে' সংকলনের ভূমিকায় তিনি প্রশ্ন তুলেছেন, "বাংলা গল্প-উপন্যাস এমন স্তব্ধ হয়ে গেল কেন দেশভাগ-স্বাধীনতার ঘটনায়? ...বাঙালির ইতিহাস, অস্তিত্ব ও ভবিতব্যকে অক্ষচ্যুত করেছিল যে ঘটনা, তা থেকে চোখ সচেতনভাবেই একটু সরিয়ে রেখেছিল?" তিনি মনে করেন এই নীরবতা ঘটেছিল সচেতন শিল্পগত কারণে। কী সেই কারণ? "কোনো-কোনো সময় এমনও আসে শিল্প-সাহিত্যের এক-একটি ফর্মে, যখন সেই ফর্ম শতবাহু বিস্তার করে তার সময়কে গ্রহণ করে। আবার কোনো-কোনো সময় এমনও আসে শিল্প-সাহিত্যের এক-একটি ফর্মে, যখন সেই ফর্ম তার দুটিমাত্র হাতকেও গুটিয়ে ফেলে তার সময়কে প্রত্যাখ্যান করতে। মহত্তর নৈতিকতার গর্ভ ছাড়া শিল্প-সাহিত্যের কোনো ফর্মেরই কোনো জন্মস্থান নেই। এমন হতেই পারে, যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, দাঙ্গায় সেই নৈতিকতা যতোটা সহজ বোধের নাগাল ছিল, দেশভাগের সঙ্গে জড়িত স্বাধীনতা ও স্বাধীনতার সঙ্গে

জড়িত দেশভাগে ততোটা নাগালে ছিল না। এমনও হতে পারে, ঐ বাস্তবকে আঁকাড়া গল্প উপন্যাসে আনলে সেই নৈতিকতাকে লঙ্ঘন করা হতো, কারণ দেশভাগ ও স্বাধীনতার সময় সারা ভারতের, বিশেষত পাঞ্জাব ও বাংলার মানুষকে, প্রকৃতিকে, জীবনযাপনকে ও ইতিহাসকে সাম্প্রদায়িক ধর্ম দিয়ে চিহ্নিত করা হয়েছিল।" যেন সাহিত্যের ফর্মই দেশভাগের সঙ্গে জড়ানো আঁকাড়া সত্যকে প্রকাশ করতে চায়নি। ফর্ম কি স্বাবলম্বী, তার কি অনীহা থাকতে পারে? নাকি, এই অনীহা শিল্পীর, যিনি ফর্মকে আশ্রয় করে শিল্পকর্ম রচনা করেন? আসল প্রশ্ন নৈতিকতার। ঈষৎ অন্যভাবে এই নীরবতার নৈতিক কারণ খুঁজেছেন মিহির সেনগুপ্ত। অবক্ষয়ের চিত্র আঁকা "এ যে স্বদেহ কণ্ডুয়ন করে স্বদেহ ভক্ষণের চিত্র। এ নিয়ে কিছু সৃজন করা তো অবক্ষয় নিয়ে নির্মাণ। অবক্ষয়ের রূপকল্প কি জীবনধর্মী শিল্পীরা করতে পারেন?"

নৈতিক বিশ্ব ধ্বস্ত হয়ে গিয়েছিল, চুরমার হয়ে গিয়েছিল ন্যায়নীতির নির্মিত জগৎ; সেই সময়ের হিংসা-বিদ্বেষকে প্রকাশ করা, তাকে মনে রাখা কি উচিত হবে? এই নৈতিকতার প্রশ্নের মুখোমুখি হয়েছেন উর্বশী বুটালিয়াও তাঁর *The Other Side of Silence* বই লিখতে গিয়ে। তিনি নিজেকে প্রশ্ন করেছেন, যা আমি জেনেছি তা দেখাতে গিয়ে আমি কি ধর্মনিরপেক্ষ একজন ভারতীয় হিসেবে খানিকটা সতর্ক হবো না? আমি কি দক্ষিণপন্থী হিন্দুত্ববাদীদের হাতে বিপজ্জনক মালমশলা তুলে দিচ্ছি না? 'I am torn between the desire to be honest and to be careful.' ঐ দিনগুলি রাতগুলির ভয়ংকর সত্যকে কতোটা প্রকাশ করা উচিত, আদৌ প্রকাশ করা উচিত কিনা, তা নিয়ে যেমন সংশয় আছে, তেমনি কেউ-কেউ বলেছেন ঐ বীভৎসতাকে ভুলে যাওয়াই উচিত। এমন প্রস্তাব দিয়েছিলেন *Seminar* পত্রিকার ৪৬১ নম্বর সংখ্যায় জাবিদ আলম। মানুষ যখন শুভবুদ্ধি ভুলে পরস্পরকে হত্যায় মেতে ওঠে, তখন যেমন হিংস্রতা ঘটে তেমনি হিংস্রতা ঘটেছিল দেশভাঙার সময়ে। "This should be left behind, should be forgotten, so that people may live in peace, socially normal everyday life, politically as well as individually..." আলম আরো বলেন, নতুন প্রজন্মের কাছে দেশভাগ এক দূরের ঐতিহাসিক ঘটনা, সে অভিজ্ঞতাকে ভুলে গেলেই আমাদের নিত্যদিনের জীবনযাপন স্বাভাবিক হয়ে আসবে। জাবিদ আলমের এই বক্তব্যের প্রতিবাদ করেছেন ঐতিহাসিক জ্ঞানেন্দ্র পাণ্ডে তাঁর *Remembering Partition* গ্রন্থে। আমাদের নীরবতাই বরং দক্ষিণপন্থী ঐতিহাসিকদের হাত শক্ত করে। আর জ্ঞানেন্দ্র পাণ্ডে যেটা বলেননি সেটা হলো, ভুলে গেলেই যদি নিত্যদিনের জীবনযাপন স্বাভাবিক হয়ে যেত, তাহলে গুজরাটের নারকীয় হিংস্রতা ঘটত না। আমাদের রাজনীতির অতীত ভবিষ্যৎকে বুঝতে গেলে, বর্তমানকে তন্নতন্ন করে চিনতে গেলে, বারবার আমাদের দেশভাগের দিনগুলির পুনরালোচনা করতে হবে।

প্রশ্ন অবশ্য শুধু নৈতিকতার ছিল না, ছিল রাজনীতিরও। সোভিয়েটভূমি হিটলারের বর্বর বাহিনীর দ্বারা আক্রান্ত হলে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পটভূমিকায় বিশেষ আন্তর্জাতিক প্রয়োজনে কমিন্টার্নের নির্দেশে ডিমিট্রভ-থিসিসের ভিত্তিতে প্রত্যেক দেশের কম্যুনিস্ট পার্টি সব শ্রেণীর শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষকে, বিশেষত শিল্পী সাহিত্যিকদের সংঘবদ্ধ করার উদ্যোগ নেয়। আগেই ভারতে প্রগতি লেখক সংঘ গড়ে উঠেছিল, বাংলাতেও গড়ে উঠেছিল তার শাখা। এই বাংলা শাখার নাম পরে হয় ফ্যাসিবিরোধী লেখক ও শিল্পীসংঘ। এই সংগঠনের নেতৃত্বে নামত যাঁদেরই বসানো হোক না কেন, কার্যত তার নেতৃত্বে থাকতেন কম্যুনিস্ট সংস্কৃতিকর্মীরা বা তাঁদের সহযাত্রীরা। ফলে পরোক্ষভাবে কম্যুনিস্ট পার্টির নীতি বা আদর্শকেই মেনে চলতে হতো এই সংঘকে। তার প্রমাণ মেলে মন্বন্তর নিয়ে লেখা বিখ্যাত 'নবান্ন' নাটকে। ফ্যাসিজিমের বিরুদ্ধে সংগ্রামে তখন সোভিয়েটদেশ যেহেতু ইংল্যান্ডের সহযোগী, যুদ্ধ যেহেতু পরিণত হয়েছে জনযুদ্ধে, তাই 'নবান্ন' নাটকে মজুতদার ইত্যাদির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ থাকলেও মন্বন্তরের জন্য মূল দায়িত্ব যে ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের সে বিষয়ে অখণ্ড নীরবতা পালন করা হয়েছে। সোভিয়েট সাহিত্যের সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতায় সদর্থক দিককেও যান্ত্রিকভাবে তুলে ধরা হতো, সাহিত্যের কাছে দাবি করা হতো, বাস্তবধর্মী হলেই চলবে না, তার মধ্যে থাকতে হবে ভবিষ্যতের way out-এর দিকে নির্দেশ। বাস্তববাদী হতে হবে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে হতে হবে প্রগতিমূলক। অধিকাংশ বাঙালি লেককই এক সময় প্রগতি আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন; দাঙ্গা-দেশবিভাগে বিপর্যস্ত হয়ে ছত্রখান হয়ে গেলেও, রণদিভের হঠকারী অতিবাম-বিচ্যুতির পর্বে প্রগতি লেখক সংঘ দুর্বল হয়ে গেলেও, সেই আন্দোলনের তত্ত্বের প্রভাব লেখকদের মধ্যে ছিলই। ১৯৪৬ সালের ১৬ আগস্টের দাঙ্গার পরে লেখকদের বিবৃতিতে বলা হয়েছে, বুদ্ধিজীবী ও লেখকদের কর্তব্য হবে 'to fight communalism in all its manifestations,' জাগাতে হবে মানুষের 'essential humanity ... through depicting the glorious example of unity from day to day life and the common struggles of our people.' তাই সাম্প্রদায়িক হানাহানির, বিদ্বেষের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে, ধর্মের ভিত্তিতে দেশভাগ দেশত্যাগের ভয়ংকর অভিজ্ঞতার সামনে দাঁড়িয়ে লেখকেরা হয় নীরবতার আশ্রয় নিয়েছেন, অথবা যান্ত্রিকভাবে সদর্থকতা ও সম্প্রীতির সন্ধান করেছেন, লিখেছেন কিছু তত্ত্বের ছাঁচে ঢালা রচনা, এড়িয়ে গিয়েছেন অনেক অস্বস্তিকর প্রশ্ন। আই পি টি এ-র সদস্য হওয়া সত্ত্বেও শচীন সেনগুপ্ত সলিল সেনের 'নতুন ইহুদী' নাটকে শ্রমিকনেতা মহেন্দ্রের রাজনৈতিক বক্তব্য উপস্থাপনায় বিরক্তি প্রকাশ না করে পারেননি। নাটক শেষ হয় উদ্বাস্তু যুবা মোহনের প্রতি মহেন্দ্রের হৃদয়হীন শোষকদের অত্যাচার খতম করার আহ্বানের মধ্য দিয়ে। নিয়াজ জামান সম্পাদিত *A Divided Legacy* সংকলনের কথাসাহিত্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে,

বাংলা সাহিত্যে দাঙ্গাহত্যার হিংস্রতার কথা নেই, মূলত আছে 'displacement'-এর কথা। লেখকেরা যেন 'obliterate the violence from their racial memory'। অনুক্ত থেকে গেছে অনেক আর্ত উচ্চারণ; লেখা হয়েছে অনেক কী হয়েছে তার গল্প নয়, কী হওয়া উচিত তার গল্প।

সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায় 'দেশভাগ : স্মৃতি আর সত্তা'-য় যথার্থ বলেছেন, "লেখকেরা প্রধানত নিজেদের সম্প্রদায়ের কথাই লিখেছেন; এবং সেখানেও তাঁরা সতর্ক হয়ে থেকেছেন, পাছে তাঁদের রচনা সাম্প্রদায়িক বলে চিহ্নিত হয়ে যায়। ফলে রচনাগুলি হয়েছে কাটছাঁট করা, প্রমাণ মাপের। দুই বাংলার বেদনা আর বিপর্যয়ের কাহিনী অনেকটাই অলিখিত রয়ে গেছে আজও।" লেখক-শিল্পীরা 'এমন কিছু দেখাতে চাননি, যা বিরোধের ওই চাপা আগুনকে আরও উশকে দিতে পারে।' পার্টির প্ররোচনায় যখন সাম্প্রদায়িকতাকে আক্রমণ করা হয়, তখন আক্রমণ করা হয় একপেশেভাবে শুধু হিন্দু-সাম্প্রদায়িকতাকে। তার প্রমাণ ১৯৪৬ সালে প্রকাশিত সলিল চৌধুরীর 'মাংসাশীর জন্য বিজ্ঞাপন' কবিতা।

আসুন! আসুন! কার তাজা মাংস চাই
হাতে যেন থাকে খাঁটি খদ্দরের থলি
ভীষণ সস্তা মাংস নিয়ে যান ভাই
অহিংসার হাড়িকাঠে দিয়েছি এ বলি,
পরম সাত্ত্বিক মাংস গঙ্গাজলে ধোয়া
রামধুন গেয়ে-গেয়ে তবে বলি দেওয়া।

রামধুন, খদ্দর, অহিংসা, গঙ্গাজল, পরে 'তিনরঙা খাঁড়া' শব্দের ব্যবহারে বোঝা যায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার জন্য শুধু কংগ্রেস ও হিন্দু সম্প্রদায়কেই আক্রমণ করছেন এই কবি। শেষ দুই চরণে বলা হয়,

ভয় নেই আমাদের মাংস নিরামিষ
সর্বত্রই ব্রাঞ্চ আছে দিল্লি হেডাপিস।

তাই চলচ্চিত্র-নির্মাতা ঋত্বিক ঘটক তাঁর দেশভাগ দেশত্যাগ নিয়ে তোলা ফিল্‌ম-ত্রয়ীতে খুব সাবধান থেকেছেন। চলচ্চিত্র মাধ্যম যেহেতু ব্যাপকতম মানুষের মধ্যে প্রভাব বিস্তার করতে পারে, সেই কারণে তিনি খেয়াল রেখেছেন যাতে তাঁর উপস্থাপনা কোনোক্রমেই সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা বাড়াতে না পারে। নিমাই ঘোষের 'ছিন্নমূল' ফিল্‌মটি বঙ্গভঙ্গের পিছনে যে রাজনৈতিক জটিলতা সে বিষয়ে স্পষ্টতই নীরব। এই নীরবতার কারণ সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায় মনে করেন, 'the result of a state of confusion'। নীরবতা মেনে নেওয়া গেল না হয়, কিন্তু সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায় নিজেই অন্যত্র দেখিয়েছেন, কীভাবে 'ছিন্নমূল' ফিল্‌মে সাম্প্রদায়িক নিরপেক্ষতা বজায় রাখতে গিয়ে সত্যের বিকৃতি ঘটিয়েছেন ঐ চলচ্চিত্রকার। ব্যাপারটা

যখন সচেতনভাবে করা হয় তখন তাকে আর 'confusion'-এর পরিণাম বলা যায় না। "জমি হাতিয়ে নেওয়ার লোভে স্বার্থান্বেষী হিন্দুরাই আর একদল হিন্দুকে দেশ ছাড়তে প্ররোচিত করছে ঘটনার এই একটিমাত্র দিককেই বেছে নিয়ে নিমাই ঘোষ তাঁর আক্রমণের লক্ষ্য করে তোলেন সম্প্রদায়-নিরপেক্ষ শ্রেণীকে। এর ফলে কাহিনীতে সেকুলার মহিমা যুক্ত হয়, কমিটিড শিল্পীর সামাজিক দায়িত্ববোধও বজায় থাকে; কিন্তু অনুক্ত রয়ে যায় সেই প্রবল আতঙ্কজর্জর দিনগুলির কথা—যখন একটি সদ্যস্বাধীন ভূখণ্ডে একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের নাগরিকেরা প্রতি মুহূর্তে অনুভব করছেন—এই দেশে তাঁরা অবাঞ্ছিত।" তত্ত্বের প্রতি নিষ্ঠ থাকতে গিয়ে ফিল্‌মের কাহিনীটি মিথ্যা হয়ে যায়। আরো একটা কারণের কথা বলেন বাংলার উদ্বাস্তুজীবনের প্রধান ঐতিহাসিক প্রফুল্ল চক্রবর্তী। তাঁর মতে বাঙালি হিন্দু ভদ্রলোক যতোই প্রখর বুদ্ধি ও সৃজনশীলতার অধিকারী হোক, সে আসলে 'tame quiet thing'। তার পরম্পরাগত উদার দৃষ্টিভঙ্গির দরুন, যে শুধু সাম্প্রদায়িক হিংসা এড়িয়ে চলে না, সাম্প্রদায়িক আলোচনাও এড়িয়ে চলে। তিনি মনে করেন, এই মনোভাবও একটা কারণ যে কারণে বাংলা সাহিত্য ১৯৪৬-এর উত্তর রক্তাক্ত দিনগুলি বিষয়ে এমন নীরব।

তত্ত্বের দায়ে সত্যকে বিকৃত করার, গোপন করার, এড়িয়ে যাওয়ার অনেক নমুনা আমরা পেয়ে যাব বাংলা সাহিত্যে। 'পথের কাঁটা' গল্পে রমেশচন্দ্র সেন দুটি সমান্তরাল মিছিলের কথা বলেছেন, বাক্স পেঁটরা হাঁড়িকুড়ি বিছানার যোজনব্যাপী বিরাট কিন্তু বিচ্ছিন্ন মিছিল; একটা চলেছে পুব থেকে পশ্চিমে, অন্যটা পশ্চিম থেকে পুবে। দুই দিকগামী দুই দল 'সামনে আসিয়া একদল আরেক দলের দিকে চাহিয়া নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। দু-দলের দৃষ্টিই শান্ত, স্থির, তাতে হিংসা নাই, দ্বেষ নাই। তাহাদের চোখে শুধু একটি প্রশ্ন, তোমাদেরও এই দশা ভাই? এ করল কে? কারা?' প্রশ্নের সঙ্গে ছিল সহানুভূতি, মানুষে-মানুষে দরদ। লেখক চেয়েছেন মানুষে-মানুষে দরদ থাকুক, তাই বাস্তবের উপর চাপিয়ে দিয়েছেন হৃদয়বত্তা। কিন্তু সেদিন ছিল না ভ্রাতৃত্ববোধ, দৃষ্টি সেদিন ছিল না শান্ত, হিংসাবিদ্বেষহীন। বালনচন্দ্র রাজনের *The Dark Dancer* উপন্যাসেও পুবমুখো ও পশ্চিমমুখো ছিন্নমূল মানুষের মিছিলের কথা বলা হয়েছে। সেই বিপরীতমুখী মিছিল দুটোয় লেখক দেখেছেন, 'anger festered and smouldered' এবং 'convulsion of hate'। 'পথের কাঁটা' গল্পের ইউনিয়ন বোর্ডের আদর্শায়িত প্রেসিডেন্ট সেরাজুল হক হিন্দুদের রক্ষা করে, মহকুমা-শাসকের কাছে লোক পাঠিয়ে সশস্ত্র পুলিস আনায়, বনজঙ্গল ঢুঁড়ে পলাতক হিন্দুদের ঘরে ফেরায়। বলছি না যে, এমন শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ ছিলেন না, কিন্তু ছিলেন খুব বিরল। থাকলেও তাঁরা উৎখাত হওয়া ঠেকাতে পারেননি। একই ধরনের গল্প মনোজ বসুর 'এপার-ওপার'। দেশত্যাগী হিমাংশুর মাঠের ধান তাজ মহম্মদ দখল করেছিল। দেশে গেলে হিমাংশুকে অবাক করে তাজ মহম্মদ তাকে ধানের দাম হিসেবে ১০০্

দেয়। আর হিমাংশু, তার মতো সম্বলহীন মানুষের পক্ষে এই মহানুভবতা অনুচিত জেনেও গোলাম আলিকে সেই নোটটা দিয়ে দেয় দরগা বানানোর জন্যে। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের 'স্বাক্ষর' গল্পের একসঙ্গে খেটে যাওয়া মজুর জহুরালি আর দীননাথ দাঙ্গা লাগলে ইট আর সোডার বোতল নিয়ে দাঙ্গায় মেতে ওঠে। গল্পের শেষে মিলিটারির টহল আর গুলির ভয়ে দুজনে আশ্রয় নেয় এক বাড়ির সিঁড়ির নীচে। সাম্প্রদায়িক সমস্যার সরল সমাধান হয়ে যায়, যখন একজনের বিড়ি আর অন্যজনের দেশলাই কাছে আনে দুজনকে। দুজনকে কাছে আনার উপায় তাহলে ইংরেজশাসকের মিলিটারির ভয়! পরবর্তী সময়ে লেখা সমরেশ বসুর সুপরিচিত 'আদাব' গল্পেও সুতা মজুর আর নৌকার মাঝি, একজন হিন্দু অন্যজন মুসলমান, বিড়ির টানে মিলে যায়। ভীষম্ সাহনির 'তমস' উপন্যাসের শেষে আকাশে সাহেব বৈমানিক চালিত বিমান উড়তে দেখি। কিষেণ সিং বুঝে যায় সরকার বাহাদুর রক্ষা করতে আসছে, সে 'God save the King' বলে চেঁচায়। যে-সব গাঁয়ের উপর দিয়ে বিমান উড়ে যায়, সেইসব গাঁয়ে শান্তি ফিরে আসে। একই রকমের গল্প নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'ইজ্জৎ'। জগন্নাথ সরকার নমশূদ্রের পুরোহিত, ডাকাতে কালীর পূজক। কালী আর ফকিরের মাজার এতোদিন পাশাপাশি ছিল, কোনও অশান্তি হয়নি। এখন অশান্তির দিনে কালীপুজো হলে ইসলামের অপমান, পুজো না হলে হিন্দুধর্মের অপমান। লাগ্-লাগ্ করে লেগে যায়। এখানেও দুজনকে লেখক মিলিয়ে দেন। দুজনের স্ত্রীরই আজ পরিধেয়ের অভাব। জহুরালি আর দীননাথ মিলেছিল বিড়ি-দেশলাইয়ে, 'ইজ্জৎ' গল্পে জগন্নাথ আর ধলা মন্ডাই মিলে যায়, সদ্য-সমাহিত হবিব মিয়ার ছোটবিবির পরনের কাপড় চুরি করতে গিয়ে। লেখকের মন্তব্যে রাজনৈতিক শিক্ষা পাঠক অর্জন করে—'শত্রুকে আঘাত করতে এখনো ওরা শেখেনি, যা শিখেছে তা শুধু আত্মঘাত।' এইসব গল্প আসলে way out দেখানোর গল্প, উপদেশ-মূলক। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'খতিয়ান' গল্পও এমন শিক্ষামূলক। এই গল্পে দুই যুযুধান সম্প্রদায়ের দুই মজদুর বিড়ি খায় আর বলাবলি করে, 'বল্ শালা তোর কোনো জাত নেই, আমার কোনো জাত নেই। তুই গরিব, আমি গরিব। আমরা গরিবের জাত।' এমন বানানো গল্প লেখার চেয়ে নীরবতা অনেক সৎ।

এতোটাই সরল নয় নরেন্দ্রনাথ মিত্রের বিখ্যাত গল্প 'পালঙ্ক'। কিন্তু এই গল্পেও তত্ত্ব সত্যকে বানিয়ে তুলেছে। ঝোঁকের মাথায়, পশ্চিমবঙ্গে চলে-যাওয়া পুত্রবধূর উপর অভিমান ও রাগ করে দামি পালঙ্ক গরিব প্রজা মকবুলকে বেচে দিয়েছিল রাজমোহন। পরে হঠকারিতার বোকামির জন্য অনুতাপ হলে, টাকার লোভ দেখিয়ে, অর্থনৈতিক ও সামাজিক চাপ সৃষ্টি করেও পালঙ্ক ফিরিয়ে আনার চেষ্টায় ব্যর্থ হয় রাজমোহন। অনেক দিন সে একা-একা এসে মকবুলের ভাঙা কুঁড়ে ঘরে খালি পালঙ্ক দেখে গেছে। গল্পের শেষে সে এসে দেখে, পালঙ্কে শুয়ে আছে মকবুলের পুত্র-কন্যা। তখন

রাজমোহনের উপলব্ধি হয়—'আইজ আর আমার পালঙ্ক খালি না। আইজ আর আমার চৌদোলা খালি না। আইজ চৌদোলার ওপর আরো দুজনারে দেখলাম— দেখলাম আমার রাধাগোবিন্দরে।' যে-ভাবে রাজমোহন চরিত্রকে লেখক সৃষ্টি করেছেন তার পক্ষে নিম্নশ্রেণীর মুসলমান প্রজার সন্তানকে রাধাগোবিন্দ বলে কল্পনা করা অসম্ভব। অসাম্প্রদায়িক হতে গিয়ে লেখকের রচনায় এসে গেছে ঔচিত্যবোধের এই অবাস্তবতা। যেমনটি হওয়া উচিত, সেটাই বাস্তবিক হয়েছে বলে দেখিয়েছেন গল্পকার। নৈতিকতা খর্ব করেছে বাস্তব সত্যকে। অনেক বেশি বাস্তব সত্যের গল্প গৌরকিশোর ঘোষের 'যাহা যায়'। দাঙ্গার দুর্যোগে মুসলমান দোকানদারের দোকানে ঢুকে পড়ে আশ্রয় নেয় রাণু। 'ভাগ্যের ফেরে একে অপরের সঙ্গে অপরিহার্যরূপে জড়িয়ে গিয়েছে, তবু একে অন্যের উপর আদৌ আস্থা রাখতে পারছে না। ওরা যদিও পাশাপাশি বসে সময় কাটাতে লাগল তবু ভরসা করে ঘরের আলোটা নেভাতে পারল না। আর তাই পোকার কামড় খেয়েই চলল, খেয়েই চলল, খেয়েই চলল...।' এই পোকা শ্যামাপোকা, অবিশ্বাসের পোকা। তত্ত্ব আর সত্য মিলে গেছে প্রফুল্ল রায়ের 'মাঝি' গল্পে। মাঝি ফজল নিজের বিয়ের জন্য টাকা জোগাড় করতে ব্যস্ত। সে বাড়তি উপার্জনের সুযোগ পেয়ে যায় যখন ইয়াসিন এক হিন্দু মেয়েকে নৌকায় তুলে নিয়ে চর ইসমাইলের দিকে যেতে উদ্যোগী। মেয়েটির স্বামীকে খুন করা হয়েছে, এখন ইয়াসিন তাকে 'খোদ বেগম' করতে চায়। মেয়েটি যখন ইয়াসিনকে বাপ ডেকে রেহাই পেতে চায় ধর্ষণের হাত থেকে, তখন ইয়াসিন 'নীলদর্পণে-র রোগ্‌সাহেবের মতো বলে, "তর বাজান না লো সুমুন্দির ঝি, আমি তর পোলার বাজান হইতে চাই।" ছইয়ের মধ্য থেকে মেয়েটি যখন তীব্র অমানুষিক চিৎকার করে ওঠে, তখন সেই চিৎকার 'ফজলের শিরা-স্নায়ু-মেদ-মজ্জা ফুঁড়ে চেতনায় বিঁধে গেল যেন।' আর কোন কিছু ভাববার আগেই ফজলের কোঁচ অব্যর্থ লক্ষ্যে ছুটে যায়। ইয়াসিনের নিষ্প্রাণ দেহ নদীস্রোতে ফেলে দিয়ে সে স্টিমারঘাটে মেয়েটিকে নিয়ে যায়, আর নিজের বিয়ের জন্য জমানো টাকা দিয়ে মেয়েটির টিকিট কিনে দেয়। ভেবেও দেখে না কী হবে তার শাদির ব্যবস্থা।

'দীর্ঘযাত্রী দলদঙ্গল', প্লাটফর্ম, ক্যাম্প

রাজনৈতিক উৎপীড়নে, গৃহযুদ্ধে-রাষ্ট্রবিপ্লবে, অর্থনৈতিক বিপন্নতায়, মহামারিতে বন্যা-ভূমিকম্পের মতো প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে বারেবারেই দেশের এক অঞ্চলের মানুষ অন্য অঞ্চলে, এক দেশের মানুষ অন্য দেশে চলে গেছে যূথবদ্ধভাবে। ইতিহাসে এমন উদাহরণ অনেক। প্রাচীনতম উদাহরণ বোধহয় মোজেসের নেতৃত্বে ইজরাইলিদের এক্‌সোডাস। ফ্যারাও-এর তরবারির হাত থেকে ইজরায়েলের সন্তানেরা মুক্তির জন্য মোজেসের নেতৃত্বে দলবদ্ধভাবে মিশর ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিল। "And Moses

said, We will go with our young and with our old, with our sons and with our daughters, with our flocks and with our herds will we go...'' উৎপীড়কের ধাবমান রথ, অশ্বারোহীকে হারিয়ে দ্বিধাবিভক্ত লোহিতসাগর পেরিয়ে ঘটেছিল এই মুক্তির যাত্রা, বাইবেলের *Old Testament*-এর Exodus অধ্যায়ে তার বিবরণ আছে। দেশভাগের অনেক পরে, শেষ পর্যন্ত দেশত্যাগ করেছিলেন 'বিষাদবৃক্ষ' স্মৃতিকথার লেখক মিহির সেনগুপ্ত। দেশত্যাগকালে তাঁরও মনে পড়ে গিয়েছিল মোজেসের দেশত্যাগের পুরাণকাহিনী। 'হে মুসা, ভীত হবার হেতু নেই। তোমার সামনে যে বিস্তীর্ণ পাথার, তা তোমার পথ রোধ করতে পারবে না। তুমি তোমার দণ্ডের সাহায্যে সমুদ্রকে আঘাত কর। সে তোমাকে পথ করে দেবে। তোমার পেছনে ফেরাউন তার সৈন্যসামন্ত নিয়ে তাড়া করছে। তারা অচিরেই জলমগ্ন হবে।'

আর একটা ভয়ংকর গণপ্রব্রজন ঘটে উনবিংশ শতাব্দীতে আয়ারল্যান্ডে। রাজনৈতিক উৎপীড়নে নয়, প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে ফসল নষ্ট হওয়ার ফলে। আয়ারল্যান্ডে ১৮৪৫-৪৬ সালে আলুর মড়কে ১৮৪৫ থেকে ১৮৫১ সালের মধ্যে দশ লক্ষ মানুষের মৃত্যু হয় এবং এই মন্বন্তরের ফলে লক্ষ-লক্ষ মানুষ আয়ারল্যান্ড ছেড়ে চলে যায়। ১৮৫১ সালে যেখানে লোক সংখ্যা ছিল আশি-পঁচাশি লক্ষ, এক দশক পরে সেই দেশের লোকসংখ্যা দাঁড়ায় পঁয়ষট্টি লক্ষ! কমতে-কমতে ১৯২১ সালে আয়ারল্যান্ডের জনসংখ্যা দাঁড়ায় তেতাল্লিশ লক্ষ। ফসল নষ্ট হওয়ায়, মন্বন্তরে মহামারিতে দেশের অর্ধেক মানুষ দেশত্যাগ করেছিল। মধ্যবর্তী দীর্ঘ সময়ে কতোবার এমন গণপ্রব্রজন ঘটেছে।

আর আমাদের যুগকে বলা হয়েছে 'Age of Migration'। সম্প্রতিপ্রয়াত মনীষী এডোয়ার্ড সয়ীদ তাঁর *Reflections on Exile* প্রবন্ধ-সংকলনের নাম-প্রবন্ধে বর্তমান যুগকে বলেছেন, 'the age of refugees, the displaced person, mass immigration'। কখনো-কখনো মানুষ স্বেচ্ছায় অন্য দেশে চলে যাচ্ছে ভাগ্য ফেরানোর আশায়। কতো লোক জীবিকার সন্ধানে যাচ্ছে ভারত, বাংলাদেশ, থাইল্যান্ড, ইন্দোনেশিয়া থেকে তাইওয়ানে, উপসাগরীয় অঞ্চলে, সৌদি আরবে, মার্কিনদেশে। কিন্তু দলবদ্ধভাবে মানুষ যখন দেশত্যাগ করে, তখন করে রাজনৈতিক অত্যাচারে, অর্থনৈতিক বিপর্যয়ে, মহামারিতে বা প্রাকৃতিক দুর্যোগে। এমন মাইগ্রেশানের অনেক উদাহরণ আমরা পেয়েছি কম্বোডিয়ায়, আফ্রিকার নানা দেশে জাতিবৈরের ফলে, বসনিয়ায়। তবে যুদ্ধ নেই, আপাতত সব শান্তিকল্যাণ হয়ে আছে এমন পরিস্থিতিতে, ইতিহাসের সবচেয়ে বড়ো মাইগ্রেশন ঘটেছে ১৯৪৬-৪৭ সালে ও তার পরবর্তী সময়ে ভারতভাগের ফলে। 'Never before or since, in human history, there has been such a mass exodus of people.'

পাঞ্জাব, সিন্ধু, উত্তরপশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ থেকে লক্ষ-লক্ষ হিন্দু-শিখ স্বজন হারিয়ে, সর্বস্ব হারিয়ে, প্রাণ হাতে নিয়ে, প্রায় মিছিল করে ভারতবর্ষে প্রবেশ করেছে। আবার পাঞ্জাব, দিল্লি, উত্তরপ্রদেশ থেকে লক্ষ-লক্ষ মুসলমান স্বজন-সর্বস্ব হারিয়ে, প্রাণ হাতে নিয়ে প্রায় মিছিল করে পাকিস্তানে প্রবেশ করেছে। ১৯৪৭ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর ভাঙা দেশের স্বাধীনতার পরে নেহরু বিমান থেকে দেখেছিলেন দুই দিকে দুটি মিছিল চলেছে, প্রত্যেকটি চল্লিশ মাইল দীর্ঘ। দুর্দান্ত রক্তক্ষয়ী দাঙ্গা, বীভৎস হত্যাকাণ্ডের মধ্য দিয়ে ঘটে গিয়েছে ভারতের পশ্চিমাংশ ধর্মের ভিত্তিতে লোকবিনিময়। আর বঙ্গ বিভাজনের ফলে ভারতের পূর্বাংশে, নীলাঞ্জনা চ্যাটার্জির দেওয়া হিশাব মোতাবেক, অক্টোবর ১৯৪৬ থেকে মার্চ ১৯৫৮-র মধ্যে ৪১.১৭ লক্ষ, এপ্রিল ১৯৫৮ থেকে ডিসেম্বর ১৯৬৩-র মধ্যে ২.৫ লক্ষ, ১৯৬৪ থেকে ১৯৭০-এর ডিসেম্বরের মধ্যে ১১.১৪ লক্ষ লোক পূর্ববঙ্গ থেকে চলে এসেছে। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় যে এক কোটি লোক পুব বাংলা থেকে ভারতে চলে এসেছিল তারও মধ্যে দুই লক্ষ আর ফিরে যায়নি। ভারত সরকারের প্রদত্ত এক পরিসংখ্যান অনুসারে ১৯৫৬ সালের মধ্যে ৪০ লক্ষ হিন্দু-বাঙালি পুব বাংলা ছেড়ে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে, মূলত পশ্চিমবঙ্গে চলে আসে। অন্য একটি রিপোর্ট অনুসারে ১৯৪৬-৫৮ কালপর্বে চলে-আসা মানুষের সংখ্যা ৫২ লক্ষ। পশ্চিমবঙ্গে পুনর্বাসনের কাজ পর্যালোচনা করে যে কমিটি রিপোর্ট দেয় তাদের হিশেব অনুসারে, ১৯৪৬-৬২ কালপর্বে মোট শরণার্থী আসে ৪২,৬১,২৫৭ জন। ১৯৭১ সালের আদমশুমারি অনুসারে শুধু পশ্চিমবঙ্গের জেলাগুলিতে পূর্ববঙ্গ/পূর্বপাকিস্তান/বাংলাদেশ থেকে চলে আসা মানুষের সংখ্যা ৭৩ লক্ষ। এই বিষয়ে যিনি নিবিষ্ট গবেষণা করেছেন সেই নীলাঞ্জনা চ্যাটার্জি জানান, এইসব কোন সংখ্যাই নির্ভরযোগ্য নয়। কিন্তু যে হিশাবই ধরি না কেন চলে আসা মানুষের সংখ্যা বিপুল। এই ঘটনা ইয়োরোপের ইহুদি-নিধন ও বিতাড়ন হলোকস্টের সঙ্গে তুলনীয়। কিন্তু জার্মানজাতি আজ যেমনভাবে সেই ভয়ংকর হলোকস্টের হৃদয়হীনতার সত্যের মুখোমুখি হয়েছে, আমরা ভারতে বা পাকিস্তানে তেমনভাবে সত্যের মুখোমুখি তো হই-ইনি, বরং এড়িয়ে গেছি। এড়িয়ে গেছি, কার্পেটের তলায় চালান করে দিয়েছি বলেই হয়তো সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার হাত থেকে, ভারত-পাকিস্তান বিদ্বেষের হাত থেকে আমরা নিস্তার পাইনি। তিন রাষ্ট্রে সরকার এবং গণমাধ্যম যেন চক্রান্ত করে দেশভাগের মর্মান্তিক অভিজ্ঞতাকে উপমহাদেশের যৌথ চেতনা থেকে মুছে দিতে চায়। সেই সত্যকে কিন্তু মুছে দিতে চাইলেও মোছা যায় না। ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশের রাজনীতি এখনও আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে আছে দেশভাগের ইতিহাসের সঙ্গে। সত্যের মুখোমুখি আমরা সরকারি ইতিহাসে হইনি, যদি হতাম তাহলে স্বাধীনতার পর থেকে আমাদের প্রগতিশীল অগ্রগতির বানানো ইতিহাস ধ্বসে পড়ত।

এই যে বিশাল মানুষের স্রোত পুব বাংলা থেকে পশ্চিমবঙ্গে, ভারতের বিভিন্ন অংশে চলে এল—পায়ে হেঁটে, ট্রেনে, নৌকায়-স্টিমারে, সামান্য সম্বল নিয়ে বা নিঃসম্বল অবস্থায়, কিছু মানুষ স্বজনকে হারিয়ে অথবা না-হারিয়ে, শরীরে-মনে ক্ষত নিয়ে, তাদের সেই চলে-আসার পথের অভিজ্ঞতা বাংলাসাহিত্যে প্রায় লেখাই হলো না। সেই ছিন্নমূল হওয়ার যুক্তিটি পাই শঙ্খ ঘোষের 'মন্ত্রীমশাই' কবিতায়,

সবাইকে পথ দেবার জন্য কয়েকজনকে সরতে হবে।
তেমন-তেমন সময়ে এলে হয়তো আমায় মরতে হবে
বুঝতে পারি।
এ-যুক্তিতেই ভিটেমাটির ঊর্ণা ছেড়ে বেরিয়েছিলাম
অনেক আগের রাতদুপুরে ঘোরের মতো
কণ্ঠাবধি আড়িয়ালের ঝাপটলাগা থামিয়েছিলাম...
সবার জন্য কয়েকজনকে ছাড়তে হবে।
কিন্তু সবাই বললো সেদিন, হা কাপুরুষ, হদ্দ বাঙাল
চোরের মতো ছাড়লি নিজের জন্মভূমি।
জন্মভূমি? কোথায় আমার জন্মভূমি খুঁজতে-খুঁজতে জীবন গেল।
দিন কেটেছে চোরের মতো দিনভিখারির ঘোরের মতো
পথবিপথে...

শঙ্খ ঘোষের 'পুনর্বাসন' কবিতায় পড়ি সেই দীর্ঘ যাত্রার কথা,

যা কিছু আমার চারপাশে ছিল
ধ্বস্ত
তীরবল্লম
ভিটেমাটি
সমস্ত এক সঙ্গে কেঁপে ওঠে পশ্চিম মুখে
স্মৃতি যেন দীর্ঘযাত্রী দলদঙ্গল
ভাঙা বাক্স পড়ে থাকে আমগাছের ছায়ায়
এক পা ছেড়ে অন্য পায়ে হঠাৎ সব বাস্তুহীন।

ছোট পংক্তি বড়ো পংক্তি যেন ছোট দল আর বড়ো দল। ভাঙাচোরা লাইনে যেন ছিন্নমূল মানুষের বাঁকাচোরা মিছিল। সাবিত্রী রায়ের 'স্বরলিপি' উপন্যাসে নায়ক পৃথ্বী প্রণয়িনী সীমার সন্ধানে এসে দ্যাখে বরিশাল একস্‌প্রেস থেকে বিপর্যস্ত ছিন্নমূল মানুষ রক্তহীন স্রোতের মতো নেমে আসছে। রেলস্টেশনে সেই মানুষগুলি অমিয়ভূষণের 'নির্বাস' উপন্যাসে পড়ি, ময়লা কাপড়ের পুঁটুলি, কালি-পড়া হাঁড়িকুড়ি, দড়ি দিয়ে বাঁধা, জড়ানো মলিন মাদুর কাঁথা, নিয়ে 'রুগ্ন, অভুক্ত, অস্নাত, হাজার লোকের পূতিগন্ধ জনতা।' এই প্রব্রজনের প্রাসঙ্গিক কিছু কথা আছে দিনেশচন্দ্র রায়ের

'কুলপতি' নামের ছোটগল্পে। কথক বধূটি স্বামী আর শ্বশুরকে নিয়ে দেশত্যাগ করতে পথে নামতে বাধ্য হয়েছে। অন্ধকার রাস্তার মোড়ে-মোড়ে লুঠেরারা আছে। স্বামীর মাথায় লাঠি পড়ে, রক্তপাত হয়, মশালধারী ডাকাতদের হাতে সর্বস্ব তুলে দিতে হয়। শঙ্খ ঘোষ ভুলতে পারেন না সেই দেশত্যাগের মর্মান্তিকতা,

আমার মুখে অন্তহীন আত্মলাঞ্ছনার ক্ষত
আমার বুকে পালানোর পালানোর আরো পালানোর দেশজোড়া স্মৃতি।..

(দেশহীন)

শুধু উপন্যাসের ছদ্মবেশে স্মৃতিকথা 'পিতামহী'-তে শান্তা সেন এই গণপ্রব্রজনের, এই দলবদ্ধভাবে দেশ ছেড়ে চলে আসার সর্বনাশা সময়ের অথেনটিক বিবরণ দিতে পেরেছেন, দিতে পেরেছেন এই উপন্যাসের তৃতীয় অংশে ''মাগোর পথ'-এ। বৃদ্ধা এই পিতামহী দাঙ্গা-লাগা বরিশাল ছেড়ে কলকাতায় চলে এলেন। স্বাভাবিক অবস্থায় দুদিনের পথ পার হয়ে আসতে তাঁর লাগল এক মাস! 'শিয়ালদা স্টেশনে পুব পাকিস্তান থেকে মার-খাওয়া মানুষেরা দলে দলে এসে পৌঁছেছে, তাদের যথাসর্বস্ব সঙ্গে নিয়ে, চিরদিনের মতো ভিটেমাটি ছেড়ে।' যথাসর্বস্ব নিয়ে নয়, যথাসর্বস্ব একেবারে হারিয়ে। খোঁজ হয় পিতামহীর, মাগোর; বৃদ্ধা দেখলেই মনে হয় ওই বুঝি মাগো! আবার ভুল ভাঙে, 'ধবধবে শাদা চুলে ভরা মাথা নিয়ে অন্য এক মানুষ'। অবশেষে ট্রেন থেকে উগলে দেওয়া মানুষের মধ্যে একদিন পিতামহীকে মেলে। ফুটপাতের ভিখিরির অধম তাঁর পোষাক। হাত দুটো শুকিয়ে পচে-যাওয়া লিচু। অনেকের সঙ্গে ঘর ছেড়েছিলেন এই বৃদ্ধা। নৌকোয় পৌঁছিয়েছিলেন গ্রাম থেকে বরিশাল শহরে। বরিশালে দিনের পর দিন অপেক্ষা, দুঃসাধ্য স্টিমারে ওঠার জন্যে। প্রাণান্তক ঠেলাঠেলি করে স্টিমারে, একইভাবে ট্রেনে উঠেছিলেন এই বৃদ্ধা, সাংসারিক নিরাপত্তায় যাঁর নিশ্চিন্ত আশ্রয় ছিল এতদিন। 'চারপাশের দমের বাতাস ফুরিয়ে যায় মাগোর।' চারদিকের অচেনা মুখের ভিড়ে মাগো যেন নিরাশ্রয়। স্টেশনে নামেন তিনি। প্লাটফর্মে থিকথিক করছে মানুষ। এদের সকলেরই ঘর ছিল, বাড়ি ছিল, এরা কেউ পথের ভিখিরি না। ঘরের আড়াল ভেঙে, নিভৃত ঘুচিয়ে মা-বাবা-ভাই-বোন, স্বামী-স্ত্রী-ছেলে-মেয়ের এক-একটা পরিবার জনতার অংশমাত্র হয়ে দিনের আহার আর রাতের ঘুমটুকুমাত্র সম্বল করেছে নিছক বেঁচে-থাকার জন্য, এখন যখন শুধু প্রাণ বাঁচানোই দায়।

যাত্রাপথের এই মর্মান্তিক ওডিসি মাগো শুনিয়েছেন ছেলের ঘরের নিরাপত্তায় পৌঁছে। যেমন জীবনে তিনি অভ্যস্ত ছিলেন তেমনি সব শুচিতার নিয়ম পালন করা হয়—গত একমাসের জীবনযাপনের অশুচিতার প্রক্ষালনের জন্যেও যেন। ছেলে যায় বাজারে মায়ের জন্য শুক্তোর আনাজপাতি কিনবে বলে। কিন্তু ভাঙা-দেশের

ভাঙা-মানুষের ভাঙা-মন আর শরীর আর দেয় না। চোখ খোলা রেখে মাগোর চোখ ভাষা হারিয়ে ফেলে। 'মাগোর শরীর ক্রমে স্থির নিস্পন্দ হয়ে যায়। বিধ্বস্ত এই শরীরটাকে মাগো টেনে এনেছিল শুধু একটা কথাই জানিয়ে যেতে—কীভাবে *চিরদিনের একটা পথ এদেশের মাটিতে চিরকালের জন্য মুছে গেল*।' ছিন্নমূল মানুষের পদপাতে-পদপাতে সেই চিরদিনের পথের চিহ্ন চিরকালের জন্য মুছে গেল। নারায়ণ সান্যালের 'বল্মীক' উপন্যাসে এই ছিন্নমূল মানুষের স্রোতের কথা পড়ি। 'মানুষ চলেছে গায়ে-গায়ে লেগে, প্রশস্ত রেলপথের উপর চাপ, ভিড়। ঠেলাঠেলি, হুড়োহুড়ি—দীর্ঘ ক মাইল বিস্তৃত যেন জীবন্ত মানুষের এক চলন্ত অজগর!... যেন প্রতিটি মানুষের কোন পৃথক সত্তা নেই।' সন্ত্রাসিত পলায়নপর আশ্রয়ের সন্ধানে মানুষ চলেছে। সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, এই সময় পূর্ববঙ্গ থেকে শেয়ালদায় এসে পৌঁছুনো একটা ট্রেনের কামরায় পাওয়া গিয়েছিল শুধু কয়েকটা রক্তমাখা ধুতিশাড়ি আর ভাঙা শাঁখা। সবচেয়ে নৃশংস হত্যাকাণ্ডটি ঘটে মৈমনসিংহে, ভৈরব ব্রিজের উপর, ট্রেন থামিয়ে যাত্রীদের খুন করে নদীতে ফেলে দেওয়া হয়। লুণ্ঠন, বলাৎকার, রক্তপাতের মধ্য দিয়ে 'ট্রেন দর্শনা বা বেনাপোল সীমান্ত পার হলে যাত্রীরা তাই হর্ষধ্বনি দিয়ে ওঠে—উলু দিয়ে ওঠেন নারীরা।' অন্যদিকেও একই অনুভূতি। জ্ঞানেন্দ্র পাণ্ডে তাঁর *Remembering Partition* গ্রন্থে দিল্লি কলেজের একদা-অধ্যাপক এবাদত বারেলভি-র কথা বলেছেন। ১৯৪৮ সালে অনেক দ্বিধার পর তিনি দিল্লি ছেড়ে পাকিস্তানে চলে যান। লাহোরে গিয়ে তাঁরও মনে হয়েছিল, এতদিনে যথার্থ মুক্তি লাভ করলেন। এখন তিনি পাকিস্তানে, এই ভেবে তাঁর চোখ আনন্দাশ্রুতে ভরে গেল। এইবার তিনি সপরিবারে নির্ভয়ে বাস করবেন, এখানেই 'treasure of peace and security'। নারায়ণগঞ্জ থেকে বাহাদুরাবাদের পথে পালাচ্ছে এক হিন্দু দম্পতি হাসান হাফিজুর রহমানের 'আরো দুটি মৃত্যু' গল্পে। তারা কি জানে না ট্রেনের কামরায় কতো মানুষ খুন হয়েছে! যে নারী আসন্নপ্রসবা—সে মাইলের পর মাইল হেঁটে এই ট্রেনে উঠেছে। প্রসববেদনায় বউটি শৌচাগারে ঢোকে। গল্পের কথক কান খাড়া করে থাকে যন্ত্রণাকাতর নারীর চিৎকার ও নবজাতকের কান্না শোনার জন্য। কিন্তু নেমে আসে এক নীরবতা। এইসব ভয়ংকর গণমহাপ্রস্থানের কাহিনী নিয়ে একটা *Odyssey* মহাকাব্য লেখা যেতে পারত। পশ্চিম ভারতের দেশভাগ-জনিত মাইগ্রেশন নিয়ে তবু অগভীর হলেও খুশবন্ত সিং-এর *Train to Pakistan* লেখা হয়েছে, কিন্তু বাংলা সাহিত্যে এ বিষয়ে অখণ্ড নিচ্ছিদ্র নীরবতা বিরাজমান। এই এক্সোডাসের কোনো পদচিহ্ন বাংলাসাহিত্যে নেই।

তাদের কথাও নেই, যারা দিনের পর দিন মানবেতর জীবনযাপন করতে বাধ্য হয়েছিল শেয়ালদা স্টেশনের প্লাটফর্মে। শূন্যদৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে বা চোখ বন্ধ করে

শুয়ে আছে মাদুরে বা শতরঞ্চিতে কেউ-কেউ। হাবার মতো তাকিয়ে আছে উদ্বাস্তু ছিন্নমূল বৃদ্ধ, ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে আছে গ্রাম্যবধূ; পুরুষেরা ব্যস্ত আহার সংগ্রহের নানান ধানধায়, বালকবালিকারা যেহেতু যে কোন পরিস্থিতিতে খেলবেই, তারা খেলছে। খেলছে, কিন্তু দ্রুত বড়ো হয়ে যাচ্ছে এইসব বালকবালিকা। যাঁরা চল্লিশের দশকের শেষে বা পঞ্চাশের দশকের গোড়ায় শেয়ালদা স্টেশনে গিয়েছেন, তাঁদের মনে চিরকালের জন্য মুদ্রিত হয়ে গিয়েছে এইসব হাজার-হাজার মানুষের অসহায়তার ছবি। প্রফুল্ল রায়ের 'নোনা জল মিঠেমাটি' উপন্যাসে পড়ি, 'প্ল্যাটফর্মের ওপর হাত চারপাঁচেক জায়গা দখল করে এক একজন ইট দিয়ে সীমানা ঠিক করে নিয়েছে। ঐ নিরাবরণ নগ্ন জায়গাটুকুর মধ্যে বউ-ঝি মেয়ে-পুরুষ গাদাগাদি করে পড়ে থাকে। গোপনতা নেই, আব্রু নেই। ওখানেই যুবতী মেয়ে গর্ভিনী হচ্ছে, মানুষ জন্মাচ্ছে, মানুষ মরছে। ওখানেই ঘর-সংসার, জীবনমৃত্যু, সবকিছু।' এই শেয়ালদা স্টেশনের প্লাটফর্মের কথা বলতে গিয়ে প্রফুল্ল চক্রবর্তী তাকে নরকের দ্বার বলেছেন। অবর্ণনীয় মানুষগুলির অবস্থা; জল আর শৌচাগারের ব্যবস্থা অপ্রতুল। কী খায়, কী ভাবেই বা রান্না করে। নিত্যযাত্রীরা সন্তর্পণে তাদের এড়িয়ে চলাচল করে। একদিকে সর্বস্বহারার অসহায়তা, অন্যদিকে মহানগরের মানুষজনের উপেক্ষা। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'পূর্বপশ্চিম' উপন্যাসের হারীত মণ্ডল বলে, "সত্যই আইশ্চর্য শহর। শিয়ালদহ ইস্টিশনে রিফিউজি থিকথিক করত্যাছে, তারই মধ্য দিয়া হৈ হৈ করতে করতে বনভোজন পার্টি যায়।" স্টেশনের বাইরেও যে যেখানে পারে আশ্রয় নেয় রিফিউজিরা। বিষ্ণু দে-র 'জল দাও' কবিতায় পড়ি—'এখানে ওখানে দেখ কত ঘরছাড়া লোক ছায়ায় হাঁপায়/পার্কে ছাউনিতে পথে ম্যানসনের বারান্দায় শানের শয্যায়/কী যে ভাবে ঘর ছেড়ে খোঁজে বুঝি দেশ....।' পশ্চিমবঙ্গের অধিকাংশ মানুষ মনে করে, এইসব অবাঞ্ছিত অতিথি তাদের প্রাপ্যে ভাগ বসাচ্ছে, তাদের জীবনে ঝামেলা সৃষ্টি করছে। এদের চিড়ে-গুড় দিয়েই সরকারের দায়িত্ব শেষ হয়ে যায়। কারণ, বল্লভভাই পটেল যদিও বলেন পশ্চিমপাকিস্তান থেকে আগতরা বিদেশী নয়, কিন্তু নেহরু স্পষ্টই বলেন পূর্ববঙ্গ থেকে আসা উদ্বাস্তুরা 'alien'। সাহায্যের নাম করে প্লাটফর্মবাসী এইসব ছত্রখান মানুষকে ঠকাতেও দ্বিধা করে না অনেক ঠক। আড়কাঠি সন্ধানে থাকে যুবতী মেয়েদের, অন্ধকার জীবন চালান করার জন্যে। "Squalor, dirt and complete absence of privacy had already removed from them the vineer of civilization...Hunger thirst, nakedness, sleeplessness and disease." পিতামহীর খোঁজে স্টেশনে তাঁর পরিজন-মানুষেরা গিয়েছিল বলে 'পিতামহী' উপন্যাসে এক লহমায় এই প্রান্তিক মানুষগুলিকে দেখি, আর বাংলাসাহিত্যে দেখি না। এরা বেশির ভাগই ছিল গরিব মানুষ, নিম্নবর্গের মানুষ—তাই মধ্যবিত্তের লেখা বাংলাসাহিত্য তাদের কলমের ডগায় ছুঁয়ে দেখল না। তাদের সেই গ্লানিকর

অপমানের দিনযাপনের কথা কেউ বলল না, তারা নিজেরাও সে কথা বলবার সামর্থ্য হয়তো অর্জন করতে পারেনি।

প্লাটফর্ম থেকে তাদের তুলে নিয়ে যাওয়া হয় ক্যাম্পে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় মিত্রপক্ষের সৈনিকদের জন্য যে-সব সেনা-শিবির তৈরি হয়েছিল, সেইসব ছাউনিকে ব্যবহার করা হয় উদ্বাস্তুদের ক্যাম্প হিসেবে। লরি-বোঝাই করে গোরু-ছাগলের মতো মানুষগুলিকে এনে ফেলা হয় এইসব ক্যাম্পে ধুবুলিয়ায়, রানাঘাটে, বিহারের বেতিয়ায়। ঘর ছেড়ে মানুষ হিসেবে যাত্রা শুরু করেছিল যারা তারা আজ পর্যবসিত হয় যেন পশুতে। ব্যারাকের এক-একটি ঘরে কুড়িটি পরিবার, কোনও আড়াল নেই। জন্ম-মৃত্যু-মৈথুনের মতো সব ক্রিয়াকল্প জন্তুর মতো প্রকাশ্যে। সব সময় ভয় দেখানো হয় খয়রাতি সাহায্য বন্ধ করে দেওয়া হবে, ক্যাম্প বন্ধ করে দেওয়া হবে। এদের সম্পর্কে দিল্লির কর্তৃপক্ষের সহানুভূতির অভাবের কথা প্রফুল্ল চক্রবর্তী *The Marginal Men* গ্রন্থে লিখেছেন, সম্প্রতি জয়া চ্যাটার্জি তাঁর Right or Charity? The Debate Over Relief and Rehabilitation in West Bengal 1947-50 প্রবন্ধে সবিস্তারে লিখেছেন। দিল্লি মনে করত পুববাংলার এই উদ্বাস্তুরা নিতান্ত ভিত্তিহীন গুজব শুনে এবং কাল্পনিক ভয়ে বাস্তু ছেড়েছে, তাদের জীবন ও সম্পত্তির বিশেষ কোনও হানি হয়নি। তাই তাদের প্রতি সরকারের কোনও দায়িত্ব নেই, যা দিচ্ছে তা দিচ্ছে 'graciously at its pleasure'। আপত্তি না করে যেটুকু খুদকুড়ো পাচ্ছে তাই নিয়ে তাদের খুশি থাকা উচিত। প্রতিবাদের পরিণাম কী সেটা তারা দেখেছে বেতিয়া ক্যাম্পে। যেখানে পুলিশের গুলিচালনায় উদ্বাস্তুর মৃত্যু হয়েছে। তাদের বলা হয়েছে, চলো দণ্ডকারণ্যে চলো আন্দামানে। না-গেলে ক্যাম্প বন্ধ করে দেওয়া হবে। নারায়ণ সান্যালের 'বকুলতলা পি. এল. ক্যাম্প' নামে কাঁচা-লেখা উপন্যাসটি বাদ দিলে এইসব ক্যাম্পবাসী মানুষদের কথা বাংলা সাহিত্যে আর কোথাও নেই।

বাস্তুহারার গৃহ-কাতরতা

কথাটা সীমোন ভইলের, 'To be rooted is perhaps the most important and last recognised need of the human soul.' দেশত্যাগী উদ্বাস্তু মানুষের নিয়তি পর্যালোচনা করতে গেলে তাদের শিকড়-ছেঁড়ার বেদনা বারবার সামনে চলে আসে, এটাই তাদের জীবনের সবচেয়ে চূড়ান্ত বেদনা। ঋতু মেনন ও কম্‌লা ভাসিনের *Borders and Boundaries : Women in India's Partition* বইয়ের মলাটে বিখ্যাত শিল্পী অঞ্জলি এলা মেননের আঁকা মাতাজির ছবি ব্যবহার করা হয়েছে। রোদ্দুরে বসে বৃদ্ধা পশম বুনে চলেছেন আর মনে-মনে রোমন্থন করছেন দেশভাগের আগের লাহোরের দিনগুলির স্মৃতি।

নির্বাসিতের চূড়ান্ত বেদনা এই যে, সে মাটির সঙ্গে নিবিড় সংযোগের পরিতৃপ্তি থেকে চিরবঞ্চিত হয়, 'home coming is out of the question'। শঙ্খ ঘোষের 'সুপুরিবনের সারি'-র নীলু এবার দেশে যাচ্ছে, 'আর কোনদিন দেশে না যাবার জন্য'। 'পিতামহী' নামের চমৎকার ছোট উপন্যাসটিতে শান্তা সেন নিজের কথাই লিখেছেন। এই উপন্যাসের প্রথম দুই অংশ ঘর-কাতুরে স্মৃতিতে ভারাক্রান্ত। ছুটিতে গ্রামের বাড়িতে বরিশালে যাওয়ার স্মৃতি—পুকুরপাড়ে শিউলিগাছ, দুর্গাপুজোর জন্য মণ্ডপ পরিষ্কার করা ও সাজানো, বোধন, পূজা, শাপলা ফুল, ঢোল-কাঁসির বাজনা, 'আকাশে মাটিতে উঠোনে গাছগাছালিতে জ্যোৎস্নার শাদা', ব্রতপাঠ, গান, ছড়া, নদী-নৌকো-খাল-স্টিমারঘাট, নাড়ু, কাওনের চালের পায়েস। এই জগতে আর ফিরে যাওয়া যাবে না। অন্যদিকে সেদিনের কিশোর মীজানুর রহমান 'কমলালয়া কলকাতা', সেই 'শুভনগরী' ছেড়ে আসতে মর্মান্তিক কষ্ট পেয়েছে। ১৯৪৭-র ১৪ আগস্টে যেদিন হিন্দু-মুসলমানে আবার খুব কোলাকুলি হচ্ছে, তখন শেষবারের মতো, পাকিস্তানে চলে যাবার আগে, কলকাতাকে দেখে নেয় মীজানুর, মির্জাপুরের মোড়ে এসে দাঁড়িয়ে শেষবারের জন্য দেখে নেয় নিজের প্রিয় ইস্কুলটিকে। শিখ মেয়ে তারন নান্‌কানা-সাহেবে জন্মেছিল; সে জানায়, এখনো সে মনে-মনে সেই পাঞ্জাবের পথে-পথে ঘুরে বেড়ায়, সে-পাঞ্জাবে আর কোনদিন যেতে পারবে না। দেশত্যাগের এই বিচ্ছেদ বিষয়ে লিখতে গিয়ে এডোয়ার্ড সয়ীদ লিখেছেন "It is the unhealable rift forced between a human being and a native place, between the self and its true home : its essential sadness can never be surmounted." উত্তরকালে উদ্বাস্তু নির্বাসিত মানুষ জীবন যতোই সাফল্য পাক, সেই সাফল্য চিরকালের জন্য ক্ষুণ্ণ হয়ে যায়, পিছনে ফেলে রেখে আসা অস্তিত্বের দরুন। ছিন্নমূল উদ্বাস্তুর জীবনের একটি প্রধান সংকট এক দ্বিধা, এক দোলাচল, এক দ্ব্যর্থতা নিয়ে—অতীত আর বর্তমানে মধ্যে, 'তখন' আর 'এখন'-এর মধ্যে। এক দোলাচলতার কথা প্রদীপ কুমার বসু তাঁর Partition–Memory begins Where History Ends প্রবন্ধেও লক্ষ্য করেছেন। "The displacement, thus forces the subject to remain suspended, hanging between the two worlds." একদিকে সে বর্তমানে বাঁচার কাজে ব্যস্ত থাকে, অন্যদিকে 'remains nostalgic and sentimental'।

Writing, Across Worlds প্রবন্ধ সংকলনের অন্তর্গত পল হোয়াইটের লেখা Geography, Literature and Migration প্রবন্ধে যে-কথা বলা হয়েছে সেই কথার সত্য আমরা বারে-বারে পূর্ববঙ্গ থেকে চলে আসা মানুষের জীবনে লক্ষ্য করি। বাস্তুহারা মানুষ নতুন জায়গায় এসে 'attempts to re-create elements of former lives'। হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'উদ্বাস্তু' বই থেকে জানি, খুলনা জেলার

বারাকপুর বর্ধিষ্ণু হিন্দুপ্রধান গ্রাম ছিল। সেই গ্রামের অধিবাসীরা পশ্চিমবঙ্গে চলে এসে নিজেদের উদ্যোগে যে উপনিবেশ প্রতিষ্ঠা করে তার নাম দেওয়া হয় নববারাকপুর। 'পূর্ব পাকিস্তানে অবস্থিত সমগ্র বারাকপুর গ্রামখানিকে যেন স্থানান্তরিত করে এখানে আনা হয়েছিল।' এমনকি সেই আদিগ্রামের কালীবিগ্রহও উপনিবেশের কেন্দ্রস্থলে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছিল। 'হস্তান্তর' গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে শংকর ঘোষ লিখেছেন, "শরণার্থীরা শুধু একটি পরিবার নয়, পুরো একটা পাড়া বা একটা গ্রাম নিরাপত্তার সন্ধানে চলে আসছিলেন এবং সীমান্ত অতিক্রম করার পর খোলা আকাশের নীচে হলেও একসঙ্গে থাকার চেষ্টা করছিলেন। এই চেষ্টার অর্থ ছিল তাঁরা তাঁদের অভ্যস্ত পরিবেশ থেকে বিচ্ছিন্ন হতে চাইছিলেন না, অজানা জায়গায় চারপাশে কিছু পরিচিত মুখ দেখতে পেলেও তাঁরা কল্পনা করতে পারতেন যে পুরনো অভ্যস্ত জীবন থেকে তাঁরা একেবারে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েননি।" তাই কলকাতার নিকটবর্তী কলোনিগুলিতে পালাগান, কথকথা, নিমাইসন্ন্যাস, যাত্রাগান পরিবেশিত হতো কলোনিবাসীদের দ্বারা; উদ্বাস্তুরা যেন এইভাবে হারিয়ে-যাওয়া দেশকে তুলে আনত নতুন উপনিবেশে। এইভাবে পূর্ববঙ্গ-আগত মানুষেরা যেন পিঠে করে বয়ে নিয়ে এসেছিল তাদের 'দেশ'। প্রদীপকুমার বসু সম্পাদিত *Refugees in West Bengal* সংকলনে মানস রায় Growing up Refugees : One Memory and Locality রচনায় নেতাজি কলোনির কথা প্রসঙ্গে লিখেছেন, ''In the beginning the people tried to re-create their *desher bari* in Netaji Nagar; the landscape of Netaji Nagar was the landscape of nostalgia''. ফেলে-আসা দেশের স্মৃতি নিয়ে উদ্বাস্তু মানুষেরা নতুন করে গড়ে তুলতে চেয়েছে তাদের ভিটে, ছিন্নমূল মানুষেরা এইভাবে ছুঁয়ে থাকতে চেয়েছে তাদের দূরের মূলকে। তাই রাচেল ওয়েবের তাঁর Re-(creating) the Home : Women's Role in the Development of Refugee Colonies in South Calcutta রচনায় দেখিয়েছেন, কলোনির বাড়িগুলি 'emphasize the village-like ambience'। 'সুপুরিবনের সারি'-র নীলুরা ভাবে, গাঁয়ের সবাই যখন দেশ ছেড়ে কলকাতায় চলে যাবে তখনও সেখানে পাশাপাশি সবার বাড়ি থাকবে। "কলকাতার মধ্যেই আমাদের গোটা গ্রামটাকে দেখতে পাবি তখন, বুঝলি?"

বাংলা-বিহার সীমান্তে এক সেনানিবাস যুদ্ধশেষে পরিত্যক্ত ছিল, সেখানেই গড়ে উঠেছে 'বকুলতলা পি. এল. ক্যাম্প'। সেই ক্যাম্প নিয়ে ঐ নামে উপন্যাস নারায়ণ সান্যালের। এই ক্যাম্পের বাসিন্দারা নদীমাতৃক দেশের মানুষ; নলকূপের জলে তাদের তৃষ্ণা মেটে, প্রাণ ভরে না। বুড়োরা ক্যাম্পের পুকুরের জলের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে। বালক-কিশোরেরা, যেমন দেশের বাড়ির পুকুরে ঝাঁপিয়ে পড়ত, তেমনি ঝাঁপিয়ে পড়ে সাঁতার কাটে। এই নদীমাতৃক দেশের মানুষগুলির অনুভূতির গভীর

প্রকাশ আছে অমিয়ভূষণের 'নির্বাস' উপন্যাসে। 'পদ্মাকে না পেলে তার তীরেই এতটুকু স্থান করে নেবার জন্য এরা আকুলিবিকুলি করছে। মা তাড়িয়ে দিয়েছে, তবু যেন মা কথাটিকে ভোলা সম্ভব নয়। পদ্মা যে দেশে প্রবাহিতা সেটাই দেশ। তার বাইরে পৃথিবী আছে, দেশ নেই।' পদ্মা তার আত্মীয়-স্বজন, তার শাখানদী উপনদী সবাইকে নিয়ে। মহাশ্বেতা দেবীর 'কাগাবগাগীতিকা'-র মোহিনী পূর্ববঙ্গকে এখানে তুলে আনতে চায়। সেইসব ফুলের গাছ লাগাবে, তেমনি লক্ষ্মীর আসন পাতবে, তেমনি কাঁসার গেলাসে জল খাবে। অমর মিত্রের 'দমবন্ধ' গল্পের প্রভাময়ীর মন পড়ে থাকে পুব বাংলায়। ট্রানজিস্টারে সে ফেলে-আসা দেশের খবর শোনে, কোথায় কোন বাসরুট খুলল তারও খবর রাখে। তার ঘরের মধ্যে চলে আসে যেন ফেলে আসা নদীর গন্ধ। খাঁটি খুলনার ভাষা তার কানে গেলে প্রভাময়ী চমকে ওঠে। স্মৃতি উন্মথিত হয়, সে ভাবে 'কত দিকে কতভাবে যে শিকড় যেতে পারে।' শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের 'পারাপার' উপন্যাসে ললিতের মা শুধু 'নদী, নৌকা আর গাছগাছালির গল্প' করে, ঘুম আর স্বপ্নের মধ্যে তার ঘটে যেন 'এক অলৌকিক নিরুদ্দেশ যাত্রা।' দীর্ঘ দিন কলকাতা শহরে কাটিয়েও একজন কবি ভুলতে পারেন না ঝুমকাফুলের মাঝখানে ঠাকুরদার মঠের কথা। 'শব্দকুহক, নৌকাকাঙাল, খোলা আজান বাংলাদেশের' হয়তো ভোরের নিদ্রায় হানা দেয়। 'দোলে স্মৃতি দোলে দেশ দোলে ধুনুচির অন্ধকার'। ২০০০ সালের শারদীয়া 'বারোমাস'-এ মানস রায়ের একটি রচনা আছে, তার নাম 'কাটা দেশে ঘরের খোঁজ'। এই প্রবন্ধে পড়ি লেখকের বাবা পি. কে. দে সরকারের গ্রামার বই থেকে ছেলেকে অনুবাদ অনুশীলন করতে দেন। 'আমাদের দেশের বাড়ির উঠানে একটা আমগাছ ছিল'—এই বাক্য পড়তে গিয়ে বাবার চোখে আর্দ্র হয়ে আসে, গলার স্বর ন্যুব্জ। কাটা-দেশ নিয়ে বেদনায় পীড়িত হয় হাসান আজিজুল হকের 'একটি নির্জলা কথা' গল্পের সব-হারানো নারী। "কুন্ দোজখিরা দ্যাশ ভেঙেছে, তাতে আমার কী?" গলায় দড়ি বেঁধে তাকে যেন টানতে টানতে পশ্চিম থেকে পূর্ববাংলায় নিয়ে আসা হয়েছে। "আমার মাটিটো ক্যানে কেড়ে লিবি; আমার পুকুরটো, ঘাটটো, মাঠটো, বাগানটো ক্যানে কেড়ে লিবি?" মাটি কেড়ে নেয় যদিও, তবু অবচেতন স্মৃতিলোকে থেকে যায় সব। তাই শঙ্খ ঘোষের কবিতায় বারেবারে আসে ফেলে-আসা দেশের সুপুরিবনের কথা, ঠাকুরদার মঠের কথা, 'গায়ের সামনে এসে দাঁড়ায় ছইহারা নৌকো/চুপ করে থাকে বৈঠা.....।' বহুদিন পরে কীর্তনখোলা নদীর ধারে দাঁড়ালে কবির মনে হয়, 'আমার শরীর শুধু জেগে ওঠে তার কাছে গেলে।' অর্ধ-শতাব্দী পরে ফিরে এলে মনে হয়,

তোমার মাটির কাছে পড়ে আছে পঞ্চাশ বছর
সে-মাটির নাম আজ মনে পড়ে বহুদিন পরে
সে-মাটির নামে আজ বয়স ভেঙেছে সব বাঁধ।

তবুও তোমার কাছে যাবার পাইনি কোনো পথ
তোমার হৃদয় আজ হয়ে আছে হৃদয়ের মঠ। (মঠ)

১৯৫০ সালে দৈনিক 'যুগান্তর' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল 'ছেড়ে আসা গ্রাম' নামে অনেক রচনা। পূব বাংলা ছেড়ে আসা মানুষেরা এইসব রচনাগুলিতে বলেছিলেন তাঁদের ছেড়ে আসা গ্রামের স্মৃতি। পরে এই শ্রুতিলিখনগুলি দক্ষিণারঞ্জন বসুর সম্পাদনায় দুই খণ্ডে সংকলিত হয়। প্রায় প্রত্যেকটি লেখায় নিজের গ্রামের কথা বলা হয়েছে মায়ের উপমায়। কথকেরা আলাদা-আলাদা মানুষ, কিন্তু আশ্চর্য তাঁদের অনুভূতির ঐক্য। ফিরে-ফিরে উচ্চারিত হয় একই রকমের বাক্য। 'মায়ের মতো ভালোবেসেছি এই গ্রামকে।' 'মাটির মাকে হারানোর ব্যথা ভুলবো কি করে?' 'মায়ের কোলে যেমন শিশুর সুখের সীমা নেই, তেমনি সুখ ছিল আমাদের পল্লীমায়ের কোলে।' 'গ্রাম নয়। জননী।' 'আমার স্বপ্নে থাকা মাটির মাকে মা বলে ডাকবার অধিকারও যেন আজ আমি হারিয়ে ফেলেছি।' একজন বলেছেন, 'যে মাটি আমাকে বক্ষে ধরেছে, যে বাতাস ঘোষণা করেছে আমার জন্মবার্তা—তাকে আমি কেমন করে ভুলবো, তার স্পর্শ যে আমার অস্তিত্বের অণুতে অণুতে মিশে রয়েছে। আমার গ্রামের প্রতিটি ধূলিকণা, প্রতিটি জলবিন্দু, প্রতিটি লতাগুল্মের সঙ্গে আমার নাড়ির যোগ।' অন্য জন বলেন, 'দেশবিভাগের ফলে সেই মাটির মাকে হারিয়েছি।' গভীর বেদনায় একজন মন্তব্য করেন, 'এইসব গ্রাম পদ্মাগর্ভে যাওয়াও যা, পাকিস্তানের কুক্ষিগত হওয়া প্রায় তাই।' দেশভাগে মা-ই যেন ধর্ষিতা হলো।

এই ধর্ষণের জন্য দায়ি করা হয়েছে যদিও সমষ্টিগতভাবে মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষকে, তবু দেখা যায় এইসব রচনায় অনেক মুসলমান ধর্মাবলম্বী ব্যক্তিমানুষের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা। সেই ইতর অবিশ্বাসের দিনগুলিতেও এই শ্রদ্ধা যে অনেক ক্ষেত্রে অক্ষুণ্ণ ছিল সেটা শ্রদ্ধার সঙ্গে মনে রাখতে হবে। কাঁচাবালিয়া গ্রাম নিয়ে যিনি বলেছেন, তিনি স্মরণ করেছেন মজিলসাহেব আর শহিদসাহেবের কথা। অভিমানভরে প্রশ্ন করেছেন গ্রামছাড়ার সময় তাঁরা আরো নিবিড়ভাবে বাধা দিলেন না কেন? চাঁদসী গ্রামের হিন্দুদের দেশত্যাগে যে বাধা দিয়েছিলেন মুসলমান মাতব্বরেরা সেকথা স্মরণ করা হয়েছে। রায়নগরের বাসিন্দা স্মরণ করেছেন বড় হাজীর কথা। তাঁর মেহেদিরঙের দাড়ি ছিল, আর চোখে ছিল সরল বিশ্বাসের ছাপ। 'চোখ এমন করে হাসতে জানে—একথা এর আগে আমার জানা ছিল না।' শেষরাতে তার উদাত্ত কণ্ঠের আজান পাতলা ঘুমের আস্তরণ ভেদ করে কানে এসে ধ্বনিত হতো। শিলাইদহ গ্রাম নিয়ে যিনি বলেছেন, তিনি বলেছেন গফুরমাস্টার আর জব্বরমুন্সির কথা। ভেড়ামারা গ্রামের গরিব প্রজা আলিমুদ্দিন আর কলিমুদ্দিন দেশত্যাগে বাধা দিয়েছে—'জমি জায়গা বিক্রি করবেন না বাবু। দেশ ছেড়ে কোথায় যাবেন?' দীর্ঘ দিনের প্রতিবেশী,

যাঁরা সবাই সুখে-দুঃখে একসঙ্গে জড়িয়ে ছিলেন, তাঁদের একদলের বাস্তুত্যাগে অনেক শুভবুদ্ধিসম্পন্ন ইসলাম-ধর্মাবলম্বী মানুষ ব্যথিত বোধ করেছেন। শহীদুল্লা কায়সরের উপন্যাস 'সংশপ্তক'-এ সেকান্দার মাস্টার হিন্দুদের গ্রাম ছাড়ার জন্য দায়ি করে স্বধর্মের রমজান নামের বেইমান হার্মাদকে। "মাত্র দুদিনের মাঝে ফাঁকা হয়ে গেল অতবড় তালতলি। ...ধর্ম না হয় আলাদা, তাই বলে কি ওরা মানুষ নয়? ওরা এদেশের মাটির সন্তান নয়? হাজার বছর সুখে-দুঃখে এক সাথে থাকিসনি? আর সেই মানুষগুলোর দুর্দশার সুযোগ নিয়ে এমন বেইমানি করলি তুই? লাখ লাখ টাকার আমানত স্রেফ জবত করে নিলি?" গোটা তালতলিতে ঘুঘু চরছে। দত্তবাড়িতে রমজান, মিত্তিরবাড়িতে সুলতান মিঞা, ভট্‌চার্যিবাড়িতে কালুশেখ গুছিয়ে বসেছে। পুব বাংলার ব্যথিত মুসলমান-বাঙালির হয়ে কবি জসীমউদ্দিন 'বাস্তুত্যাগী' কবিতায় লিখেছেন, 'দেউলে দেউলে কাঁদিছে দেবতা পূজারীরে খোঁজ করি', তুলসীতলা জঙ্গলে ভরা, দোলমঞ্চে ফাটল, পদ্ম-দীঘির জল রাঙামেয়ের 'আলতা-ছোপানো চরণদুখানি'র কথা ভুলতে পারে না।

ফিরে এসো যারা গাঁও ছেড়ে গেছো, তরুলতিকার বাঁধে,
তোমাদের কতো অতীত দিনের মায়া ও মমতা কাঁদে।
সুপারির বন শূন্যে ছিঁড়িছে দীঘল মাথার কেশ,
নারকেলতরু উর্ধ্বে খুঁজিছে তোমাদের উদ্দেশ।...
অতীতে হয়তো কিছু ব্যথা দেছি, পেয়ে বা কিছুটা ব্যথা,
আজকের দিনে ভুলে যাও ভাই, সেসব অতীত কথা!

পল্লীকবি গান গেয়েছে—'রামরহিম না জুদা কর ভাই/দিল্‌টা সাচ্চা রাখো জী।' 'তমস' উপন্যাসেও হায়াত বকস্‌ লক্ষ্মীনারায়ণকে বলে, যতোক্ষণ হায়াত আছে ততোক্ষণ কেউ তার কেশাগ্র স্পর্শ করতে পারবে না।

দীপেশ চক্রবর্তী 'ছেড়ে আসা গ্রাম' রচনাগুলির একটি চমৎকার সমালোচনা করেছেন পূর্বোল্লেখিত Remembered Villages : Representation of Hindu Bengali Memoirs in the Aftermath of the Partition প্রবন্ধে। একথা সবাই জানে যে, বন্যার মতো পূর্ববঙ্গ আগত মানুষ যখন ছিন্নমূল হয়ে পশ্চিমবঙ্গে চলে আসে তখন তারা খুব সাদরে অভ্যর্থিত হয়নি। মণিকুন্তলা সেন তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছেন, উদ্বাস্তুদের 'অভ্যর্থনা যে অবাঞ্ছিত মানুষের মতোই হয়েছিল তাতে কোন ভুল নেই।' দীপেশ চক্রবর্তী অনুমান করেন, ছেড়ে আসা গ্রাম রচনাগুলি প্রকাশের উদ্দেশ্য ছিল সংবাদপত্র-পাঠকদের মনে এইসব বাস্তুহারা মানুষগুলি সম্বন্ধে সহানুভূতি জাগানো। দেশভাগ-জনিত যে 'sense of tragedy' তা সংকলিত লেখাগুলিতে ধরা পড়েছে। দীপেশ চক্রবর্তী সঙ্গে সঙ্গে দেখিয়েছেন, এই পল্লীস্মৃতির দুটো দিক আছে—

একদিকে গৃহকাতরতা, অন্যদিকে 'sense of trauma'। এই রচনাগুলিতে প্রকাশ পেয়েছে একটা 'stunned disbelief'; যে হঠাৎ তাঁদের শৈশবের পরিচিত জগৎ থেকে বিচ্যুত হয়ে এইভাবে অনির্দেশ্যের উদ্দেশে ভেসে যেতে হলো। নিজেদের গ্রামকে উপস্থাপিত করা হয়েছে পবিত্রতা আর সৌন্দর্যমণ্ডিত বলে; দেশভাগে ঘটে গেল যেন স্বর্গ থেকে দুঃস্বপ্নের মতো জবরদস্তি প্রস্থান। প্রফুল্ল রায়ের 'কেয়াপাতার নৌকো' উপন্যাসে পুববাংলায় এসে পশ্চিমবাংলার মানুষ 'অবনীমোহন—মুগ্ধ, বিস্মিত, চমৎকৃত। বাঙলাদেশের এমন একটা স্নিগ্ধ মনোরম রূপ যে থাকতে পারে কোনদিন তিনি তা কল্পনাও করেননি।' স্বনির্বাচিত এই সুপবিত্র নন্দনকানন থেকেও অবনীমোহনকে উৎখাত হতে হয়েছিল। চলে আসার দিন বিনুর চোখ থেকে ঠাকুরদা হেমনাথ, এই প্রসন্ন পুরুষটি, আর নিবিড় লাবণ্যময় দেশ মুছে যেতে থাকে। কৈশোরের এই রম্যভূমি, যৌবনের এই স্বর্গে তার কোনদিন ফেরা হয় না। দেশভাগের ফলে সেইসব পবিত্র-সুন্দর গ্রাম, মাতৃভূমির প্রতিভূ এই গ্রামগুলি যেন ধর্ষিত হয়েছিল। ঠিকই বলেছেন দীপেশ চক্রবর্তী, এইসব গ্রামের সৌন্দর্যবর্ণনা, যা আমরা গ্রাম ছেড়ে আসা এই কথকদের বর্ণনায় পাই, তা ততো স্বকীয় উপলব্ধিজাত নয়, যতো বঙ্কিমচন্দ্র রবীন্দ্রনাথ ইত্যাদির রচনা পড়ার ফল। এই রচনাগুলিতে আরো আছে গ্রাম-শহরের বৈপরীত্যের প্যাটার্ন। গ্রামগুলি যুগপৎ 'an ideal and an idyll' তার উলটোদিকে রয়েছে সবুজহীন নিরানন্দ শহর, যেখানে উদ্বাস্তু মানুষগুলি আজ প্লাটফর্মে কলোনিতে মাথা গুঁজতে বাধ্য হয়। ১৯৩৪ সালে লেখা কবিতাগুলি যখন জীবনানন্দের মৃত্যুর বেশ পরে 'রূপসী বাংলা' নামে প্রকাশিত হলো, তার অভূতপূর্ব জনপ্রিয়তার পিছনেও হয়তো রয়েছে এই গৃহকাতরতা। এইসব চরণ দেশ ছেড়ে আসা মানুষের মনে জাগাচ্ছিল তীব্র অনুরণন—'তোমরা যেখানে সাধ চলে যাও—আমি এই বাঙলার পারে/রয়ে যাব....।' থেকে যাওয়া যে যায়নি তার জন্যেই কাতরতা; সেই জন্যে যে বাংলা হারিয়ে গেছে তার চিরন্তন মূর্তিটি 'রূপসী বাংলা' কাব্যগ্রন্থে বাঙালি আস্বাদন করে চলেছে। জীবনানন্দ দাশের 'জলপাইহাটি'-র নায়ক নিশীথ দেশভাগের পর সে আবার কলকাতায় এসেছে চাকরির খোঁজে। কিন্তু 'কলকাতার চেয়ে মফস্বলের প্রকৃতিলোক ঢের ভালো লাগে তার। সেইসব মানুষদেরও ভালো লাগে কার্তিকের বিকেলের রোদে, চোত-বোশেখের শেষ রাতের ফটিক জলের মতো জ্যোৎস্নায়।' সমরেশ বসুর 'নিমাইয়ের দেশত্যাগ' গল্পের চরিত্র ভাবতেই পারে না নিমগাঁ তাদের দেশ নয় আর, এখন তাদের দেশ কলকাতা! 'নিমগাঁ-নিমগাঁ! সে দেশ নাকি আর তাদের নয়। কইলকাত্তা হইল দেশ। ইস কয় কি!' শঙ্খ ঘোষের কবিসত্তা যখন শহরের ভাঙা অ্যাসফল্টে-অ্যাসফল্টে ঘুরে বেড়াবে, তখনও তাকে ঘিরে থাকবে গ্রামের তুলসীর, সাঁকোর কিংবা সুপুরির হাওয়া। এই গৃহকাতরতায় এখনও কবি অরবিন্দ গুহ

বলেন, 'আমার মৃত্যুর মুহূর্ত পর্যন্ত বরিশাল আমার স্বদেশ থেকে যাবে।' 'ছেড়ে আসা গ্রাম'-এ সংকলিত রচনাগুলি সম্পর্কে দীপেশ চক্রবর্তীর সবচেয়ে বড়ো সমালোচনা, 'অপর'-এর আহ্বানের প্রতি হিন্দু-বাঙালির ঐতিহাসিক বধিরতার সাক্ষী এইসব লেখা। কেন হিন্দু-বাঙালিকে দেশত্যাগ করতে হলো সেই সম্পর্কে আলোচনার সময় আমাদের এই বিষয়ে আলোকপাত করতে হবে।

আসতে না-চাওয়া, চলে-আসা

শিকড় তার শাখাপ্রশাখা নিয়ে মাটির মধ্যে গভীরভাবে গাছটাকে বাঁধে। বদ্ধমূল মানুষ নিজের মাটি, ঘর-গৃহস্থালি, প্রতিবেশী, পরিচিত দিগন্ত-আকাশ ছাড়তে চায় না। দেশভাগ হলো, কিন্তু দেশত্যাগ করতে চায়নি বহু মানুষ। শান্তিতে সমঝোতায় দেশ যদি ভাগ হতো, তাহলে ভারতবর্ষকে খণ্ডিত করে দুটো নতুন রাষ্ট্র তৈরি হতো বটে, কিন্তু হিংসা-রক্তপাত হতো না, মানুষ ছিন্নমূল হতো না। দেশভাগের সাহিত্যে, দেশভাগের ইতিহাসে এমন কিছু মানুষের কথা আমরা পাই, যারা এমনকি হিংসা-বিদ্বেষ সত্ত্বেও নিজের আজন্ম পরিচিত জগৎ থেকে উৎখাত হতে চায়নি। শিল্পী সতীশ গুজরাল তাঁর Crossing the Jhelum রচনায় লিখেছিলেন, তাঁর পরিবারের বড়োরা ভেবেছিলেন পনেরোই আগস্ট জিন্নাহ্-র স্বপ্ন চরিতার্থ হলে সব ঠিক হয়ে যাবে। তাঁরা লাহোরে থেকে যাবেন বলেই ভেবেছিলেন। পরে হীর সিং-এর হাবেলি কাবুলি উপজাতীয়দের দ্বারা আক্রান্ত হলে, তাঁর পরিবারবর্গ মারা গেলে সতীশের বাবা দেশত্যাগের সিদ্ধান্ত নেন। এইসব মানুষের উদাহরণ থেকে বুঝতে পারি আরো এমন অনেক মানুষ ছিল সেদিন।

ঋতু মেনন ও কম্‌লা ভাসিনের বইতে আমরা কৃষ্ণা থাপারের কথা পাই। এই কৃষ্ণা থাপারের বাবা বলেছিলেন, আগুন নিবে যাবে, কিছু হবে না শেষ পর্যন্ত। এমনভাবে দেশ খণ্ডিত হতে পারে না, এমনভাবে ছিন্নমূল হতে পারে না মানুষ। তিনি ঠাঁইনড়া হতে চাননি। একই বইয়ের মধ্যে আমরা নির্মল আনন্দ্-এর কথা পাচ্ছি। দেশভাগের পর নির্মলের বাবাও লাহোর ছেড়ে আসতে চাননি। তিনি মনে করতেন পাকিস্তানে মুসলমানদের সঙ্গে মানিয়ে চলে জীবনযাপন করতে তাঁর কোনও অসুবিধা হবে না। কেউ-কেউ যারা নিজের জায়গা ছেড়ে গিয়েছিল, তারাও ভেবেছিল আপাতত ছেড়ে যাচ্ছে বটে, কিন্তু অচিরেই ফিরে আসবে আবার। ফিরে আসবে নিশ্চিত হওয়ায় কোনও দামি জিনিসপত্র সঙ্গে নিয়ে যায়নি তারা। কিন্তু অপ্রত্যাশিত ঘটনাচক্রের ঘূর্ণাবর্তে নিঃসম্বল এই মানুষগুলির আর ফিরে আসা হয়নি। দেশভাগ স্থায়ী হতে পারে এটাও অনেকে ভাবেননি। নেহরু লিওনার্ড মোজলেকে বলেন 'partition would be temporary'। মৌলানা আজাদ নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সভায় বলেন, 'it is

going to be a short-lived partition'। যেমন ভেবেছিলেন দেশনায়কেরা, তেমনি ভেবেছিল সাধারণ মানুষ।

দেশজোড়া উন্মত্ততা যেদিন জলবাংলার এই স্নিগ্ধ শ্যামল ভুবনেও রক্তের সমুদ্রকে টেনে নিয়ে এল, সেদিনও 'কেয়াপাতার নৌকো' উপন্যাসের হেমনাথ দেশ ছাড়তে রাজি নয়। কোনও অন্যায় তো সে করেনি, তবে কেন সে দেশ ছাড়বে? হেমনাথ দায়বদ্ধ মানুষ, সে মনে করে তার মতো প্রভাবশালী মানুষও যদি বাস্তুত্যাগ করে চলে যায়, তাহলে যে দশ-বিশ ঘর হিন্দু এখনো রয়ে গিয়েছে তারা নিরাশ্রয় বোধ করবে। 'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে' উপন্যাসে সোনা যখন বলে দেশভাগের পর এদেশে থাকলে মান-সম্ভ্রম থাকবে না, তখন সোনাকে উলটে প্রশ্ন করা হয়, পরিচিত পুকুর, অর্জুন গাছ, ঠাকুরদার চিতার উপর বেদী, বর্ষাকালে নদীর জল, শীতের মাঠ, তরমুজের জমি ফেলে চলে যেতে পারবে কি সে? 'সুপুরিবনের সারি' উপন্যাসে নীলুর দাদু পরম বেদনায় বলে, "কাছারিবাড়ির পিছনে সুপুরি বনের সারি, এক একটা করে ওর সবকটা আমার নিজের হাতে লাগানো....ওইখানে পড়ে আছে বাবার মঠ, ঠাকুরদার মঠ, এখনো তোর মা ওখানে নিত্য গিয়ে পিদিম জ্বালিয়ে আসে। এইসব ছেড়েছুড়ে দিয়ে, বলতো আমি যাই কোথায়....।" অনেক পরে দেশ ছেড়ে আসা মিহির সেনগুপ্ত একই প্রশ্ন করেন, 'সবাই আমাকে এ দেশ ছেড়ে ভাগ্যের সন্ধানে অন্য এক দেশে চলে যেতে বলছে, আমি কি সেখানে যাব? এই দেশ, এই নদী, এই গাছপালা, এই প্রান্তর আমি বড়ো ভালোবাসি। এখানে সহস্র অপমান সত্ত্বেও, একে ছেড়ে যেতে ইচ্ছে হয় না। যদি ছেড়েই যেতে হয়, পিছাবার খালের স্মৃতির মতো, এইসব নদী, সব খাল, সব আয়োজনই এক সময় আমার স্মৃতিই হয়ে থাকবে।' যেখানে মানুষের স্মৃতি আর সত্তা আষ্টেপৃষ্ঠে জড়ানো, মানুষ চায় সেখানেই তার ভবিষ্যৎও রচিত হোক। কিন্তু ইতিহাসের ঘূর্ণিঝড় যখন ওঠে, যে ঝড়ে সাধারণ মানুষের কোনও ভূমিকা থাকে না, সেই ঘূর্ণিঝড় তার ভবিষ্যতের স্বপ্নকে উন্মূলিত করে দেয়। অমিতাভ ঘোষের *The Shadow Lines* উপন্যাসে আখ্যান-বর্ণনাকারী বালকের ঠাকুমার জ্যাঠামশাই শেষ পর্যন্ত ঢাকায় থেকে গিয়েছিল। বেচারা বুড়ো মানুষটি, নিতান্ত একলা ঐ দেশে পরিত্যক্ত হয়ে মুসলমান পরিবেষ্টিত হয়ে জীবনযাপন করছে এই ভেবে ঠাকুমা খুব বিচলিত। জ্যাঠামশাই ওখানে এখন উকিলবাবু নামে পরিচিত। তার বিশাল বাড়ির এক কোণে তাদের মাথা-গোঁজবার ঠাঁই দেওয়া হয়েছে এই কৃতজ্ঞতায় রিকশাচালক খলিলের পরিবার তার দেখাশোনা করে। খলিলের বউ বেঁধে না দিলে তার খাওয়া জুটত না। তার দশফুটের মধ্যে মুসলমানের ছায়া পড়লে একদা যে-মানুষের খাবার অশুচি হয়ে যেত, সে আজ খলিলের বউয়ের রান্না খায়। সেই নাছোড় বুড়ো দেশত্যাগে নারাজ—'Once you start moving you never stop'. তাকে দেশ থেকে জোর করে আনতে গিয়েই ঘটে গেল বিপত্তি। কালীকৃষ্ণ গুহ তাঁর স্মৃতিকথায়

('তিরপূর্ণি', মাস ১৪১১) লিখেছেন, দেশভাগের পর এতসব সম্পত্তি বাড়িঘর ফেলে রিফিউজি হওয়ার পরামর্শ তাঁর ঠাকুরদার কাছে বিষবৎ লাগত। তাঁর অনুরাগী প্রভাবশালী মুসলমানরাও তাঁকে দেশ না-ছাড়ার পরামর্শ দিতেন। কিন্তু 'একদিন দেখা গেল আমাদের অতি ঘনিষ্ঠ মুসলমান পরিবারের একটি যুবক দু-তিনজন বন্ধু নিয়ে আমাদের একটা নারকেল গাছে উঠে দুপুরবেলা নারকেল পাড়ছে। হয়তো তারা নারকেল চুরি করতেই এসেছিল। কিন্তু ধরা পড়ার পর সে সদর্পে ঘোষণা করলো যে সব গাছই তাদের অর্থাৎ মুসলমানদের, কেননা পাকিস্তান তো হিন্দুদের দেশ নয়।' প্রশাসনিক হস্তক্ষেপ হলো, সেই মুসলমান পরিবারের লোকেরা ক্ষমাও চাইলেন। কিন্তু 'সে-ই প্রথম আমাদের কাছে স্পষ্ট করে দিল দেশভাগের একটা মানে।' এই ছোট ঘটনায় অস্তিত্বের ভিত নাড়া খেয়ে গেল।

কিন্তু যারা শারীরিকভাবে জন্মভূমিতে থেকে যায়, তারাও কি মানসিকভাবে থেকে যায়, নাকি দ্বিখণ্ডিত হয়ে যায় তাদের সত্তা, যেমন দেশ দ্বিখণ্ডিত হয়ে গেল? যেমন বলেছিল অমলেন্দু চক্রবর্তীর 'স্বদেশে সংসারে' গল্পের পাকিস্তানে থেকে যাওয়া হিন্দু ডাক্তার অবিনাশ, 'নিজেরে দুই ফালা কইরা বাচন যায় না।' অমর মিত্রের 'বনহংসীর দেশ' গল্পে বলা হয় 'মাটিই যখন ভিন্ন, টাকা-পয়সা, পতাকা সব যখন ভিন্ন, তখন কি আর ভাইবোন এক থাকে...।' তেমনি দুই খণ্ড হয়ে গিয়েছিল উর্বশী বুটালিয়ার আপন রাণামামা। পরিবারের সবাই যখন ভারতে চলে এল দেশভাগের দুর্যোগের দিনে, তখন রাণামামা পৈতৃক বাড়ির লোভে লাহোরে থেকে গেলেন। নিজের মাকেও জোর করে নিজের কাছে রেখে দিলেন। ধর্মান্তরিত না হলে পাকিস্তানে থাকা যেত না, তাই তিনি ধর্মান্তরিত হন, মাকেও ইসলাম ধর্ম গ্রহণে বাধ্য করেন। যে-বৃদ্ধা নিয়মিত পূজাপাঠ করতেন, তিনি যখন ছেলের চাপে ধর্মান্তরিত হলেন, তখন তাঁর মানসিক অবস্থা কেমন হলো সেটা অজ্ঞাতই থেকে গেল। রাণামামা এক মুসলমান রমণীকে বিয়েও করেন। অনেক পরে যখন বুটালিয়া লাহোরে গিয়ে তাঁর রাণামামার সঙ্গে দেখা করেন, তখন তিনি নিভৃতে জানান, গত চল্লিশ বছর এক রাতও তিনি ঘুমোননি 'without regretting my decision'। ভারত-পাকিস্তান ক্রিকেট খেলা হলে তিনি মনে মনে ভারতকে সমর্থন করেন। ভারতকেই তিনি তাঁর স্বদেশ মনে করেন, লাহোরে নিজের পরিবারের মধ্যে তিনি প্রবাসী। উর্বশীর মা অর্থাৎ রাণামামার দিদি সুভদ্রা, নিজের মাকে অর্থাৎ উর্বশীর দিদিমাকে লাহোরে রেখে এসেছিলেন বলে অনুতপ্ত; ভাই যে জোর করে নিজের স্বার্থে মাকে রেখে দিয়েছিলেন সেই নিষ্ঠুরতার জন্য ভাইকে তিনি কোনওদিন ক্ষমা করতে পারবেন না। আজ দীর্ঘ দিনের ব্যবধানে সেই ভাই দিদিকে বলেছিলেন, ধর্মান্তরিত হওয়ার পর এক রাত্রিও তিনি শান্তিতে ঘুমোননি। এই বাড়ির প্রতিটি ইট তাঁকে যেন অভিশাপ দেয়। "I rejected what was mine and I have not been accepted by the faith I adopted." জন্মভূমিতে থেকেও তিনি নেই,

যেন তিনি নির্বাসিত; ত্রিশঙ্কু তাঁর অবস্থান। সুভদ্রার মনে হয়েছিল তাঁর ভাই যেন অসহায় 'a fugitive caught in his own trap'। দুই ভাগ হয়ে গিয়েছিল গল্পকার অভিজিৎ সেনের পরিবার। অভিজিৎ ভাই দিদিদের নিয়ে চলে আসেন পশ্চিমবঙ্গে। বাবা-মা, ছোট ভাইরা থেকে যায় পুব বাংলায়। চোদ্দ বছর দেখা হয়নি, চোদ্দ বছর কিশোর ছেলে মাকে মা বলে ডাকার সুযোগ পায়নি। এই বিচ্ছেদ তার জীবনের এক দ্যোতক ঘটনা, যা এমন এক একাকিত্বের জন্ম দেবে যা থেকে পুরোপুরি বেরিয়ে আসা সম্ভব হবে না কোনওদিনই। হজরতবাল-ঘটিত দাঙ্গার ফলে বাবা-মা-ও পরবর্তীকালে সবাইকে নিয়ে চলে আসেন। দুই ভাই স্টেশনে গিয়ে জীর্ণ সন্ত্রস্ত মানুষদের মধ্যে বাবা-মাকে চিনে বের করতে পারে না। 'ওই বৃদ্ধকে কি সেই লোকটির মতো দেখতে নয় যে চোদ্দ বছর আগে আমাদের বাপ ছিল?' সঙ্গে-আসা ছয় ভাইবোনের মধ্যে চার জনকে তারা কখনো দেখেইনি। চোদ্দ বছরের এই দুস্তর ব্যবধান কি আর কোনও মতেই ঘোচানো যায়?

মেনন ও ভাসিন দুঃখ করেছেন যে, দেশভাগের রাজনৈতিক ইতিহাস প্রচুর লেখা হয়েছে, কিন্তু তার সামাজিক ইতিহাস প্রায় নেই। বাস্তবিক দেশভাগের রাজনৈতিক ইতিহাসে একটা বড়ো আলমারি ভরে যেতে পারে। আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনের কোন দুর্বলতার মধ্যে, হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের কোন্ অর্থনৈতিক শিক্ষাগত ও রাজনৈতিক বৈষম্যের মধ্যে লুকিয়ে ছিল দেশভাগের বীজ, কীভাবে তিন পক্ষের উপরতলার ঘুটি চালাচালি হয়েছে, যার ফলে ঘটলো দেশভাগের মধ্য দিয়ে ক্ষমতার হস্তান্তর তার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ পাই আমরা এইসব বইতে। হিন্দু ধর্মাবলম্বী ভারতীয় ও ইসলাম ধর্মাবলম্বী ভারতীয়ের মধ্যে ছিল অনেক সামাজিক ব্যবধান। দুই পক্ষে ছিল মানসিক দূরত্ব। কাজের জগতে একসঙ্গে কাজ করলেও, সংস্কৃতির কোনও-কোনও ক্ষেত্রে নীচের তলায় সমন্বয়ের ভাবনা গড়ে উঠলেও, তারা যাপন করেছে যেন সমান্তরাল জীবন। যখনই কোনও চাপ সৃষ্টি হয়েছে, তখনই শান্তিপূর্ণ সমান্তরলতা পর্যবসিত হয়েছে বিদ্বেষ-বিভেদে।

দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে এই সামাজিক দূরত্বের কথা বাংলা সাহিত্যে আমরা বারে বারে পাই। গৌরকিশোর ঘোষের 'প্রেম নেই' উপন্যাসের বিলকিস আর টগর খুবই বন্ধু। কিন্তু জলের ঘড়া কাঁখে থাকা অবস্থায় টগরকে বিলকিস ছুঁয়ে দিলে, টগরকে ঘড়া মেজে জলে ডুব দিয়ে নতুন করে ঘড়ায় জল ভরতে হয়। অপ্রস্তুত করুণ চোখে বিলকিস দ্যাখে টগরের ঘড়ার ফেলে দেওয়া জল 'ওদের দুজনের মাঝখানে কেমন একটা মোটা দাগ কেটে' নদীর দিকে নেমে যায়। ঐ জলের রেখার মতো দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে থেকে যায় ভিন্নতার এক সুস্পষ্ট রেখা। পণ্ডিতমশাই মুসলমান ছাত্র ফটিককে জানায়, "তুমি হচ্ছ যবন, আর ধনা হচ্ছে চাঁড়াল। তুমরা দুটোই অস্পৃশ্য।

তুমরা যতক্ষণ ঘরে ততক্ষণ জলস্পর্শ করি কী করে?" চাঁড়ালকেও যে যবন আপন করে দেশে রাখতে পারল না, যবন-চাঁড়ালও যে ঐক্যবদ্ধ হতে পারল না, সে অন্য প্রশ্ন। দেশভাগে বিপন্ন পাঞ্জাবের এক মহিলা জানিয়েছিলেন, মুসলমানদের সঙ্গে সম্পর্ক ভালোই ছিল, শুধু বেটি আর রোটির রিস্তা ছিল না। অর্থাৎ আন্তঃসাম্প্রদায়িক বিয়ে নিষিদ্ধ বলে গণ্য হতো, আর অশুচি বলে গ্রহণ করা হতো না মুসলমানের ছোঁয়া খাদ্য। স্টেশনের প্লাটফর্মে বিক্রি হতো হিন্দু চা, মুসলমান চা, বিতরণ করা হতো হিন্দু জল, মুসলমান পানি। 'তমস' উপন্যাস লেখার বিষয়ে অলোক ভাল্লার সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে ভীষম্ সাহনি জানাচ্ছেন, আর্যসমাজী পরিবারের ছেলে ছিলেন তিনি; মুসলমানেরা তাঁদের অন্তঃপুরে সচরাচর ঢুকতে পারত না। মুসলমান বালকদের সঙ্গে তারা খেলুক, বড়োরা সেটা চাইতেন না। জনৈক বীরবাহাদুর সিং স্বীকার করেছে, এক হাতে কুকুর ছুঁয়ে অন্য হাতে খাবার খেলে দোষ নেই, কিন্তু মুসলমান ছুঁলে খাদ্যবস্তু অপবিত্র হয়ে যায়। বীরবাহাদুরের অনেক পরে মনে হয়, যদি আমরা এক পাত্র থেকে বিনা দ্বিধায় খেতে পারতাম, তাহলে বোধহয় আমরা ঐক্যবদ্ধ থাকতেও পারতাম। আমরা পড়ি গুজরানওয়ালায় হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক নাকি ভালো ছিল, কিন্তু সেখানে মুসলমান প্রতিবেশী যদি হিন্দুবাড়িতে মেঠাই পাঠাত তাহলে সেই মেঠাই হিন্দু মেয়েরা বানালে তবেই পাঠানো যেত। না-জেনে মুসলমান বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিল শিখ দম্পতি হরনাম আর বানটো। তাদের খাবার খেতে হরনাম-বানটো দ্বিধা করে। দ্বিধা ঝেড়ে ফেলে হরনাম পরে অবশ্য খাবার নেয়, আশ্রয়দাত্রীর খাবারকে অমৃতসমান বলে। 'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে' উপন্যাসে ফতিমা উন্মাদ প্রায়শিশু মণীন্দ্রনাথকে নিজের হাতে মিষ্টি খাইয়েছিল। সংস্কার এমনই বদ্ধমূল যে মুসলমান প্রজা ঈশমের তাতে যেন মাথায় বজ্রাঘাত হয়। বাল্যপ্রণয়িণী ফতিমা ছুঁয়ে দিলে সোনাকে বাড়ি গিয়ে স্নান করতে হয়। রঞ্জিত যখন জব্বর-কর্তৃক ধর্ষিত মালতীকে জোটনের আশ্রয়ে নিয়ে আসে, তখন মালতীর আহারের সব জোগাড় করে দেয় মুসলিম মেয়ে জোটন, কিন্তু কোনও কিছু ছোঁয় না। পাছে মালতীয় জাত যায়। 'হিন্দুর ধর্মাধর্ম এই। অন্য জাতি ছুঁলে জাত বাঁচে না।' জ্যেতির্ময়ী দেবীর 'এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা' উপন্যাসে বালিকা বন্ধুরা এক সঙ্গে খেলে, আম কুড়োয়। কিন্তু মুসলমান বালিকা বলে, "ভাই ওরা হিন্দু, আমাদের এঁটো দিসনি। ওদের মা বকবে।" হিন্দুদের পাকিস্তান ছাড়ার একটি কারণ ফুটে ওঠে অতীনের উপন্যাসের একটি হিন্দু চরিত্রের কথায়, "এখানে থাকলে অভক্ষ্য ভক্ষণ করতে হইব। জাত-মান থাকব না।" মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত 'ভেদ-বিভেদ' সংকলনের অন্তর্গত জ্যোতির্ময়ী দেবীর 'এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা' গল্পে সুদাম স্ত্রী দুর্গাকে নিয়ে হিন্দুস্থানে চলে আসার সময় টাকার অভাবে স্ত্রীকে মুসলমান স্টেশনমাস্টারের আশ্রয়ে রেখে টাকা জোগাড় করতে বের হয়। কিন্তু দুর্গা তো আশ্রয়দাতার খাদ্য খাবে না—"তোরা তো আমাদের কাছে খাবি না—হিঁদু তো।" প্রিয়বালা গুপ্তার

'স্মৃতিমঞ্জুষা'-য় তাঁর পুত্র জানিয়েছেন, বাড়ির ঝিরাও মুসলমানের পাত পরিষ্কার করতে রাজি হতো না, প্রিয়বালা নিজে হাতে সে কাজ করতেন। একই অভিজ্ঞতা চলচ্চিত্রনির্মাতা মৃণাল সেনের বাড়িতে কবি জসীমউদ্দিনের। জসীমউদ্দিনকে মৃণালের মা সন্তানতুল্য মনে করলেও, তাঁকে তিনি বাইরে বসে খাওয়াতেন, নিজের ছেলেদের সঙ্গে এক থালায় খাওয়াতেন না। তাঁর নিজের আপত্তি ছিল না, কিন্তু তিনি নিরুপায় ছিলেন। বাড়ির ভৃত্যেরা মেনে নেবে না। জসীমের খাওয়া এঁটো পাত্র মৃণালের মা নিজে হাতে পরিষ্কার করতেন। গল্পকার অভিজিৎ সেনের বাবা-মা উদার ছিলেন, তাঁদের ঘরে মুসলমান বন্ধুরা আসতেন, চা জলখাবার খেতেন। তাঁদের একটি ঘরের খাটজুড়ে ছিল অজস্র হিন্দু দেবদেবীর ছবি, পাথরের ও পিতলের মূর্তি। সকালে দুধ দিতে আসা মুসলমান ছেলে, যার কাছে ঐসব দেবদেবী ছিল নিতান্ত 'পিকচার', তা দেখার কৌতূহলে ঘরে একখানা পা বাড়ায়, তাতেই ঘরখানার পবিত্রতা ক্ষুণ্ন হয়। মাহমুদুল হকের উপন্যাস 'কালো বরফ'-এ পড়ি মুসলমানদের ধর্মীয় আচরণ বিষয়ে হিন্দুদের ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের কথা। মসজিদে নামাজ পড়ার সময় হঠাৎ একটা ঢিল এসে পড়ে, আর কে যেন চেঁচিয়ে বলে, "দ্যাখ্ দ্যাখ্, মাথায় লেজওলা নেড়েরা কেমন কপাল ঠুকে যাচ্ছে।" এসবই তো দেশভাগের সময়কালের কথা, কোন দূর অতীতের কথা নয়। তাই শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'জীবনরহস্য' উপন্যাসের কথা মেনে নেওয়া যায় না—'কবে আমাদের পূর্বপুরুষেরা কী অবিচার করেছেন ওঁদের পূর্বপুরুষদের উপর, সে জন্যে নিজবাসভূমে আমরা পরবাসী হয়ে উঠতে লাগলাম।' অতীতের কথা নয়, দুই পক্ষের পূর্বপুরুষের কথা নয়; এসবই ছিল দেশভাগের সময়ের ঘটমান বর্তমান।

পূর্ববঙ্গে/পূর্ব পাকিস্তানে জনসংখ্যায় ইসলামধর্মাবলম্বীরা সংখ্যাগুরু ছিল, হিন্দুরা তুলনায় সংখ্যায় কম হলেও ছিল ক্ষমতাবান, প্রতিপত্তিশালী। অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের দীর্ঘ উপন্যাসের সমু বলে, 'একবার চোখ তুইল্যা দ্যাখ্ চাকরি তগ, জমি তগ, জমিদারি তগ। শিক্ষাদীক্ষা সব হিন্দুদের।' রোজ রোজ বলতে বলতে এই কথাগুলো যেন মুখস্থ হয়ে গেছে আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের 'খোয়াবনামা' উপন্যাসের চরিত্র ডাক্তার আমিরুদ্দিন আখন্দের—"মোসলমান হলো হিন্দু জমিদারের প্রজা, হিন্দু উকিলের মক্কেল, হিন্দু মহাজনের খাতক, হিন্দু মাস্টারের স্টুডেন্ট, হিন্দু ডাক্তারের পেশেন্ট।" অর্থাৎ হিন্দু বসে আছে ক্ষমতায়। এক পক্ষে আছে, অন্য পক্ষে নেই। এক পক্ষ অন্য পক্ষকে অস্পৃশ্য অশুচি বলে মনে করে, হয়তো বঙ্গীয় মুসলমানদের মধ্যে অধিকাংশই নিম্নবর্ণের অস্পৃশ্য হিন্দুদের ভিতর থেকে ধর্মান্তরিত হয়েছিল বলেই। কিন্তু এই তথ্যে অন্যায়ের স্খালন হয় না। তাই সমান্তরাল অস্তিত্ব, তাই সামাজিক দূরত্ব। জীবনানন্দের 'বাসমতীর উপাখ্যান'-এর একটি চরিত্র বলে, "পচিশ-ত্রিশ ঘর মোছলমান রয়েছে ওখানে, আছে বটে, কিন্তু আমাদের সঙ্গে কোনো রকম লেনদেন নেই ওদের, ওখানে

কোনো মুন্সিমোল্লা, কোনো গ্র্যাজুয়েট ছোকরা নেই, ওদের ছেলেরা ইসকুল-কলেজে পড়ে না, মেয়েরা বোরখা এঁটে আবডালে পড়ে থাকে...।" 'মোছলমান' শব্দ ব্যবহারের মধ্য দিয়ে ফুটে উঠেছে অবজ্ঞা, হেয় করবার প্রবণতা। এই অবজ্ঞা অপমান আর বৈষম্য থেকে উঠেছিল ধর্মের ভিত্তিতে পাকিস্তানের দাবি। 'খোয়াবনামা'-য় কমপাউন্ডার প্রশান্ত তাদের হাতে খেতে না চাইলে কাদের বলে, "জাত পাত নিয়েই থাকেন। আলাদা জাত বলেই, তো আলাদা হতে চাই। আলাদা দেশ দিতে আপনাদের এত গায়ে লাগে কেন?"

নিম্নবর্ণের হিন্দুরাও ছিল উচ্চবর্ণের হিন্দুদের কাছে অবজ্ঞাত, তাদের দ্বারা অপমানিত। বঞ্চিত মুসলমান আর বঞ্চিত হিন্দুর যেটা হতে পারতো ঐক্যবদ্ধ প্রজা আন্দোলন সেটা পর্যবসিত হলো ধর্মভিত্তিক পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে। 'প্রেম নেই' উপন্যাসে এই বিকারের দিকটা চমৎকারভাবে তুলে ধরেছেন গৌরকিশোর ঘোষ। গয়া মনে করে বড় বেশি মুসলমান-মুসলমান ভাব করায় অন্য যারা মহাজন-জমিদারের অত্যাচার খতম করতে চায় তারা দূরে সরে যাচ্ছে। "কথাডা হচ্ছে প্রজা আন্দোলন। আমাদের এরই উপর জোর দিয়া ভালো। হতি পারে প্রজাগের মধ্যি, চাষিগের মধ্যি মুসলমানের সংখ্যা বেশি। তাহলিউ ইডা প্রজা আন্দোলন।" অন্যদিকে আবু তালেবও বলে, "বাংলাদেশের রাজনীতির মূল কথাডাই হলো ভূমিসমস্যা। জমিদারগের গিরাসের থে জমি নিয়ে যদি চাষিগের হাতে দিয়ে না দিয়া যায় তাহলি জমিরউ উন্নতি হবে না, আর চাষিগেরউ দুর্গতি ঘোচবে না।" আবু তালেবরা থানায়-থানায় প্রজা সম্মেলন করে, জমিদারি প্রথা ও মহাজনি শোষণ যে মূল শত্রু সেটা বোঝাতে চায়। কিন্তু একদিকে মোল্লা-মৌলবিদের প্ররোচনায়, অন্যদিকে উদীয়মান মুসলমান মধ্যবিত্তের স্বার্থে যা ছিল ডালভাতের সমস্যা তা হয়ে ওঠে মুসলিম জাহানের সংহতি ও উন্নতির সমস্যা। প্রজা আন্দোলন জোরদার করতে গিয়ে বলা হয়, জমিদার হিন্দু, মহাজন হিন্দু, হাকিম হিন্দু, উকিল হিন্দু। সুতরাং ব্যাপারটা আসলে হিন্দু বনাম মুসলমানের সমস্যা। ইয়াকুব নতুন মুসলমান মধ্যবিত্তের প্রতিনিধি; সে ঢাকা স্পিরিটের বড়াই করে। ইয়াকুবরা মনে করে হিন্দুদের দীর্ঘ দিনের অবিচার অন্যায়ের প্রতিকার মুসলমান হয়েই করতে হবে। তারা আজ উর্দু জবান ব্যবহার করে, আরব তুরস্ক ইরানে বংশলতিকার মূল খুঁজে বেড়ায়। ইয়াকুব নব্যপন্থী, মৌলবি দীন মোহাম্মদ প্রাচীনপন্থী। কিন্তু দুজনেই একমত যে, মুসলমানকে নিজের ঠাঁই করে নিতে হলে হিন্দুর বিরোধিতা করে, হিন্দুর সংশ্রব বর্জন করেই তা করতে হবে। মুসলমানের সামনে যেন আর কোনও সমস্যা নেই—মসজিদের সামনে বাজনা, আর প্রকাশ্যে গোরু জবাই, এই দুটোই মাত্র সমস্যা। পরিস্থিতি এমন অগ্নিগর্ভ হয়ে গেল যে এই কথা বললেই ভোট মেলে, নচেৎ মেলে না। উগ্রতা, অবিশ্বাস, বিদ্বেষ—'ব্যক্তিমানুষ তলিয়ে যাচ্ছে সাম্প্রদায়িক ভেদচিহ্নের অতল গহ্বরে।' এখন ব্যক্তি ব্যক্তিকে খুন বা ধর্ষণ করে না, এখন হিন্দু মুসলমানকে খুন, আর মুসলমান হিন্দুকে ধর্ষণ করে। এই খুন-ধর্ষণের

রক্তাক্ত পথে, চূড়ান্ত বিদ্বেষের আবহাওয়ায় যখন পাকিস্তান মুসলমানপ্রধান ধর্মীয় রাষ্ট্র হিশেবে গড়ে উঠল, তখন এতদিন যারা ছিল অপমানিত তারা স্বভাবত আধিপত্যের অধিকার দাবি করল।

যারা জুতো পরে বাড়ির সামনে দিয়ে গেলে জুতো পেটা খেত, তারা মসমসিয়ে জুতো পরে কাছারিবাড়িতে চেয়ারে বসছে, এই দৃশ্য প্রাক্তন ক্ষমতাভোগীরা মেনে নিতে পারেনি। *The Trauma and the Triumph* সংকলনের অন্তর্গত সুহাসিনী দাসের দিনপঞ্জিতে পড়ি, ''The exuberance of the Muslim League at the creation of Pakistan sounded like threats to the minority community.'' মুসলমানদের মধ্যে প্রকাশ্য উল্লাস ও আত্মপ্রত্যয় অনেক সময় আক্রমণাত্মক চেহারা নিল, আর হিন্দুরা অস্তিত্বের সংকটে ভুগতে শুরু করল। হিন্দুদের মনোভাব ব্যাখ্যা করে প্রফুল্ল চক্রবর্তী লিখেছেন, হিন্দুরা 'suffered from the nameless fear of a submirged population rising up in hate against them.' এতদিনের অবজ্ঞার ঋণ শোধ হচ্ছে ঘৃণায়। সেই কারণে মুসলমানদের সমকক্ষতার দাবি প্রতিষ্ঠিত হিন্দুদের বিচলিত করেছিল। *Ramembering Partition* গ্রন্থে জ্ঞানেন্দ্র পাণ্ডে যথার্থই বলেছেন, বাঙালি ভদ্রলোক হিন্দু যারা বাংলাকে নিজেদের প্রদেশ বলে মনে করত তারা ছিল 'unprepared to live under the permanent tutelage of Muslims'। বিশেষত প্রথম মুসলিম লীগ মন্ত্রীসভার অধীনে বসবাসের অভিজ্ঞতায় এই মানসিকতা আরো তীব্র হয়েছিল। স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগ দেওয়া মানুষেরাই ছিলেন পূর্ববাংলায় রাজনৈতিক নেতৃত্বে। এই মানুষদের মধ্যে যাঁরা হিন্দু সম্প্রদায়ভুক্ত, তাঁরা মনে করতে লাগলেন, ইংরেজরা চলে গেলেও তাঁরা স্বাধীনতা পাবেন না। তাঁদের চিরকাল মুসলমানদের অধীন হয়ে থাকতে হবে। ক্ষমতাবান উচ্চবর্ণের হিন্দুরা তাই দেশত্যাগ শুরু করল। তাদের উপর অর্থনৈতিকভাবে নির্ভরশীল ছিল যে-সব নিম্নবর্ণের মানুষ তারাও নিরাপত্তাহীনতায় ভুগে ভিটেমাটি ছাড়তে শুরু করল। গরিব মুসলমানদের বোঝানো হয়েছিল পাকিস্তান হবে দুঃখী মানুষের দেশ। তার জন্যে চাই ধর্মযুদ্ধ, জেহাদ। সাম্প্রদায়িক উত্তেজক বক্তৃতায় বলা হচ্ছিল হিন্দুরা গোলামের জাত, তারা দেশশাসনের বোঝে কী? ইংরেজরা মুসলমানদের হাত থেকে রাজ্যভার নিয়েছিল, মুসলমানদের হাতেই সে দায়িত্ব ফিরিয়ে দিক। হিন্দু আধিপত্যবাদকে খুব আক্রমণের মুখে পড়তে হয়। 'সুপুরিবনের সারি'-র হারুনের মতো কিশোরও জানে, "কায়েদে আজম কইছে, এইসব আমরাই পামু।" আমরা মানে মুসলমানেরা। বন্ধু নীলুকে সে বলে, "এয়্যা তো আর তোগো দ্যাশ না, তোরা তো অ্যাহন অইন্য দ্যাশের লোক।" একদিকে প্রতিমা ভাঙা বা লাঞ্ছনা, অন্যদিকে মসজিদের সামনে বাজনা বাজানো নিয়ে দীর্ঘ দিন উত্তেজনা বা কাজিয়া ছিল, কিন্তু দেশভাগের পর, সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর

The Riddle of Partition প্রবন্ধে লিখেছেন, হিন্দুরা অনুভব করল তাদের যেন অপর সম্প্রদায়ের করুণার উপর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। এই অবস্থায় তাদের ধর্ম ও সংস্কৃতি বজায় রাখার একমাত্র উপায় দেশত্যাগ। মন্দির ভাঙা হলো, দেবমূর্তি অশুচি করা হলো, খুলে নিয়ে যাওয়া হলো তুলসীমঞ্চের ইট। অনেক ক্ষেত্রে কলমা পড়িয়ে ধর্মান্তরিত করা হলো, মসজিদে নমাজে বাধ্য করা হলো। প্রাণের ভয়ে, 'তমস' উপন্যাসে সর্দার ইকবাল সিং কলমা পড়তে, সুন্নত করতে বাধ্য হয়, পরিণত হয় ইকবাল আহমেদে। হামলা করা হলো পূজাপার্বণে, মেলায়। যাদের ধর্মান্তরিত করা হলো না, তাদের মধ্যে ধর্মান্তরের ভয় আতঙ্ক সৃষ্টি করল। অশোকা গুপ্ত জানিয়েছেন একজন কলমা পড়ে ধর্মান্তরিত হতে রাজি না হওয়ায়, তাকে ও তার স্ত্রীকে আগুনে পুড়িয়ে মারা হয়। সঙ্গে-সঙ্গে থাকল অর্থনৈতিক চাপ—হিন্দুর দোকান বয়কট, হিন্দু কারিগরকে কাজ না দেওয়া। আর ঘটতে লাগল ছোট-ছোট নির্যাতন—মাঠ থেকে ধান কেটে নেওয়া, গোরু চুরি। মুসলমান কৃষকবর্গের জমির ক্ষুধা তো ছিলই, তার সঙ্গে নবোদিত মুসলমান মধ্যবিত্ত সমাজ উশ্‌কানি দিতে লাগল, চাপ সৃষ্টি করতে লাগল, যাতে জমিবাড়ি ছেড়ে, পেশা ছেড়ে, চাকরি ছেড়ে হিন্দুরা ভারতে চলে আসে। তাহলে সেইসব জমি তাদের দখলে আসবে, পেশা ও চাকরির শূন্যতা তাদের দ্বারাই পূরণ হবে।

পাঞ্জাবের মতো গণহত্যা না হলেও পূর্ববঙ্গের মানুষ খুন হয়েছে পাকিস্তান সৃষ্টির আগে ও পরে—নোয়াখালিতে, বরিশালে, ঢাকায়, অন্যত্র। যতো না হত্যা, তার চেয়েও বেশি হত্যার ভয়। সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায় সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের জনৈক মানুষের কথা উদ্ধার করেছেন, কইমাছের মতো সব জীইয়ে রেখেছি, যেদিন খুশি কাটবো। মসজিদে মৌলানারা বক্তৃতা করছে, আল্লার দুনিয়ায় কাফের থাকুক আল্লা তা চান না। সুতরাং বিধর্মীদের নিধন হোক। নিজের বাবা ও দুই জ্যাঠাকে গলায় কোপ মেরে হত্যার দৃশ্য দেখেছিলেন বেণুধর ঘোষ। বরিশালের ঝালোকাঠি অঞ্চলের রাজপুর গ্রামের সুকুমার মুখোপাধ্যায়ের পরিবার যখন শেয়ালদায় এসে পৌঁছিয়েছিল তখন মা দিদি বউদির পরনে ছিল একটিমাত্র করে শাড়ি। কোন জামা বা অন্তর্বাস নেই। তাঁর জ্যাঠামশাইকে পুড়িয়ে মারা হয়। পরিবারের নয়জনকে হত্যা করা হয়, তাদের কাটা মুণ্ড সিঁড়ির ধাপে ধাপে সাজিয়ে রাখা হয়েছিল। নোয়াখালিতে নারায়ণপুরের জমিদার সুরেন্দ্রবাবুর ছিন্নমুণ্ড দাঙ্গাকারীদের নেতা গোলাম সারোয়ারকে উপহার দেওয়া হয়েছিল। নামজাদা উকিল রাজেন্দ্রলাল রায়চৌধুরীর পরিবারের সমস্ত পুরুষকেই হত্যা করা হয়। সাংবাদিক শংকর ঘোষ এই সময় নোয়াখালি গিয়েছিলেন। 'হস্তান্তর' বইয়ের প্রথম খণ্ডে তিনি লিখেছেন, "নোয়াখালি ও ত্রিপুরায় আক্রমণটা পারস্পারিক ছিল না, সেখানে পুরো আক্রমণটাই ছিল একতরফা, হিন্দুদের ওপর মুসলমানদের আক্রমণ। সেখানেও লক্ষ্য ছিল হিন্দুদের শেষ করা নৈতিক অর্থে।... তাই নোয়াখালি

ও ত্রিপুরায় নরহত্যা ততো হয়নি, যতো হয়েছে ধর্ম ও সংস্কৃতি নাশের চেষ্টা। গ্রামের পর গ্রাম হিন্দুদের ধর্মনাশ করার চেষ্টা হয়েছে, কলমা পড়নো হয়েছে, গোরুর মাংস খেতে, লুঙ্গি পরতে, নুর রাখতে বাধ্য করা হয়েছে, হিন্দু মেয়েদের জোর করে মুসলিম ছেলের সঙ্গে বিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং অনেক ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে হিন্দু মেয়েদের মুসলিম বাড়িতে রাত্রিযাপনে বাধ্য করা হয়েছে।"

প্রধান ভয় ছিল নারী-নির্যাতনের। মেয়েরা অপহৃতা হবে, তাদের বলাৎকার করা হবে, এই আতঙ্ক পূর্বপাকিস্তানের সংখ্যা-লঘুদের বিহ্বল করে দিয়েছিল। অশোকা গুপ্তা 'নোয়াখালির দুর্যোগের দিনে' পুস্তিকায় এক নারীর কথা বলেছেন যাকে প্রতি রাত্রে দু-তিনজন জোর করে তুলে নিয়ে যেত এবং ভোর রাত্রে ফেরত দিয়ে যেত। প্রিয়বালা গুপ্তা ছিলেন এমন একজন বিরল হিন্দু মহিলা যিনি মুসলমান অতিথির পাত পরিষ্কার করতেন বিনা দ্বিধায়। তিনি ও তাঁর স্বামী দেশভাগের পর গ্রামত্যাগে রাজি ছিলেন না। কিন্তু তিনিও বয়স্থা মেয়েদের নিয়ে দুশ্চিন্তায় ছিলেন। তিনি বলেছিলেন, তেমন পরিস্থিতি হলে ওদের মেরে নিজে মরবেন। আপাতদৃষ্টিতে ছোট একটি ঘটনার কথা শুনেছিলেন হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়। হিন্দুমেয়ে পুকুরে স্নান করতে গেলে দুইপারে সমবেত মুসলমানেরা শ্লোগান দিয়েছিল, 'পাক পাক পাকিস্তান/হিঁদুর ভাতার মুসলমান।' তাদের বিদ্রূপ করে চাচি বা বিবি বলে সম্বোধন করা হতো। এইসব ইয়ার্কি নিরাপত্তাবোধ নষ্ট করে দিয়েছিল। নলিনী মিত্র তাঁর সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন, কলেজে পড়াতে যাবেন, কিন্তু বিহারী মুসলমান পাড়া দিয়ে যাতায়াত অস্বস্তিকর হয়ে উঠেছিল। অধ্যক্ষ তাঁকে সিঁদুর না পরে যাতায়াত করার পরামর্শ দেন। কিন্তু এই 'auspicious symbol' ছাড়তে রাজি নন তিনি, বরং কলেজে পড়ানোর চাকরি ছেড়ে দেবেন। কমনরুমেও তাঁকে অশ্লীল মন্তব্য শুনতে হয়েছে। বরিশালে অভিজিৎ সেনদের নিকটবর্তী তিনটি গ্রামে সম্ভবত এক ঘরও মুসলমান বসতি ছিল না, কিন্তু দেশভাগের প্রায় সঙ্গে-সঙ্গে এই তিন গ্রামের বেশির ভাগ হিন্দুমধ্যবিত্ত দেশ ছেড়েছিলেন। আশংকা ছিল মেয়েদের নিরাপত্তা নিয়ে। অভিজিৎদের বাড়িতে ছিল চার যুবতী দিদি, আর মুসলমান যুবকেরা খেলার মাঠে যাওয়ার পথ করে নিয়েছিল তাদের বাড়ির মধ্য দিয়ে। মেয়েদের প্রতি ছোট-বড়ো অন্যায় আচরণে সন্ত্রস্ত হয়ে গিয়েছিল পুববাংলার সংখ্যালঘু মানুষ। পাঞ্জাবের মতো গণহারে মেয়েদের অপহরণ, ধর্ষণ, ধর্মান্তর ও জবরদস্তি বিয়ে পূর্বাঞ্চলে হয়নি বটে, কিন্তু এমন ঘটনা অনেক ঘটেছিল। শুধু নোয়াখালিতে নয়, অন্যান্য অনেক এলাকায়। তবে হিন্দু পরিবারের মেয়ে-বউদের ধর্ষণ করা হয়েছিল নিতান্ত লালসা চরিতার্থ করার জন্য নয়। নারীর অপমান সমস্ত সম্প্রদায় আর গোষ্ঠীর অপমান। নারীকে ধর্ষণ করে প্রাক্তন আধিপত্যবাদী গোষ্ঠীকে অপমান করা হয়। পুরুষাঙ্গ হয় চূড়ান্ত অপমানের অস্ত্র। যে হিংসা বা পাশবিকতা ঘটেছিল তাকে শুধু অর্থনৈতিক বৈষম্য দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় না,

ধর্মীয় সাংস্কৃতিক দূরত্ব দিয়েও ব্যাখ্যা করা যায় না। তার পিছনে ছিল এক অবরুদ্ধ বদ্ধমূল শত্রুতাবোধ, যা মানবিকতার সব আবরণ ভেদ করে অনুকূল পরিস্থিতিতে ফেটে পড়েছিল। 'তমস'-এর ইংরেজি তর্জমায় ভীষম্ সাহনি লিখেছেন, "The confrontation too was looked upon as a link in the chain of earlier confrontations in history. The 'warriors' had their feet in the twentieth century while their minds were in medieval times."

দেশত্যাগে গুজবের একটা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল। সেই ভূমিকা নিয়ে সবিস্তারে আলোচনা করেছেন জ্ঞানেন্দ্র পাণ্ডে। ঘটনার ভিত্তিতে কিছু গুজব রটেছিল, কিছু গুজব কিন্তু পরিকল্পিতভাবে রটানো হয়েছিল যাতে হিন্দুদের নিরাপত্তাবোধ নষ্ট হয়ে যায়। কিছু না ঘটিয়েও আক্রমণাত্মক কিছু না করেও নিতান্ত রটনার ধাক্কায় যাতে তারা জমি-বাড়ি-পেশা ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হয়। যেমন 'সুপুরিবনের সারি' উপন্যাসে পড়ি, "হয়নি হয়তো এখনো। কিন্তু হতে কতক্ষণ? যে-কোন জায়গায় যে-কোন সময়ে কিছু একটা ঘটলেই হলো।" মেঘনা গুহঠাকুরতা তাঁর পূর্বোক্ত Uprooted and Divided প্রবন্ধে লিখেছেন, যতো-না বাস্তব ঘটনা, তার চেয়েও কিছু ঘটবে এই আতঙ্ক মানুষকে দেশত্যাগে প্ররোচিত করেছিল—'The fear of being persecuted, the fear of being dispossessed'। আল্লা হু আকবর ধ্বনি শোনা যাচ্ছে, দলবদ্ধ গুণ্ডারা আসছে, পাশের গাঁয়ে আগুন লাগানো হয়েছে, এ দেশ আর আমাদের নয়—এইসব গুজব সংখ্যালঘু মানুষকে ভিটেছাড়া করেছে। অভিজিৎ সেনের 'সীমান্ত' গল্পে পড়ি যে, জিয়ল গাজীকে বিভূতির বাবা পছন্দ করতেন, তাঁর নাটকে যে-গাজী ভীম, ঘটোৎকচ সাজত, সে যখন দলবল আর মশাল নিয়ে পাহারা দেবার অছিলায় সমবেতকণ্ঠে আল্লা হু আকবর আওয়াজ তুলে হাজির হয়, তখন বিভূতির বাবা অনুভব করেন, এ দেশে আর থাকা যাবে না। ভারতীয় সেনাবাহিনী যখন হায়দ্রাবাদ করদরাজ্য দখল করে নিল, তখন রটানো হলো, ঐ সেনাবাহিনী পূর্বপাকিস্তানও দখল করে নেবে। এই গুজবে পূর্বপাকিস্তানের সদ্যস্বাধীন মুসলমান সমাজ উত্তেজিত ও আক্রমণাত্মক হয়ে ওঠে এবং হিন্দুদের পক্ষে সেখানে থাকা হয়ে ওঠে বিপজ্জনক। বরিশাল জেলার দুই সর্বোচ্চ রাজকর্মচারী স্থানীয় হিন্দু-বিরোধীদের নিয়ে দাঙ্গার চক্রান্ত করেছিল। গোড়ায় সেই চক্রান্ত সাড়া জাগায়নি। পরে ষড়যন্ত্রকারীদের কৌশলে ফজলুল হক সাহেবকে কলকাতায় খুন করা হয়েছে এই গুজব বিদ্যুৎবেগে ছড়িয়ে পড়ে এবং তার পরিণামে বরিশালে পাঁচ-সাত হাজার হিন্দু খুন হয়ে যায়।

সুহাসিনী দাস তাঁর দিনপঞ্জিতে দুঃখ করে বলেছেন, মুসলিম লীগের সদস্যরা যদি হিন্দুদের মনে নিরাপত্তা জোগাত, তাহলে তারা অধিকাংশই থেকে যেত। কে আর বাস্তু ত্যাগ করতে চায়? মুসলিম লীগ নিরাপত্তা তো দেয়ইনি, বরং চেয়েছে হিন্দুরা চলে

যাক। ফলে, গতকাল যে-বাড়ি আলোয় উজ্জ্বল ছিল, সে বাড়ি আজ অন্ধকার। বাসিন্দারা চলে গেছে, লুণ্ঠিত হয়ে যাচ্ছে বাড়ির সব সামগ্রী। নিরপেক্ষ প্রশাসন যদি নিরাপত্তা দিত, তাহলেও এই অভূতপূর্ব নির্গমন ঘটতো না। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার সঙ্গে-সঙ্গে কায়েদ-এ আজম জিন্নাহ্ যে ঘোষণা করেছিলেন, ধর্মনিরপেক্ষভাবে এখন থেকে পাকিস্তানের সব নাগরিকই সমান, সে নিতান্ত কথার কথা থেকে গেল। ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্টের আগে থেকেই, ১৯৪৬ সালের ১৬ আগস্টে শুরু হওয়া Great Calcutta Killing থেকে, সোহরাবর্দির শাসনামল থেকেই প্রশাসনের নিরপেক্ষতার বালাই ঘুচে গিয়েছিল, যেমন ঘুচে গিয়েছিল সম্প্রতি গুজরাট রাজ্যে। প্রশাসনের সহায়তায় বা নিস্পৃহতায়, কীভাবে গোলাম সারোয়ার নোয়াখালিতে সন্ত্রাস ও হত্যার রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করেছিল তার বিবরণ পাবো সুরঞ্জন দাসের *Communal Riots in Bengal 1905–1947* বইতে। নির্মলকুমার বসু তাঁর *My Days with Gandhi* বইতে বাংলা সরকারের Home (Political) Department-এর অতিরিক্ত সচিব পি. ডি. মার্টিনকে পাঠানো চিটাগং বিভাগের কমিশনারের রিপোর্ট উদ্ধৃত করেছেন। তিনি লিখেছেন, সর্বস্ব ছেড়ে হিন্দুরা দেশ ত্যাগ করতে চায় না, কিন্তু মুসলমানরা নির্যাতন করে, ছোটখাট উৎপীড়নের দ্বারা তাদের নিরাপত্তাহীনতার পরিস্থিতিতে দোদুল্যমান রেখেছে। থানায় নালিশ করতে সাহস পায় না হিন্দুরা, তাহলে বিপদ বহুগুণে বাড়বে। কিছু মুসলমান আছে যারা সৌহার্দ্য বজায় রাখতে চায়, বিপদে আশ্রয়ও দিয়েছে। গরিষ্ঠসংখ্যক মুসলমান চায় পূর্বতন প্রতিপত্তির অবস্থা থেকে হিন্দুরা হটে যাক, কিন্তু তারা বড়ো রকমের হিংসা চায় না। তারা ছোটখাট হয়রানি নির্যাতনে আপত্তি করবে না, নির্যাতনের বাড়াবাড়ি হলে চোখ বুজে থাকবে। আর তৃতীয় শ্রেণীতে আছে ''those Muslims who, for reasons of religious zeal, economic jealousy or personal enmity, hate the Hindu and want to see him wiped out... which sees in disturbances the prospect of easy acquisition of wealth and power.'' এদের অত্যাচারমূলক কার্যকলাপ প্রশাসন নিরপেক্ষভাবে থামানোর চেষ্টা তো করেইনি, বরং বহুক্ষেত্রে হিন্দু-নির্যাতনে সচেতনভাবে মদত দিয়েছে। দিয়েছে, রাজনৈতিক প্রভুদের খুশি করবার প্রয়োজনে, এবং প্রশাসনের আমলা-কর্মচারীরাও সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন হয়ে গিয়েছিল বলে।

দেশভাগ তাই নিতান্ত একটি রাজনৈতিক ঘটনা নয়। শুধু সীমান্তরেখার কথা নয়, বর্গমাইল বা জনসংখ্যার কথা, অথবা সংখ্যাগুরু-সংখ্যালঘুর আনুপাতিক হিশাবের কথা, রাষ্ট্রক্ষমতা বিন্যাসের কথা নয়। দেশভাগের দেশত্যাগের আখ্যানে অনেক উচ্চারিত, অনেক চাপা যন্ত্রণা আর কান্না জমাট বেঁধে আছে। এই দেশভাঙার ঘূর্ণিঝড়ের ইতিহাসে লেগে আছে হিংসা ধর্ষণ আর হত্যার রক্ত, ছোটখাট উৎপীড়ন অপমানের চোখের জল। যথার্থভাবেই একথা বলা হয়েছে, যারা চোখের সামনে

নিজেদের ঘরবাড়ি পুড়ে যেতে দেখেছে, প্রিয়জনকে নিহত হতে, অপহৃত হতে দেখেছে, সীমান্তে যারা অত্যাচারিত হয়েছে, দেশভাগ তাদের কাছে নিতান্ত রাজনৈতিক ঘটনা বা ভৌগোলিক বিভাজনের ঘটনা নয়। নয় বলেই, শিকড়ের শাখায় প্রশাখায় যারা জন্মভূমিতে বদ্ধমূল ছিল তাদের জন্মভূমি ছেড়ে চলে যেতে হয়।

'স্বপ্ন ও অন্যান্য নীলিমা' উপন্যাসের সরোজের মধ্য দিয়ে নিজের কথাই বলেছেন অভিজিৎ সেন। মা অপ্রত্যাশিতভাবে গা-মাথা মুছিয়ে সরোজের মাথা বুকে নিলে সরোজ 'বুঝল তাহলে কালকেই এই বাড়িঘর, এই গাছপালা, গ্রাম-নদী-পুকুর, ঠাকুরদার ভিটার শূন্য ঘর, এবং চিতার উপর মাটির ঢিবি, ঠাকুরদার ঠাকুরমা এবং আরো এক-আধজন প্রাক্তনের চিতার উপরের প্রাচীন মঠের সেই আশ্চর্য সুন্দর জায়গাটা যেখানে তারা বটের ঝুরিতে দোল খায়, ঝাঁপ দেয়, সে-সব ছাড়িয়ে মাঠের মধ্যে মাঠ, ঘাটলা, যেখান থেকে তারা জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে পুকুর তোলপাড় করে, দিগন্তবিস্তৃত মাঠ, যেখানে তারা ঘুড়ি ওড়াতে যায় এবং ফুটবল খেলার মাঠ— এসব ছেড়ে যেতে হবে। শুধু এসবই নয়, ছেড়ে যেতে হবে মা, বাবা, ছোটভাইবোন এদেরও। চলে যেতে হবে কলকাতা নামক একটি জায়গায় যেখানে একবেলা ভাত এবং একবেলা রুটি খেতে হয়।' চলে যাবার আগে তাদেরও হয়তো 'সুপুরিবনের সারি'-র নীলুর মতো প্রণামের ইচ্ছা হয়। মনে-মনে বলে তারা 'প্রণাম তোমায় মাটি। প্রণাম ওই একলা-কোণে স্থলপদ্ম গাছটিকে। প্রণাম ওই পুকুরের পিছল ঘাটকে। প্রণাম ওই খালপাড়ের অনেকদিনের পড়ে থাকা ভাঙা নৌকোকে।...প্রণাম মাটি, সাঁকো, প্রণাম ঢাক-কাঁসর। টিনের চালা, নিকোনো উঠোন, হাটখোলা প্রণাম।'

বন কেটে বসত : উদ্বাস্তুর উপনিবেশ

এই-যে পুব বাংলা থেকে উৎখাত হয়ে মানুষগুলি এল, তারা নিজের-নিজের অবস্থা অনুযায়ী আশ্রয়-বাসস্থানের ব্যবস্থা করে নিল। কেউ বস্তিতে আশ্রয় নিল। যাদের অবস্থা তুলনায় একটু ভালো, যারা পুব বাংলা থেকে আসবার সময় কোন উপায়ে কিছু টাকাপয়সা নিয়ে আসতে পেরেছিল তারা জমি কিনে যেমন সাধ্য বাড়ি করে নিল। যে সব মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষ পশ্চিমবঙ্গ ছেড়ে পূর্বপাকিস্তানে চলে গিয়েছিল, এরা তাদের পরিত্যক্ত বাড়িগুলি দখল করে নিল। ঋত্বিক ঘটকের 'সড়ক' গল্পে শিল্পীপুত্র এমদাদের স্মৃতি পিছনে ফেলে ইজরাইল পাকিস্তান চলে যাচ্ছে। তার পরিত্যক্ত ঘরে এসে উঠেছে উদ্বাস্তু জগৎ ব্রাহ্মণী। কোনও-কোনও ক্ষেত্রে দুইপক্ষে সম্পত্তি বিনিময় হলো। আশ্রয় নিল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকালে নির্মিত, এখন পরিত্যক্ত সামরিক ছাউনিগুলিতে। আর এই ছিন্নমূল মানুষেরা মাথাগোঁজার মৌলিক তাগিদে জবরদখল করে সরকারি বা বেসরকারি ব্যক্তিগত মালিকানার জমিতে গড়ে তুলল নতুন

উপনিবেশ, যেগুলি উদ্বাস্তু কলোনি নামে চিহ্নিত হয়ে গিয়েছিল। এই প্রক্রিয়া যাদবপুর এলাকার বিজয়গড়ে শুরু হয়, তারপর কলকাতার দক্ষিণ শহরতলি থেকে, দমদম, ডানলপ, বেলানগর, সোদপুর প্রভৃতি জায়গায় ছড়িয়ে পড়ে। ১৯৫০ সালের মধ্যে কলকাতা ও তার নিকটবর্তী অঞ্চলে একশো উনপঞ্চাশটি এমন জবরদখল কলোনি গড়ে উঠেছিল। বুদ্ধদেব বসুর 'একটি জীবন' গল্পের স্কুলমাস্টার অভিধানকার গুরুদাস সপরিবারে গৃহত্যাগ করে দশ দিনে কলকাতায় পৌঁছায়। শেয়ালদা স্টেশন থেকে বনগাঁ ক্যাম্প। খাদ্য কখনো মুড়ি, কখনো চাল-ডাল মেশানো একটা মণ্ড। অবশেষে কাঁচড়াপাড়ার কাছে উদ্বাস্তু কলোনিতে আশ্রয় মেলে গুরুদাস ও তার পরিবারের। গুরুদাসের ইতিহাস লক্ষ-লক্ষ উদ্বাস্তু বাঙালির ইতিহাস।

নেহরুর নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকার পুব বাংলা থেকে আগত উদ্বাস্তুদের খয়রাতি সাহায্য দিতে রাজি থাকলেও পুনর্বাসন দিতে প্রস্তুত ছিল না। সরকারের যুক্তি ছিল, পূর্ব পাকিস্তানের অবস্থা উন্নতি হলেই এরা দেশে ফিরে যাবে। আর ভারতে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হলে তাদের পূর্ববঙ্গ/পূর্ব পাকিস্তান ত্যাগে উৎসাহ দেওয়া হবে। নেহরু এই মর্মেই ১৯৪৮ সালের পয়লা এপ্রিল মুখ্যমন্ত্রীদের লিখেছিলেন, 'It is dangerous to encourage this exodus as this may lead to disasterous consequences'. সরকার পুনর্বাসনের ব্যবস্থা না করায় ছিন্নমূল মানুষেরা দারুণ উদ্যমের পরিচয় দিয়ে নিজেদের ব্যবস্থা নিজেরাই করার উদ্যোগ নেয়। রাচেল ওয়েবের তাঁর পূর্বে উল্লেখিত প্রবন্ধে চমৎকারভাবে বলেছেন, ''The fact of erecting a home, even a kuccha hutment, was a symbolic and politically significant act of the refugees.'' কেন্দ্রীয় ও রাজ্যসরকারের দ্বারা এবং ভূমিপুত্র পশ্চিমবঙ্গবাসীর দ্বারা পরিত্যক্ত অবহেলিত এই উদ্বাস্তু মানুষেরা নিজের ভাগ্য নিজের হাতে গড়ার দায়িত্ব তুলে নিয়েছিল। এই প্রসঙ্গে অনিল সিংহের 'পশ্চিমবঙ্গে শরণার্থী সমস্যা' থেকে একটা দীর্ঘ উদ্ধৃতি দিই—"পুনর্বাসন সম্পর্কে সরকারি মনোভাব ও কার্যকলাপে হতাশ হয়ে শরণার্থীগণ তাদের আশ্রয়স্থানের জন্য স্থায়ী পদক্ষেপ অত্যন্ত বলিষ্ঠতার সঙ্গে গ্রহণ করে। একে দুঃসাহস বললেও অত্যুক্তি হবে না। সর্বতোভাবে উদ্বাস্তুরা জবরদখল কলোনি গড়ে তুলতে শুরু করেন ১৯৪৯ সালের শেষের দিকে। ১৯৫০ সালের মধ্যেই কলিকাতা, চব্বিশ পরগণা, হাওড়া, হুগলি জেলাতে সব মিলে ১৪৯-টি জবরদখল কলোনি গড়ে ওঠে। বাস্তবের সঙ্গে জীবিকার বন্দোবস্ত করার তাগিদে শহর ও শিল্পাঞ্চলকে কেন্দ্র করেই কলোনিগুলির পত্তন হয়। সাধারণ মধ্যবিত্তশ্রেণীর মানুষই সর্বপ্রথম জবরদখল কলোনির পত্তনে নেতৃত্ব দেন।...পরবর্তীকালে উচ্ছেদ-আইন রচনা করে সরকার জমির মালিকদের সাহায্য করতে সচেষ্ট হয়। কিন্তু সমবেত আন্দোলন ও প্রচেষ্টার মাধ্যমে কলোনিবাসীরা সমস্ত আক্রমণই প্রতিহত করেন। অবশেষে ১৯৫৪ সালে

মন্ত্রী-কমিটির রিপোর্টেই এই কলোনিগুলি সরকারি স্বীকৃতি লাভ করে।" জবরদখল কলোনিগুলি প্রতিষ্ঠার 'covert and calculated pattern'-এর মধ্যে পাই উদ্বাস্তুদের স্বাবলম্বন-ক্ষমতার প্রমাণ। সরকারি, এমনকি বেসরকারি স্তরেও অনেক সময় পাঞ্জাবি শরণার্থীদের সঙ্গে বাংলার উদ্বাস্তুদের তুলনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে, পাঞ্জাবিরা পরিশ্রমী, উদ্যমী, তারা হার মানতে জানে না, তারা পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারে। অন্যদিকে বাঙালি উদ্বাস্তুরা নাকি অলস, উদ্যমহীন, সরকারি খয়রাতির সুযোগ ছাড়তে অনিচ্ছুক; তারা সবকিছুতে ঝামেলা পাকায়, বাধা দিতে ও অন্যায় আবদার করতে ওস্তাদ। যারা নাকি নতুন পরিবেশে নিজেদের মানিয়ে নিতে অপ্রস্তুত। তারাই কিন্তু উদ্যোগ ও সাহসের সঙ্গে প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে লড়াই করে কলোনিগুলি প্রতিষ্ঠা করে এবং সমস্ত মিথ্যা নিন্দার জবাব দিয়ে দেয়। নীলাঞ্জনা চ্যাটার্জি তাই বলেছেন, বাঙালি উদ্বাস্তুদের আত্মনির্ভরতা ও টিকে থাকবার তীব্র ইচ্ছাশক্তি এইসব 'canards'-এর সমুচিত জবাব।

প্রায় যেন সামরিক তৎপরতায় গড়ে উঠত এইসব নতুন উপনিবেশ। 'কাটা দেশে ঘরের খোঁজ' স্মৃতিকথায় (বারোমাস ২০০০ শারদীয়া সংখ্যা) মানস রায় নেতাজিনগর কলোনি গড়ে ওঠার যে বিবরণ দিয়েছেন তাতে বোঝা যায় এইসব কলোনি প্রতিষ্ঠার নেতৃত্ব যাঁদের উপর বর্তেছিল তাঁরা শিক্ষাবিদ্, আইনজীবী; নাগরিকত্বের ভাষা তাঁদের জানা ছিল, আর ছিল পূর্ববঙ্গ থেকে আনা কিছুটা সামাজিক পুঁজি। 'উদ্বাস্তু' গ্রন্থে হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় এইসব কলোনি গড়ে ওঠার পদ্ধতি বর্ণনা করেছেন। পূর্ববঙ্গে এক এলাকায় বসবাস করত এমন অনেকগুলি পরিবার দলবদ্ধ হয়ে একটি স্থান নির্বাচন করত এবং সেই স্থানটি জবরদখল করত। নিজেরাই নিজেদের মধ্যে প্লট বিলি করত। প্লট বিলির পর প্রত্যেক পরিবার বাঁশের খুঁটি ও হোগলার বেড়া দিয়ে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে দখল বজায় রাখার মতো একটা ঘর তুলে নিত। উন্মুক্ত পতিত জমিতে আকস্মিকভাবে অতি দ্রুত দখলের কাজ এইভাবে সমাপ্ত হয়ে যেত বলে মালিক বাধা দেবার সুযোগ পেত না। আজাদগড় কলোনি প্রতিষ্ঠা হয় মাত্র কয়েক ঘণ্টায়। এই কলোনির অন্যতম নেতা ছিলেন ইন্দুবরণ গাঙ্গুলী। তিনি তাঁর 'কলোনিস্মৃতি (প্রথম খণ্ড) : উদ্বাস্তু কলোনি প্রতিষ্ঠার গোড়ার কথা (১৯৪৮—১৯৫৪)' পুস্তিকায় এই কলোনিপ্রতিষ্ঠার বিবরণ দিয়েছেন—"আলাদিনের আশ্চর্য প্রদীপের মতো স্বতঃস্ফূর্ত এক কর্মযজ্ঞে কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই নীরব নিস্তব্ধ এলাকাটি ক্রমে রূপান্তরিত হতে লাগল একটি কোলাহলপূর্ণ জনবসতিতে।" রাতারাতি এইভাবে এক-একটি কলোনি গড়ে উঠেছিল বাঁচার তাগিদে, পায়ের তলায় মাটি পাবার তাগিদে, উদ্বাস্তুদের সংগঠনশক্তি ও কর্মদক্ষতায়। কী রকম সংগঠনশক্তি ও কর্মদক্ষতার পরিচয় দিয়েছিল উদ্বাস্তুরা তা বুঝতে পারি মানস রায়ের Growing up Refugees : One Memory and Locality প্রবন্ধের একটি বিবরণ থেকে। এক রাত্রিতে নেতাজিনগর বিদ্যামন্দির

গড়ে ওঠে। শিক্ষকেরা আগে থেকেই মনোনীত ও নিযুক্ত ছিলেন। কলোনির বাড়িতে-বাড়িতে স্কুলবাড়ি নির্মাণের সব উপাদান আগে থেকেই প্রস্তুত করে রাখা হয়েছিল। হরনাথ কর্মকার নামের এক অসামান্য দক্ষ ছুতোরমিস্ত্রি সেইসব প্রস্তুত উপাদান দিয়ে এক রাত্রে নেতাজিনগর বিদ্যামন্দিরের বাড়ি বানিয়ে দেন। পুলিশ সকালবেলায় যখন বাধা দিতে আসে তখন দেখে স্কুলে পড়াশুনো পুরোদস্তুর চালু হয়ে গেছে।

মণিকুন্তলা সেন একেবারে ঠিক কথা বলেছেন, এক-একটা কলোনি যেন এক-একটা সংগ্রামের দুর্গ হয়ে উঠল। কলোনির জন্য জবরদখল-করা জমি পুনরুদ্ধারের জন্য মালিকের গুণ্ডাবাহিনী এবং সরকারের পুলিশ একযোগে কাজ করে, কিন্তু বাঁচতে মরিয়া উদ্বাস্তুদের প্রতিরোধ ভাঙতে পারে না, কলোনিও উৎখাত করতে পারে না। পুলিশ বা গুণ্ডাবাহিনী কলোনি ভাঙতে বা উদ্বাস্তুদের উৎখাত করতে এলে, মেয়েরা শাঁখ বাজিয়ে পুরুষদের সতর্ক করে, আর পুরুষেরা লাঠি হাতে বাধা দিতে এগিয়ে আসে। ১৯৫৫ সালের জুলাই মাসে দমদমে ও দক্ষিণ শহরতলির কলোনিগুলিতে পুলিশি আক্রমণ হয়, তখন পুরুষেরা পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়। আর কলোনির মেয়েরা দল বেঁধে সতর্ক পাহারায় থাকে। হুগলি জেলার মাহেশে জমিদারের লেঠেল-বাহিনী ও পুলিশ কলোনি ভাঙতে উদ্যত হয়। নির্বিচারে লাঠিচালনা হয়, ব্যবহার করা হয় কাঁদানে গ্যাস। জনৈক ছাত্রনেতা অরুণ সেনের নেতৃত্বে গড়ে ওঠে, দুর্বার প্রতিরোধ। প্রফুল্ল চক্রবর্তী তাঁর গ্রন্থে লিখছেন, "The women volunteers stood in the van against the assault of the police. Behind them stood the male volunters, and the children brought up the rear." উদ্বাস্তু-জীবনে মেয়েদের ভূমিকা সম্বন্ধে আমাদের স্বতন্ত্রভাবে পরে আলোচনা করতে হবে।

নির্বাসন যাদের নিয়তি, বাস্তু ত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে তাদের যেন আত্মপরিচয় হারিয়ে যায়। দেবেশ রায়ের উল্লেখযোগ্য গল্প 'উদ্বাস্তু'-তে সত্যব্রত লাহিড়ী আসল সত্যব্রত লাহিড়ী কিনা, অনিমা সান্যাল আদতে অনিমা সান্যাল কিনা সে বিষয়ে সংশয় তৈরি হয়। অ্যান্টনি শের-এর লেখা *Middlepost* উপন্যাসে ব্রিটেনে উদ্বাস্তু হয়ে চলে আসা ইহুদিদের সত্তাসংকটের কথা আছে। জন্মের পরে নায়কের নামকরণ হয়েছিল Zeev Zail। জন্মস্থান থেকে যখন ব্রিটিশ দক্ষিণ আফ্রিকায় এসেছিল সে, তখন দলিলে তার নাম হয়ে গিয়েছিল Zeev Immerman। দক্ষিণ আফ্রিকায় প্রবেশের সার্টিফিকেটে নাম হয়ে গেল Maurice Josife Brodnik। কোন নামই শেষ পর্যন্ত টিকল না, শেষ পর্যন্ত পরিচিত হলো সে Smous হিশেবে, যেটা কোন নাম নয়, আফ্রিকানস্ ভাষায় যার অর্থ ফেরিওয়ালা, ঐ নাম অর্জনের সময় যা ছিল তার পেশা—'of the several names at his disposal, it became his favourite.' এইভাবে উদ্বাস্তু মানুষেরা

আত্মপরিচয় হারিয়ে যেতে থাকে। এই কলোনির দুর্গগুলি প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে বাঙালি উদ্বাস্তুরা আবার যেন তাদের হারানো আত্মপরিচয় ফিরে পেল। পায়ের তলায় শুধু মাটি পেল না, ১৯৫২ সালের সাধারণ নির্বাচনের সময় তারা তাদের শক্তিসম্বন্ধে সচেতন হলো; তারা বুঝতে পারল তাদের সমর্থন নির্ধারণ করতে পারে নির্বাচনপ্রার্থীর ভাগ্য, তাদের ভোট ক্ষমতালাভের নির্বাচনীযুদ্ধে নিতে পারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। প্রফুল্ল চক্রবর্তী এই প্রসঙ্গে লিখেছেন, "The refugee mass walked the streets like Nemesis. The children of the Padma seemed to have risen from the dead. They discovered a purpose in their lives. They were driven by some inner fury and moved like men possessed." উচ্ছেদ বিল, ষোল সংখ্যক আইনের বিরুদ্ধে উদ্বাস্তুদের জমায়েত-মিছিল যেন কলকাতাকে স্থায়ীভাবে অবরুদ্ধ করে রাখে। এই কলোনিগুলির নেতৃত্বের রাজনৈতিক দলাদলি ছিল, অনেক ক্ষেত্রে নেতাদের আর্থিক ভ্রষ্টাচারের খবরও পাই আমরা, কিন্তু এইসব কলোনির সংগঠনগুলি একত্রিত হয়ে গড়ে তোলে যে U.C.R.C. তা পশ্চিমবঙ্গে এক গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক শক্তি হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে। এই সংগঠন পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচনী রাজনীতিকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে এবং ক্ষমতার ভারসাম্য কংগ্রেসের হাত থেকে বামপন্থীদের, বিশেষত, কম্যুনিস্টদের হাতে সরে যাওয়ার ব্যাপারে একটি প্রধান ভূমিকা পালন করে।

এই উদ্বাস্তু-কলোনি গড়ে তোলার, এই ছিন্নমূল মানুষের নতুন দেশের মাটিতে শিকড় চারিয়ে দেবার যে ঐতিহাসিক সংগ্রাম তার প্রায় কোনও চিহ্ন বাংলা সাহিত্যে নেই। বাঙালির এই-যে প্রচণ্ড প্রাণশক্তির পরিচয় আমরা রাতারাতি উদ্বাস্তু উপনিবেশ গড়ে তোলায় পাই, গুণ্ডা-পুলিশের বিরুদ্ধে প্রতিরোধে পাই, চলল মেয়ে রণে চলল মেয়েদের রণরঙ্গিনীমূর্তিতে পাই, কলকাতার পথে-পথে মিছিলে পাই, নিজেদের আত্মপ্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে পাই—তার কথা বাংলা সাহিত্য বলল না, আমাদের সাহিত্য বোবা হয়ে থাকল। নীরবতার দ্বারা নিজেকেই সে দরিদ্র করল। লেখা হতে পারত এক সংঘবদ্ধ মানুষের সংগ্রামের মহাকাব্য, কিন্তু প্রায় কিছুই লেখা হলো না। অল্পকিছু কথা পাই সাবিত্রী রায়ের 'স্বরলিপি' উপন্যাসে, যে উপন্যাস লেখার জন্য লেখককে, কম্যুনিস্ট পার্টির এক সদস্যকে, নিজের পার্টির কাছে জবাবদিহি করতে হয়েছিল। কলোনি আক্রমণ করে জবরদখল জমির মালিকের গুণ্ডারা, বিপদের সংকেত হিশেবে ঘরে ঘরে শাঁখ বেজে ওঠে। উদ্বাস্তুদের সামনে মধু মুখার্জি বক্তৃতা দেয়, হিন্দুদের সম্পত্তি পুনরুদ্ধার করাই হবে সরকারের প্রধান কাজ; ছিন্নমূল মানুষের ভিটেমাটি ফিরিয়ে দিতে হবে। প্রায়-উন্মাদ এক উদ্বাস্তু নিজের স্ত্রীকে সান্ত্বনা দিয়ে জানায়, "তোমার মেয়ের মান আমি বাঁচাইছি। যবনের হাতে দিই নাই—পদ্মার জলে দিয়া আসছি।" শ্রমিক শ্রেণীর সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের পথেই বাস্তুহারারও মুক্তি, এইসব

কেতাবি কথা উদ্বাস্তুরা, উদ্বাস্তু মেয়েরা বুঝতে পারে না। তারা বরং বোঝে মধু মুখার্জির কথা, যে বলে, আমরা বুঝি হিন্দুর স্বার্থ। হিন্দুর স্বার্থের কথা যে বলবে আমরা তারই দিকে। সে বলে, কম্যুনিস্টরা মুসলমানদের দালাল। সহজেই বোঝা যায় কেন এই উপন্যাসটিকে কম্যুনিস্ট পার্টি পছন্দ করতে পারেনি। কম্যুনিস্টদের পছন্দের উপন্যাস 'তমস'-এ কমরেড দেবদত্ত মনে করত শ্রমিক শ্রেণীতে যার জন্ম সে হিন্দু-মুসলমান নিয়ে ব্যস্ত হয় না, কিন্তু পরে সেও বুঝেছিল বিষ অনেক গভীরে ঢুকেছে। শ্রমিকরাও ধর্মের ভিত্তিতে ভাগ হয়ে আজ দাঙ্গায় লিপ্ত।

আর একটি উপন্যাসে এইসব উদ্বাস্তু-কলোনির মানুষের সংগ্রামের কথা খানিকটা রূপায়িত হয়েছে, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'অর্জুন' উপন্যাসে। লেখকজীবনের প্রথমপর্বে লেখা এই উপন্যাসটি সাহিত্য হিশাবে খুব উঁচু মানের নয়। যে উপাদান হাতের মুঠোয় ছিল তার যথার্থ সদ্ব্যবহার করতে পারেননি এখানে লেখক। উচ্চবর্ণের হিন্দু এখন বাঁচার তাগিদে মুদির দোকান দেয়, লন্ড্রি খোলে। ভালো ছাত্র চায়ের দোকানের বয়, পুরুতের ছেলে ট্যাকসি চালায়, যারা ছিল জমির আয়-নির্ভর তারা পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে ব্যবসায় নামে। সংসারের সাশ্রয়ের জন্য মেয়েরা মাস্টারি করে, তাদের বিয়ের প্রশ্ন ওঠে না। পুববাংলা থেকে চলে আসার সময় সীমান্ত পার হয়ে তারা নিশ্চিন্ত হয়েছিল, কিন্তু এখানেও মাঝে মাঝে যুবতী মেয়ে উধাও হয়ে যায়। বাগানবাড়ির মালিক জবরদখলকারী উদ্বাস্তুদের উৎখাত করতে চায়, আর নিকটবর্তী প্লাইউড কারখানার মালিক কেওয়ল সিং কারখানার সম্প্রসারণ করতে চায়। দুইপক্ষের স্বার্থ মিলে যায় বলে দুজনের সমঝোতা হয়। চাকরির লোভ দেখিয়ে উদ্বাস্তু যুবক দিব্যকে হাত করে কেওয়ল সিং। আরো তিন-চারটি ছেলেকে চাকরি দিয়ে উদ্বাস্তুদের ঐক্য ভেঙে দেয় এই কারখানার মালিক। একদা-স্বাধীনতাসংগ্রামী ঠাকুরদাও হার মেনে নেয়। দিব্যকে বাধা দিতে গিয়ে লাবণ্য প্রায় খুন হয়ে যায়। কারখানা বিস্তারের জন্য যে পাঁচটি বাড়ি ভাঙা দরকার, সেই বাড়িগুলিতে আগুন লাগে। পুলিশ সহানুভূতি দেখায়, কিন্তু সাহায্য করে না। কেওয়ল সিং-এর দেয়াল গাঁথা হয়ে যায়। দেয়াল ভাঙতে গিয়ে নিদারুণভাবে আহত হয় অর্জুন। এই উপন্যাসটি লেখার জন্য আমরা সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের কাছে কৃতজ্ঞ থাকি। কিন্তু সংঘবদ্ধ উদ্যোগ, সংগঠন গড়ে তোলা, জমি জবরদখল, কলোনির ঘর তোলা, পুর্ববঙ্গের প্রতিকল্প জীবন রচনার প্রয়াস, শিক্ষা জীবিকা ও আত্মপ্রতিষ্ঠার লড়াই, গুণ্ডাদের আক্রমণ, গুণ্ডাদের কাজে পুলিশের সহযোগিতা, গুণ্ডা-পুলিশের বিরুদ্ধে মেয়েপুরুষদের মিলিত প্রতিরোধ, উদ্বাস্তুদের রাজনৈতিক মনোভঙ্গির বিবর্তন ইত্যাদি নিয়ে লিখিত হতে পারত যে মহাকাব্যিক বাংলা উপন্যাস তা অ-লিখিত থেকে গেল।

মুক্তি : নারী-মুক্তি

অমর মিত্রের 'দমবন্ধ' গল্পের প্রভাময়ীর মন সব সময় পুববাংলায় পড়ে আছে—ট্রানজিস্টারে সেই দেশের খবর শোনে, খুলনা জেলার অকৃত্রিম উচ্চারণে কানে পৌঁছুলে আমূল চমকে ওঠে। কিন্তু সেই নারী আবার সঙ্গে সঙ্গে ভাবে, দেশভাগ না হলে তার ছেলেরা হয়তো দু-তিনটে করে বিয়ে করত। প্রভাময়ীর ছোট ছেলে ভাবে, দেশভাগে দেশত্যাগী না হলে সে হয়তো জমি চাষ করত, তার দাদা পাশা খেলে অলস দিন কাটাত। কিন্তু যে-মুহূর্তে মানুষ ভিটেছাড়া হলো, অমনি ভেঙে গেল অনেক চিরাগত বদ্ধমূল সংস্কার। পথে যেই বেরোল, অমনি বহুদিনের জড়তা ভেঙে এল সামাজিক চলিষ্ণুতা। জাতপাতের ভেদ ভাঙতে শুরু করল, 'নোয়াখাইলা নমঃশূদ্র' আর ব্রাহ্মণ একাকার হয়ে গেল। সরোজকুমার রায়চৌধুরীর 'মহাকাল' উপন্যাসে রক্ষণশীল ব্রাহ্মণ ঘরের বিধবা গায়ত্রী প্রেমিক মহেন্দ্রকে বিয়ে করতে রাজি ছিল না। নোয়াখালির দাঙ্গায় গায়ত্রীকে জোর করে নিকা করে এক মুসলমান যুবা। পরে গায়ত্রীকে উদ্ধার করা হয়। মহেন্দ্রের বিশ্বাস এবার গায়ত্রী তাকে ফেরাতে পারবে না। কারণ 'যে ধাক্কা আজ হিন্দু সমাজ পেল তা যত মর্মান্তিকই হোক না কেন, তারও প্রয়োজন ছিল। নইলে বিধি-নিষেধের এই জগদ্দল পাথর কিছুতেই ঠেলা যেত না।' মহেন্দ্রের বিশ্বাস এবার গায়ত্রীর সংস্কারের শক্ত খোলস ভাঙবে। স্টিমারে, ট্রেনে যেতে-যেতে, একত্রে হাঁটতে হাঁটতে, স্টেশনের প্লাটফর্মে একসঙ্গে পিণ্ড পাকিয়ে বসবাস করতে করতে, ক্যাম্পজীবনের সর্বজনীনতায় ভেঙে গেল খাদ্যাভাসের, ছোঁয়াছুয়ির না-ভেবে-চিন্তে মেনে-চলা অনেক সংস্কার। কলোনিগুলিতে ছত্রিশজাতের একত্র বসবাসে, ওঠা-বসায়, সংগঠনে-সংগ্রামে ভেঙে যেতে লাগল ভেদ আর সংস্কারের বেড়াজাল—'breaking the divides of dialects and rituals. বাঁচার প্রয়োজনে পুরনো পেশা ছেড়ে নতুন পেশা গ্রহণ করতে হয়। কেউ লন্ড্রি খোলে, পুরুতের ছেলে আজ ট্যাকসি চালায়, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর গল্পে ক্ষয়িষ্ণু জমিদার বংশের ছেলেও আজ ট্যাকসি চালায়। যৌথ একান্নবর্তী পরিবার ভেঙে পড়তে শুরু করল পরিস্থিতির চাপে। সর্বোপরি মেয়েরা বেরিয়ে এল ঘরের গণ্ডির বাইরে, উপার্জনের তাগিদে। যেমন শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্পের প্রিয়ংবদা নার্সিং বৃত্তি নেয়। সন্তোষকুমার ঘোষের 'দ্বিজ' গল্পে দেশবিশ্রুত পণ্ডিতের সন্তান নিশিকান্ত। উদ্বাস্তু হয়ে এসে সে সিদ্ধান্ত নেয় 'ব্রাহ্মণ্য অভিমানের ময়ূর পুচ্ছ আর না', তাই বিড়িশ্রমিক হয় সে। পান সাজনের কামকে সে নিচা কাম মনে করে না। অমলেন্দু চক্রবর্তীর 'অধিরথ সূতপুত্র' গল্পের একদা-পুরোহিত বৃন্দাবন ভট্টাচার্য বেসরকারি দপ্তরে কাজ করে। সবাই জানে কেরাণি, আসলে উর্দিপরা পিয়ন সে। সব সময় যে জাতপাত মুছে গেছে তা অবশ্য নয়। প্রফুল্ল রায় 'নোনাজল মিঠেমাটি' উপন্যাসে আন্দামানে পুনর্বাসিত উদ্বাস্তুদের কথা লিখেছেন। 'এতদিন তাদের জাত ছিল না। বিফুজি ক্যাম্পে,

স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে কি খোলা আকাশের নীচে মানুষগুলো এক, অভিন্ন হয়ে গিয়েছিল।.... (আন্দামানে এসে) মাটি আর ঘর, সমাজ আর সংসারই শুধু নয়, দেশভাগের পর যে জাত তারা হারিয়ে ফেলেছিল, যে ভাগ যে ভেদ এবং যে সীমারেখাগুলো ভেঙে গিয়েছিল—সেসব আবার ফিরে এসেছে।'

কোন-কোন মেয়ে দেশভাগ-দেশত্যাগের আঘাত কোনদিনই সামলে উঠতে পারেনি, কিন্তু 'Others saw in this rupture a moment of unexpected liberation of themselves as women.' পাঞ্জাবের দুই মহিলার কথা লিখেছেন ঋতু মেনন ও কম্‌লা ভাসিন। একদিকে সোমাবন্তী, তাঁর কাছে মাত্র অতীতেই ছিল মুক্তি আর স্বাধীনতা, যে অতীত তিনি পিছনে ফেলে এসেছেন। অন্যদিকে পাই বিবি ইন্দার কাউরকে, যিনি বলেন দেশভাগের ফলে 'I had spread my wings.'। উর্বশী বুটালিয়া জানিয়েছেন দময়ন্তী সেহগলের কথা। নিজের পরিবারে জায়গা না পেয়ে, একলা হয়ে গিয়ে দময়ন্তীর উত্তরণ ঘটলো বাইরের বিশ্বে। দেশভাগ একদিকে যেমন মেয়েদের শরীর-মনের বিনাশ ঘটিয়েছিল, তেমনি অভাবনীয়ভাবে মেয়েদের সামনে 'public sphere'-এ জায়গা করে নেবার সুযোগ এনে দিয়েছিল। মণিকুন্তলা সেন দেশভাগের ফলে জীবনের যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়া উদ্বাস্তু মেয়েদের মধ্যে 'একটা অদ্ভুত নবজাগরণ' দেখেছেন। তাঁর মনে হয়েছিল পুব বাংলায় থেকে গেলে মেয়েদের মধ্যে হয়তো এই পরিবর্তনটা আসত না, মেয়েরা ডানা মেলতে পারত না। দেশের অর্থনৈতিক জীবনে এক সময় না এক সময় দেশভাগ না হলেও মেয়েদের প্রবেশ ঘটতই, কিন্তু সেই প্রবেশকে ত্বরান্বিত করেছে দেশভাগ ও দেশত্যাগ। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় থেকে অর্থনৈতিক তাগিদে মেয়েরা অন্তঃপুরের বাইরে কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করেছিল, দেশভাগ সেই প্রবেশের লয়কে অতি দ্রুত করে দিল। স্যানাটোরিয়ামে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে চলেছে দারিদ্র্যপীড়িত ক্ষয়রোগগ্রস্ত 'মেঘে ঢাকা তারা' ফিল্‌মের নায়িকা নীতা। সে দাদা শঙ্করকে বলে, বারেবারে বলে, 'বাঁচতে চাই'। পাহাড়ে পাহাড়ে প্রতিধ্বনিত হয় তার বাঁচতে চাওয়া। এই বাঁচার দাবিতে, পরিবারের অন্যদের বাঁচানোর তাগিদে নীতার মতো উদ্বাস্তু পরিবারের মেয়েরা দলে-দলে প্রবেশ করেছিল কাজের জগতে। ঋত্বিক ঘটকের এই ফিল্‌মের শেষে অন্য একটি মেয়েরও চপ্পল ছেঁড়ে। ছেঁড়া-চপ্পলে পা ঘেঁষটে-ঘেঁষটে সেই আর-এক নীতা কলোনির রাস্তা দিয়ে এগোয়। ছেঁড়া চপ্পল, কোন প্রতিবন্ধকতা তার এগিয়ে চলা, ডানা মেলাকে ঠেকাতে পারে না। সুনীলের 'অর্জুন' উপন্যাসের যে অসহায় তরুণী বিধবা-অবস্থায় দেশ ছেড়েছিল, সে এখন শক্ত হাতে রাশ ধরতে জানে। সে ঘরে বসে সেলাই করে উপার্জনও করে।

কিন্তু শুধু ঘরের চৌহদ্দির মধ্যে বসে উপার্জন নয়। যারা ইতিপূর্বে কোনওদিন ঘরের বাইরে কাজ করেনি তারা ঝাঁকে-ঝাঁকে পঞ্চাশের দশকে মজুরির নানা পেশায়

যোগ দিয়েছিল, আর ভেঙে ফেলেছিল অনেক বাস্তব আর মানসিক অবরোধ। এই রকম একটি মেয়ের কথা পাই অশোক মিত্রের 'কলকাতা প্রতিদিন'-এ সংকলিত 'একটি চেনা মেয়ে'-র কথায়। পূর্ববঙ্গের মানুষেরা 'যে-দুনিয়াকে চিনত, তার অবসান হল ১৯৪৭ থেকে ১৯৫০ সালের মধ্যে।' এমন একটি চলে-আসা পরিবারের মেয়ে, কলোনিতে থাকে, ঘরের কাজে অভ্যস্ত, বিবর্ণ ছেঁড়া জামা পরে দৌড়চ্ছে সব সময়। বি. এ. পাস করে, টিউশনি করে, স্কুল মাস্টারি পেয়েছে। বিনোদনহীন, প্রসাধনহীন লড়াইয়ের জীবন তার। 'দায়িত্বের বোঝা একবার যে কাঁধে নিয়েছে, বরাবরের মতো তাকেই আটকে যেতে হয়।' এমন আটকে যাওয়ার কথা বলেছেন মানস রায় 'কাটা দেশে ঘরের খোঁজ' রচনায় নিজের দিদির কথা বলতে গিয়ে—'ততদিনে দিদি বি.এ পাস করেছে। সরকারি আপিসের কনিষ্ঠ স্টেনোগ্রাফার হিসেবে তার চাকরি সংসারের হাল ধরতে কাজে এল, বিয়ের প্রস্তাব আপাতত মুলতবি।' চাকরি করে সংসারের হাল-ধরা এই মেয়েদের অন্তঃসার পরিবার শুষেও নিয়েছে। 'মেঘে ঢাকা তারা'-র নীতার কাছে সবারই চাহিদা—ভাইয়ের, বোনের, এমনকি প্রেমিকের। এম. এ. পড়ার ইচ্ছে তাকে ছাড়তে হয়। পাছে নীতা প্রেমিককে বিয়ে করে চলে যায়, এই ভয়ে মা সন্ত্রস্ত। অসহায় বাবা দেখে মেয়ের বলিদান আর সহৃদয় দোকানদার বলে, 'মরণে তার ছুটি মিলবো'। মেলেও তাই, সংসারের বোঝা টেনে ক্ষয়রোগে মরে নীতা। বীথি চক্রবর্তীর সাক্ষাৎকার থেকে বোঝা যায় কী অসম্ভব লড়াই উদ্বাস্তু মেয়েদের করতে হয়েছিল সংসার বাঁচানোর জন্য। ব্যাংকের চাকরি তাঁকে নিতে দেওয়া হয়নি, তিনি নিলেন শিক্ষকতার বৃত্তি। মাইনে পেয়ে প্রথমে দিতেন বাড়ি ভাড়া, তারপরেই কিনতেন চাল আর নুন। ধার নিয়েছেন, শোধ দিয়েছেন। বোনেরা খালি পেটে জল খেয়ে পরীক্ষা দিতে গেছে। দিদি বাড়ি ফিরলে ছোটভাই জানতে চাইত দিদি মুড়ি এনেছে কিনা। কোন কাজের অছিলায় সহৃদয়া প্রধান শিক্ষিকা রবিবারেও ডেকে পাঠাতেন, আসলে পেট ভরে খাওয়ানোর জন্য। নরেন্দ্রনাথ মিত্রের যে-গল্প অবলম্বনে সত্যজিৎ রায়ের 'মহানগর' ফিল্‌ম, সেই গল্পে পূর্ববঙ্গ থেকে উৎখাত হয়ে আসা পরিবারের বধূ চাকরি নেয়। নরেন্দ্রনাথের আর এক উপন্যাসে বরিশালের অভিজাত গুহঠাকুরতা পরিবারের মেয়ে টেলিফোন-গার্লের চাকরি নেয়। দেশভাগের অব্যবহিত পরে যে মেয়েদের মধ্যে দ্রুত শিক্ষা বিস্তার ঘটতে শুরু করল, তারও কারণ চাকরি করে উপার্জন করতে গেলে, স্বাবলম্বী হতে গেলে শিক্ষা বিনা উপায় নেই, এই সচেতনতা।

দেশের সীমান্ত আমাদের পরিচিত গণ্ডির নিরাপত্তার মধ্যে আবদ্ধ করে রাখে। আর 'Exiles cross borders, break barriers of thought and experience'. সীমানা অতিক্রম করার সঙ্গে-সঙ্গে অনেক মানসিক বাধার সীমানাও অতিক্রম করা হয়ে যায়। মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়েরা অন্তঃপুরের বাইরে এসে যেই চাকরি নিল,

সঙ্গে-সঙ্গে তারা যেন এক সীমানা অতিক্রম করে গেল। কিন্তু সবাই তো চাকরি পেল না। তাদের লড়াই আরো তীব্র। বাস্তুচ্যুত হওয়ায় অর্থের প্রয়োজনে জ্যোৎস্না নামের একটি মেয়েকে অভিনয়ে নামতে দিতে অনিচ্ছায় রাজি হয় তার পরিবার। এই জ্যোৎস্নাই পরে হয়ে ওঠেন যাত্রার অপ্রতিদ্বন্দ্বী অভিনেত্রী জ্যোৎস্না দত্ত। একই ইতিহাস যাত্রা-অভিনেত্রী বীণা দাশগুপ্তার। এমনই ইতিহাস বরেণ্য অভিনেত্রী সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়ের। নর্তকী-অভিনেত্রী মিস্ শেফালির পরিবার ঢাকা থেকে উদ্বাস্তু হয়ে এসে আশ্রয় নিয়েছিল কলকাতার আহিরিটোলায়। 'সেখানে মায়ের পরের বাড়িতে বাসনমাজা, আশ্রয়দাতার ফাইফরমাস খাটা, বেকার বাবার কাজ জোগাড়ের চেষ্টা, ছোট্ট ভাইটির কান্না, ঠাকুমার অসহায় মুখ—প্রতিটা দিনই ছিল বিভীষিকাময়। রাতগুলো কেটে যেত যেমন-তেমন, দিনের আলো ফোটার ভয়ে সিঁটিয়ে থাকতাম। তখন থেকে মরিয়া হলাম পরিবারের মুখে অন্ন জোগানোর চিন্তায়।' সেই চিন্তা থেকেই তিনি হন পানশালায় পেশাদার নর্তকী, পরে মঞ্চে-ফিল্‌মে অভিনেত্রী। একই ইতিহাস ফিল্‌ম ও মঞ্চের অভিনেত্রী লিলি ও শেলি চক্রবর্তীর। সমরেশ বসুর 'পশারিনী' গল্পে বজ্রহাটের নিরাপদ মাস্টারের মেয়েকে নিজের বানানো পুতুল চলন্ত ট্রেনে হকারি করে বিক্রি করতে দেখি। সবাই তো চাকরি পায় না, সবাই সুস্থ পথে সফলও হয় না। কিন্তু বাঁচতে তো হবেই, পরিবারের মানুষকে বাঁচাতেও হবে। তাই অনেক অল্প বয়সী মেয়ে চলে যায় ক্লিন্ন অন্ধকার সরল পথে। যখন খোলা থাকে দপ্তরগুলি সচরাচর সেই সময়ে, কলোনি থেকে কলকাতার রাস্তায় চলে আসে এইসব দুর্ভাগিনী মেয়েরা। 'They did not care, they lived in the present, showed no sign of repentence.' মানস রায় এমন একটি মেয়ের কথা জানিয়েছেন, 'টেরুর একটি দিদি ছিল। সে ঠোঁটে লিপস্টিক মেখে, চড়া রঙের ডেকরন পরে সন্ধ্যায় বেরিয়ে যেত দেখে পাড়ায় ফিসফিসানি ছিল। দাদারা বলত, কুচিত্রা সেন।' এই কুচিত্রা সেনদের হেয় করবার কোন অধিকার নেই আমাদের, অথবা তাদের কাছ থেকে অনুতাপ দাবি করবার। তারাও নীতার সঙ্গে গলা মিলিয়ে নিঃশব্দে বলছিল, 'বাঁচতে চাই'।

পথে বের হওয়া মাত্র ভাঙতে শুরু করেছে পায়ের বেড়ি আর মনের সংস্কার। দেশভাগ-দেশত্যাগের ফলে সেই ভাঙার এক অসাধারণ কাহিনী পাই দিনেশচন্দ্র রায়ের অসাধারণ 'কুলপতি' গল্পে। যে-বধূটির কথা এই গল্পে, তার শ্বশুরবাড়ি চার পুরুষ ধরে কুলদেবতা কালাচাঁদের সেবায়েত। ঘরবাড়ি, বিষয়সম্পত্তি, কর্মচারী সব কালাচাঁদের। 'কালাচাঁদের চারিদিকে কেমন ক্ষমতা আর প্রতাপ ঠিকরে পড়ে। আমি বাঁদী, আমার শ্বশুর ভৃত্য।' নববধূর এই দশায় তার তরুণ স্বামীর অসহায় লাগে। কিন্তু বাবার বিরুদ্ধে বিদ্রোহে তার সাহস নেই। এই বাবা কালাচাঁদের নামে প্রবল প্রতাপে জমিদারি শাসন করে, খাজনা আদায় করে। মুক্তি এল দেশত্যাগের মধ্য দিয়ে।

হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক গরম হয়ে উঠতেই অনেক জমিদারবাড়ির মন্দির অপবিত্র হলো। অন্যদিকে সাম্প্রদায়িক নিরপেক্ষতা বজায় রাখবার প্রয়োজনে লেখক পীরসাহেবকে খুন করালেন। নমশূদ্র লাঠিয়াল জড়ো করেও নিরাপত্তা মেলে না, মুসলমান দারোগাও নিরাপত্তার আশ্বাস দিতে পারে না। কালাচাঁদকে নিয়ে শ্বশুর স্বামী-পুত্রবধূ তিনজনে তাই দেশত্যাগ করতে পথে নামে। প্রবল প্রতাপান্বিত কালাচাঁদ এখন বউটির জামার মধ্যে দুই স্তনের মাঝখানে লুকিয়ে থাকে। অন্ধকার রাস্তার মোড়ে মোড়ে লুঠেরার দল, তবু নিজেকে বাঁচিয়ে নিয়ে যাওয়ার মধ্যে একটা শৌর্য আছে। সামনে অনিশ্চিত জীবন, 'তবু সেটা নতুন করে স্বাধীনভাবে গড়ে তুলতে পারব।' পথে বেরিয়ে পড়তেই সারাজীবনের জেলখাটার মেয়াদ যেন মকুব হয়ে গেল। স্বামীর মাথায় লাঠি পড়ে, রক্তপাত হয়, মশালধারী ডাকাতদের হাতে সর্বস্ব তুলে দিতে হয়। কালাচাঁদকে অনাহারী রেখে নিজেরা খেয়ে নেয়, ভুলে যায় এতোদিনের নিয়ম, ভেঙে পড়ে আবহমান সংস্কার। এই পুরনোকে ভেঙে নতুনকে গড়ার দিনে, বাবার সামনে অসংকোচে আহত স্বামী স্ত্রীর হাত ধরে এগোতে পারে। রাতের অন্ধকারে স্বামী গড়িয়ে স্ত্রীর সান্নিধ্যে আসে আর ব্যথা পেয়ে চেঁচিয়ে ওঠে। স্ত্রী বুঝতে পেরে, ব্যথার কারণ যে পাথরের কালাচাঁদ তাকে বুকের নিরাপত্তা থেকে গভীরতর অন্ধকারে ছুঁড়ে ফেলে দেয়। স্বামী-স্ত্রীর মিলনের বাধা দূর হয়। সামন্ততান্ত্রিকতার শাসন থেকে দেশভাগ এই দম্পতিকে মুক্তি দেয়। পথে বেরিয়ে আসা এক অসামান্য বাস্তব কিশোরীর কথা জানিয়েছেন হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়। মেয়েটির শিক্ষক বাবা এক বর্ধিষ্ণু মুসলমান পরিবারের ছেলের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দেবেন, এই শর্তে নিরাপত্তার আশ্বাস পান। মেয়েটির মা এই চুক্তির কথা জেনে একেবারে ভেঙে পড়েন। মেয়েটিও সব জানতে পারে এবং এই ব্যবস্থা ব্যর্থ করতে কৃতসংকল্প হয়। বাবার সাময়িক অনুপস্থিতির সুযোগে সে মা, ভাই আর অন্য বোনকে নিয়ে ভারতের উদ্দেশে গৃহত্যাগ করে। 'এই রোমাঞ্চক অভিযানের নেতা তার মা নয়, সে নিজে।' বাধাবিঘ্ন এড়িয়ে সে সবাইকে নিয়ে কোনওক্রমে বেনাপোলে পৌঁছোয়। পুরুষ-অভিভাবকহীন এই পরিবারকে ক্যাম্পে নজরবন্দী করে রাখা হয়। রাত্রি গভীর হলে প্রথম সুযোগেই এই অসামান্য কিশোরী ক্যাম্প ছেড়ে পালায় সবাইকে নিয়ে। অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে মাঠের পর মাঠ ভেঙে পশ্চিমবঙ্গের সীমান্তে প্রবেশ করে সে মানসিক বল, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, দুর্জয় সাহস ও ব্যক্তিত্বের পরিচয় দিয়ে। দেশভাগের সংকটের দিন ঘনিয়ে না এলে এই কিশোরীর মানসিক শক্তির অগ্নিপরীক্ষা হতো না।

উদ্বাস্তু কলোনিগুলিতে পরিবারপিছু একটিমাত্র ঘর। একটি ঘরই একটি বাড়ি এই নতুন উপনিবেশে। পূর্ববঙ্গে যেমন ছিল, তেমনি সদর আর অন্দরের ভেদ নেই। পুববাংলায় সদরে বৈঠকখানায় ছিল পুরুষদের একাধিপত্য, অন্দরে ছিল মেয়েদের। দুটো ছিল যেন আলাদা জগৎ। কলোনিতে সেই আলাদা জগৎ আর বজায় থাকল

না—ভিতর মহল আর বাইরের মহলের ভেদ ঘুচে গেল। *Coming out of Partition : Refugee Women of Bengal* বইতে গার্গী চক্রবর্তী যথার্থই বলেছেন, 'the private-public divide broke down.' যেই ভেদ ঘুচে গেল, অমনি কলোনিরক্ষার সংগ্রাম বিষয়ে, রাজনৈতিক প্রসঙ্গ নিয়ে পুরুষদের সঙ্গে মেয়েরাও আলোচনায় যোগ দিতে শুরু করল। কাছাকাছি এসে গেল দুই জগৎ—মেয়েদেরও রাস্তার কল থেকে জল আনতে হয়, বাজার করতে হয়, উপার্জনে বেরোতে হয়। ফলে পুরুষদের পৃথিবী, আর মেয়েদের পৃথিবীর মধ্যে স্বাতন্ত্র্য আর বজায় রাখা যায় না। পুরুষদের জগতের সান্নিধ্যে আসার ফলে নতুন-নতুন বোধের সঙ্গে, ধারণার সঙ্গে মেয়েদের পরিচয় ঘটে। নতুন-নতুন ধারণা আদর্শবাদের সঙ্গে পরিচয়ে, রাজনৈতিক আলোচনায় যোগ দেওয়ায়, কলোনি রক্ষার সংগ্রামে যোগ দেওয়ায় মেয়েদের মুক্তি এক বিরাট পদক্ষেপ এগিয়ে যায়। হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় বর্ণনা করেছেন দাবি আদায়ের জন্য পুরুষ নেতাদের নির্দেশ মেয়েরা কীভাবে তাঁকে ঘেরাও করেছিল। যে মুহূর্তে উদ্বাস্তু মেয়েরা সীমান্ত পেরিয়েছিল সেই মুহূর্তে তারা 'highly segregated world' ভাঙতে শুরু করেছিল। তারা আত্মপ্রকাশ করতে শুরু করেছিল 'public and more visible space'-এ। ত্বরান্বিত হলো মেয়েদের 'politicalization'। তাদের এই 'political activism' অবশ্য ঘটেছিল 'out of compulsion.'

যে-সব জমিতে জবরদখল কলোনি গড়ে উঠেছিল সেইসব জমির মালিকরা পুলিশ ও গুণ্ডার সাহায্যে হামলা করালে হাতা-খুন্তি-ঝাঁটা-বঁটি নিয়ে মেয়েরা প্রতিরোধে সংঘবদ্ধ হয়েছে। নেতাজি কলোনির গোড়ার দিকের স্মৃতিকথা লিখতে গিয়ে মানস রায় জানিয়েছেন, যখনই গুণ্ডারা কলোনি আক্রমণ করে উদ্বাস্তুদের নতুন করে উদ্বাস্তু করতে এসেছে, তখনই মেয়েরা শাঁখ বাজিয়ে কলোনিবাসীকে সতর্ক করে দিয়েছে আর পুরুষেরা প্রতিরোধে একত্রিত হয়েছে। 'স্বরলিপি' উপন্যাসে সাবিত্রী রায় বর্ণনা করেছেন, যেই কলোনি আক্রমণ করে ভাড়াটে গুণ্ডারা, অমনি বিপদের সংকেত হিশেবে মেয়েদের শাঁখ বেজে ওঠে ঘরে-ঘরে। কলোনি রক্ষার দায়িত্ব কীভাবে মেয়েরা পালন করেছিলেন সেটা জানতে গেলে আমাদের পড়তে হবে 'কলোনিস্মৃতি'। বারেবারে পুলিশ বা গুণ্ডাবাহিনী যখন নিকটবর্তী কোনও কলোনিতে হামলা করত, তখন লেখক ইন্দুবরণের স্ত্রী সাধনার নেতৃত্বে আজাদগড় মহিলা সমিতির সদস্যারা পুলিশের গাড়ি আটকানোর জন্য রাস্তা অবরোধ করতেন। দুর্গাপুর ক্যাম্পের ছিন্নমূল মানুষেরা সরকারি টাকশালের পিছনের জমি বেছে নেয় কলোনি স্থাপনের জন্য। পুলিশ সেই উদ্যোগে বাধা দেয়। উদ্বাস্তু মেয়েরা চারদিন ধরে তীব্র লড়াই চালায় পুলিশের বিরুদ্ধে। কলোনির প্রতিরোধের দুর্গ গড়তেই শুধু মেয়েরা সাহায্য করে না, উদ্বাস্তু-আন্দোলনে যোগ দিয়ে মেয়েরা, এমনকি কোলে ছেলে নিয়েও, কলকাতার রাজপথে মিছিলে বেরিয়ে পড়ে। এক অভূতপূর্ব দৃশ্য দেখে কলকাতা। উদ্বাস্তু-সংগঠন

U.C.R.C.-র নেতৃত্বে সংগঠিত মিছিলে এক-পঞ্চমাংশ থাকে মেয়েরাই। প্রফুল্ল চক্রবর্তী সঙ্গতভাবে বলেছেন, "Indeed, it may not be an exaggeration to say that it was the UCRC which first brought women in such large numbers into the streets of Calcutta." মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির হাত ধরে কম্যুনিস্ট পার্টির কাছেও চলে এসেছিল বহু মেয়ে। *The Trauma and the Triumph* বইতে সংকলিত হয়েছে সুকুমারী চৌধুরীর সাক্ষাৎকার। তিনি বলেছেন, শিক্ষা অর্জন, রাজনীতিচর্চা, কম্যুনিস্টদের সভায় ও বামপন্থী আন্দোলনে যোগদান, ট্রেড ইউনিয়ন কার্যকলাপে অংশগ্রহণ তাঁকে এক নিয়মানুবর্তী সংগঠিত জীবন গড়ে তুলতে সাহায্য করেছিল। বিধবা হয়ে তিনি দ্বিতীয়বার বিয়ে করতে দ্বিধা করেননি। বেঙ্গল ল্যাম্পে বোনাসের দাবিতে পুরুষকর্মীদের সঙ্গে তাঁর মতো উদ্বাস্তু নারী কর্মীরা মিলিত আন্দোলন করেছে। এইসব অর্থনৈতিক দাবি-দাওয়ার আন্দোলনে উদ্বাস্তু মেয়েরা সাগ্রহে যোগ দিত, কারণ চরম দারিদ্র্যপীড়িত এই মেয়েদের কাছে এও ছিল বাঁচার লড়াই।

হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর গ্রন্থে আর একটি গল্প বলেছেন। কুপার্স ক্যাম্পে এক নরখাদক শূকর, যাকে হায়েনা বা অন্য কোন হিংস্র জন্তু মনে করা হচ্ছিল, সে একের পর এক শিশুকে ছিনিয়ে নিয়ে আহারের জন্য হত্যা করছিল। সৃষ্টি হয়েছিল দারুন আতঙ্ক। এক শিশু শৌচকর্মে গেলে সেই জন্তু তাকে আক্রমণ করে। সতর্ক প্রহরারত মা ঝাঁপিয়ে পড়ে জন্তুটির গলা এমনভাবে টিপে ধরে যে জন্তুটি পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়। 'মাতৃশক্তির কাছে এই বিভীষিকা হার মানল।' রিফিউজি মেয়েদের জাগরণে মাতৃশক্তির/নারীশক্তির জাগরণ ঘটেছিল। কলোনির মধ্যে মাতৃশক্তির সাক্ষাৎ পেয়ে অশোক মিত্রের মনে হয়েছিল যেন তিনি ব্রেখটের মাদার কারেজের সাক্ষাৎ পেলেন। বুকের পাটা কাকে বলে যদি দেখতে চান, এই চৌহদ্দির মধ্যেও এখনও তার অনেক উদাহরণ পাওয়া যাবে। একদা সম্পন্ন পরিবারের এই বিধবা মহিলাকে ঘটনার গতি দ্রুততর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দেশত্যাগের সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছিল। ছেলেমেয়ে নাতিনাতনিদের নিয়ে তিনি উদ্বাস্তু সমাজের হয়ে উঠলেন অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। ভাঙা ঘরের দম-আটকানো পরিবেশে এই মহিয়সী মহিলা পুরনো বংশগৌরবের স্মৃতিকে ঘাড় ধরে বের করে দিয়ে নতুন জীবনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিয়েছেন। বিপর্যয় সামলানো তাঁর অভ্যাস হয়ে গিয়েছে। 'নালিশ নেই; বিশ্বাসও তিনি হারাননি।' দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে নয়, দারিদ্র্যের ফলে যে মূল্যবোধের অবক্ষয় তারই বিরুদ্ধে তাঁর একমাত্র নালিশ। তাঁর সাহসিকতার উত্তরাধিকার যে পরবর্তী প্রজন্ম পেল না, সেটাই দুঃখের।

উদয়ভিলার অভিজ্ঞতার প্রতিবেদন রচনা করতে গিয়ে Reintegrating the Displaced, Refracting the Domestic প্রবন্ধে বোলান গঙ্গোপাধ্যায় লিখেছেন,

পূর্ববঙ্গ থেকে বাস্তু হারিয়ে আসা মহিলারা মধ্যবিত্ত নারীদের যে সংরক্ষণশীল পারিবারিক অবস্থান এতদিন ছিল, পরিস্থিতির চাপে, তার পরিবর্তন ঘটালেন। এই পরিবর্তন ছিল মৌলিক। তাঁরা সাংসারিক গণ্ডির লক্ষ্মণরেখার বাইরে পা দিলেন, বৃহত্তর জীবনের দৈনন্দিন ইতিহাসে অংশ নিতে শুরু করলেন এবং গড়ে তুলতে শুরু করলেন পারিবারিক গৃহস্থালি জীবনের এক নতুন আদর্শ। এইভাবে যেমন পাঞ্জাবের মেয়েরা, তেমনি বাংলার উদ্বাস্তু মেয়েরা নিজেদের নতুন আবাস শুধু গড়ে তুললেন না, ভাগ্যের কাছে নতি স্বীকার করতেও অস্বীকার করলেন। তাঁরা, যশোধরা বাগচী ও শুভরঞ্জন দাশগুপ্তের ভাষায়, 'displayed exemplary resilience, fortitude, patience and strength to emerge victors against combined nightmare of assault, exodus, displacement, grinding poverty and broken psyche.'

দেশভাগ-দেশত্যাগ নিয়ে লিখলে পাছে সাম্প্রদায়িকতার নেতিবাচকতা প্রশ্রয় পেয়ে যায়, সেই ভয়ে বাংলা সাহিত্য যেন শিটিয়ে ছিল। কিন্তু দেশভাগ-দেশত্যাগের এই যে ইতিবাচক সামাজিক পরিবর্তন, মুক্তির পথে, আত্মবিকাশের পথে, মানুষ হিশেবে আত্মপরিচয়ের পথে মেয়েদের এই যে পদক্ষেপ সেই সম্বন্ধে বাংলা সাহিত্য কেন বোবা হয়ে থাকল? সাম্প্রদায়িকতার ছোঁয়াচ লাগতে পারে এই ভয়ে কি এত বড় ঐতিহাসিক অগ্রগতির দিকেও লেখকেরা নজর দিতে ভুলে গেলেন?

অনুপস্থিত নিম্নবর্গ

রণবীর সমাদ্দার সম্পাদিত *Reflections on Partition in the East* প্রবন্ধ-গ্রন্থে বাংলাদেশের লেখক কায়েস আহমেদের একটি বাংলা প্রবন্ধের অনুবাদ সংকলিত হয়েছে। এই লেখক অনন্য কথাসাহিত্যিক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পৈতৃক ভিটার সন্ধানে বিক্রমপুরের মালপদিয়া গ্রামে গিয়েছিলেন। সেখানে দুজন মানুষের সঙ্গে কায়েস আহমেদের পরিচয় হয়—একজন বিমল মুখার্জি, অন্যজন মোহান্ত মন্ডল। বিমল দেশত্যাগের জন্য পা বাড়িয়ে আছে। সে মনে করে তার বুড়ো বাবা দেশত্যাগের পক্ষে একমাত্র বাধা। বুড়ো মরলেই সে দেশ ছেড়ে পশ্চিমবঙ্গে চলে যাবে। বিপরীত সিদ্ধান্ত নিম্নবর্গের চাষী মোহান্ত মন্ডলের। দুবার তার ঘরে ডাকাতি হয়েছে, সে বর্শা বিদ্ধ হয়েছে, আতঙ্কে-আশঙ্কায় তার দিন কাটে, কিন্তু সে দেশ ছাড়বে না। তার কোনও বিকল্প পথ নেই; এখানেই তার মাটি, এখানেই তার ঘর, এখানেই তাকে বাস করতে হবে। দুইজনের বিপরীত সিদ্ধান্তের জন্য কায়েস আহমেদ তাদের শ্রেণীচরিত্রের ভিন্নতাকে দায়ি করেছেন। বিমল মুখার্জি শিক্ষিত, মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষ, নাগরিকতা-মনস্ক, পশ্চিমবঙ্গে তার স্বজনেরা আছে। সে জমির উপস্বত্ব ভোগ করে,

সে নিজে কৃষক নয়। কিন্তু মোহান্ত মন্ডল নিজেই চাষি, জমি ছাড়া তার আর কিছুই নেই। দেশ ছেড়ে যেতে না-চেয়েও কিন্তু শেষ পর্যন্ত মোহান্ত মন্ডলেরা, এইসব নিম্নবর্গীয় নমশূদ্র জেলে-চাষিরাও থাকতে পারে না নিজেদের দেশে। 'অভিশপ্ত অতীত' শীর্ষক একটি লেখায় মনোরঞ্জন ব্যাপারী বলে জনৈক নিম্নবর্গীয় মানুষের কথা পাই। তিনি জানাচ্ছেন, "উচ্চ বর্ণের লোকেরা আমাদের আদর করে চন্ডাল, চাঁড়াল বলে ডাকত আর ছোঁয়াছুঁয়ি হয়ে গেলে চান করত।" ঠিক যেমন ছিল মুসলমানদের প্রতি হিন্দু উচ্চবর্ণীয়দের ব্যবহার। 'যে-মানুষ কুকুরের চেয়েও নিকৃষ্ট বলে আর একজন মানুষের কাছে ঘৃণার পাত্র বিবেচিত হয়, সে তাকে শ্রদ্ধা করবে, ভালোবাসবে, এ হতে বারে না—হওয়া সম্ভব নয়।' উচ্চবর্ণের হিন্দুর দ্বারা দুই পক্ষই, মুসলমান ও নিম্নবর্গীয় হিন্দু সামাজিকভাবে অচ্ছুৎ বিবেচিত হয়েছিল। তাহলে ঘৃণিত এই দুই পক্ষের তো মিলিত একত্র বসবাস, সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্কই তো উচিত ছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত তাও হয়নি।

বিমল মুখার্জিদের মতো মন্ডলেরাও যে নিজেদের মাটি ও দেশ ছেড়ে চলে গেল, তার কারণ নিজের মতো করে ব্যাখ্যা করেছেন কায়েস আহমেদ। 'When a perceived ''alien'' community held the controls of power', তখন শ্রেণী আর জাতপাতের বিভেদ মুছে গেল, সামনে চলে এল সংখ্যালঘুত্বের চেতনা, আর এই চেতনাই মুছে দিল একজন মুখার্জি আর মন্ডলের পার্থক্য। এই যে পার্থক্য মুছে গেল তার জন্যেও প্রধান দায়িত্ব মুসলিম লীগের দ্বিজাতিতত্ত্বের। মুসলমান আর হিন্দু যদি দুই জাতি হয়, তাহলে হিন্দুর ছাতার তলায় জড়ো হতে বাধ্য হয় জাতি-বর্ণ-শ্রেণী নির্বিশেষে সব হিন্দু, মুখার্জি এবং মন্ডল। যেহেতু মুসলিম লীগ মুসলমানত্বকেই বড় করে তুলে ধরেছিল, সেই কারণে যারা অ-মুসলমান তারাও প্রতিক্রিয়ায় সংখ্যালঘু চেতনায় একত্রিত হয়ে যায়। রণবীর সমাদ্দার তাঁর Still They Come : Migrants in the Post-Partition Bengal প্রবন্ধে বলেছেন, চল্লিশের দশকের শেষে হিন্দু মহাসভা নমশূদ্র চাষিদের ভারতে চলে আসতে প্ররোচিত করে। কিন্তু সেই প্ররোচনায় ততো নয়, সামাজিক-রাজনৈতিক পীড়ন ও অর্থনৈতিক বিপন্নতাই এইসব নিম্নবর্গীয় তপশিলভুক্ত মানুষের দেশত্যাগের কারণ। রণবীর সমাদ্দারও স্বীকার করেছেন, এখনও 'the Hindu peasantry 'there' in the villages of Bangladesh is cynically and most systematically robbed of land on communal consideration and are then forced to flee.' রাষ্ট্রীয় মদতে যে এই দেশত্যাগ ঘটছে তার প্রমাণ শত্রুসম্পত্তি আইন, Vested and Non-Resident Property (Repeal) Ordinance এবং ১৯৭৭ সালের ২৩ মে তারিখের সার্কুলার। সালাম আজাদের 'হিন্দু সম্প্রদায় কেন বাংলাদেশ ত্যাগ করেছে?' গ্রন্থে দেখা যায় সাম্প্রদায়িক নির্যাতন যে হিন্দুদের উপর হচ্ছে তাদের বেশির ভাগই নিম্নবর্ণের হিন্দু।

গণপরিষদে তপশিলভুক্ত নিম্নবর্গের নেতা যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল দেশভাগে তাঁর আপত্তির কথা জানিয়েছিলেন। বাংলা ভাগ হলে বর্ণহিন্দু অবস্থাপন্নেরা, চাকরিজীবীরা সহজেই পশ্চিমবঙ্গে চলে যেতে পারবে। ফলে হিন্দুর অনুপাত কমে গেলে, বাধ্যত যে-সব তপশিলভুক্ত জাতির চাষি-জেলে-কারিগরকে পূর্ববঙ্গে থেকে যেতে হবে, তারা 'will be at the mercy of the majority Muslim community'। উত্তরে গণপরিষদের অন্য একজন তপশিলভুক্ত জাতির প্রতিনিধি রাধানাথ দাস বলেন, মুসলিম লীগের শাসনে বা আশ্রয়ে নিম্নবর্গের হিন্দুদের যোগেন্দ্রনাথ নিরাপত্তা দিতে পারবেন না। আর তিনি মনে করেন, বরং নিম্নবর্গের হিন্দুদেরই দেশত্যাগ সহজ হবে, কারণ পূর্ববঙ্গে তাদের নিতান্ত দরিদ্র কুঁড়েঘর ছাড়া আর কোনো সম্পদ নেই। সেই কুঁড়েঘর ছাড়া তাদের আর কিছু হারাতে হবে না। গোড়ার দিকে কিন্তু নিম্নবর্গের হিন্দুরা, কৃষিজীবীরা পূর্ববঙ্গ ত্যাগ করেনি। ১৯৪৯ সাল পর্যন্ত যারা পূর্ববঙ্গ ত্যাগ করেছিল, নীলাঞ্জনা চ্যাটার্জির হিশাব অনুসারে তাদের শতকরা ষাটজনই ছিল অকৃষিজীবী। কিন্তু সম্পন্নেরা, শিক্ষিত মধ্যবিত্ত হিন্দুরা চলে যাওয়ায়, তাদের অর্থনৈতিক পৃষ্ঠপোষকেরা দেশত্যাগ করায়, নমশূদ্র ও অন্যান্য নিম্নবর্গের গরিব হিন্দুর বলভরসা চলে যায়। ইমদাদুল হক মিলনের 'সোনাদাস বাউলের কথকতা' গল্পের সোনাদাস গগনবাবুর বিরাট ধানচালের আড়তে কাজ করত। চোরাই চাল কিনে বড়ো লাভ করে গগন এবং আগামীকাল কলকাতা চলে যাবে বলে সিদ্ধান্ত নেয়। সোনাদাসের পায়ের তলা থেকে মাটি সরে যায়। নিরাশ্রয় সে জানে না কোথায় যাবে। শৈশবের স্মৃতিকথার অভিজিৎ সেন লিখেছেন, উকিলবাড়ি, মাস্টারবাড়ি, ডাক্তারবাড়ি, খালি হয়ে যেতে 'যুগীপাড়ার কয়েক ঘর, ধোপা এবং নাপিতরা, কুমাররাই বা থাকবে কোন ভরসায়' আর 'গ্রাম যতো খালি হতে লাগল, আগাছার জঙ্গল ততোই এগিয়ে এসে বাড়িঘর গ্রাস করতে লাগল।' অভিজিতের ভাই মিহির সেনগুপ্ত ঈষৎ ভিন্ন বিবরণ দিয়েছেন 'বিষাদবৃক্ষ' নামের চমৎকার স্মৃতিকথায়। তিনি লিখেছেন, "ভদ্র গৃহস্থেরা গ্রাম ছাড়লেও পিছারার খালের চৌহদ্দির অপবর্গী, অপবর্গীয়রা তখনও দেশ ছাড়ার কথা ভাবছিল না। ... আমাদের 'ভদ্দরলোকেদের' বাড়িগুলো শূন্য হলেও ওদের অঞ্চলে তার কোনও প্রভাব তখনও দেখা যায়নি।" কিন্তু নারীপীড়নের ঘটনা ঘটতে থাকলে 'তারা এতকালের আশ্রয় বিষয়ে আস্থাহীন হয়ে পড়ে' এবং 'তারা এক অনির্দেশ যাত্রায় ক্রমশ উদ্যোগী হতে থাকে।' বনেদি পরিবারগুলি চলে গিয়েছিল, এবার বাস্তুত্যাগ করতে শুরু করে নিম্নবর্গের মানুষেরাও।

হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়ও জানিয়েছেন, প্রতিষ্ঠিত হিন্দুরা পূর্ববঙ্গ ত্যাগ করার গরিব নিম্নবর্গের হিন্দুরাও নিরাপত্তাহীনতায় ভুগতে থাকে। তারাও মনে করল দেশে 'থেকে গেলে তাদের ঘর পুড়বে, তাদের মেয়েরা ধর্ষিত হবে এবং নিজেরাও খুন হবে।'

হলোও অনেক। যখন ধর্মই হয়ে উঠেছিল জাতীয়তার একমাত্র সূচক, তখন গরিব মুসলমান ও গরিব হিন্দুতে কোনো ঐক্যের মোর্চা গড়ে উঠতে পারেনি। বর্ণহিন্দুরা দেশত্যাগ করায় নিম্নবর্ণের হিন্দুরা যেন আশ্রয়চ্যুত হলো; শ্রেণীগতভাবে যাদের সঙ্গে ঐক্য গড়ে উঠতে পারত, ধর্মবৈষম্যের ফলে, সেই কৃষিজীবী মৎস্যজীবী কারিগর মুসলমানের কাছেও তারা আশ্রয় পেল না। মিহির সেনগুপ্তের স্মৃতিকথায় পড়ি নিম্নবর্ণের হিন্দুদের সঙ্গে গোড়ায় পাকিস্তানপন্থী সংখ্যাগুরুদের সমঝোতা ছিল, যেহেতু দুপক্ষই ছিল উচ্চবর্ণের হিন্দুদের দ্বারা শোষিত ও অপমানিত। পরে ভেদের আগুনে জর্জরিত হলো নিম্নবর্গীয় হিন্দুরাও। উঁচু-নিচু সব "সংখ্যালঘুরা চলে গেলেই তাদের মঙ্গল হয়, তাদের জমিজমা সম্পত্তি বাড়ে, এরকম আকাঙ্ক্ষা তাদের (অর্থাৎ সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের) আচরণে প্রকাশ পেতে থাকে।" মিহির তীব্র ভাষায় লিখেছেন, "এইসব লোচ্চা লম্পট এবং লুম্পেনদের সে সময় রাষ্ট্রই ছেড়ে দিয়েছিল সংখ্যালঘুদের অবশিষ্টতম মানুষদের উচ্ছেদকল্পে।"

অথচ উচ্চবর্ণের হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষের কাছে নিম্নবর্ণের হিন্দুরা যেভাবে লাঞ্ছনা ও অবজ্ঞা ভোগ করত, ঠিক অনুরূপ অবজ্ঞা ও লাঞ্ছনা ভোগ করত মুসলমান সমাজের আতরফ্ বা আজল্‌ফেরা ঐ সমাজের আসরফ্‌দের কাছে। আবদুল কাইয়ুম আনসারির নেতৃত্বাধীন বিহারের মোমিন কনফারেন্স ত্রিশের দশক থেকে মুসলিম লীগের বিরোধিতা করে আসছিল, কারণ লীগ শরিফদের প্রতিনিধি, নিম্নবর্গের মুসলমানদের প্রতিনিধি নয়। অভিজাত মুসলমানদের হাতে মোমিন বিরাদরি শতাব্দীর পর শতাব্দী লাঞ্ছিত হয়েছে। ১৯৩৮ সালে পাটনার উপনির্বাচনে আনসারি প্রার্থী হলে মুসলিম লীগের এস এম ইসমাইল নবাবের শহরের প্রতিনিধি হতে চায় কিনা এক জুলাহা, এই ভেবে প্রকাশ্যে আতঙ্ক প্রকাশ করেছিলেন। *Understanding Bengal Muslims* প্রবন্ধসংকলনের ভূমিকায় সম্পাদক রফিউদ্দিন আহমেদও বাংলার মুসলমান সমাজ যে 'fragmented from within by caste-like features' তার কথা বলেছেন। বলেছেন, নিম্নবর্গীয় ও উচ্চবর্গীয় মুসলমানদের মধ্যে ভেদ এতোটাই ছিল যে 'the notion of a 'community' could hardly exist'। হিন্দুসমাজে নিম্নবর্গীয়দের অবস্থা জঘন্য, কিন্তু নিজের দেখা থেকে মিহির সেনগুপ্ত বুঝেছিলেন মুসলমান সমাজেও উচ্চবর্গে-নিম্নবর্গে সমানাধিকার নেই। "মিলাদুন্নবীর জমায়েৎ, জুম্মার আদায়, ঈদের দিনের কোলাকুলি এইসব ব্যাপারেই যা সমতা। নচেৎ শত ঢক্কানিনাদেও কি সারা মুসলিম জাহানে আলবেরাদরির কোনও নজির দেখা যায়?"

কেউ-কেউ এতোদুর পর্যন্ত বলেছেন যে হিন্দুদের মধ্যে ব্রাহ্মণ-শূদ্রে যেমন তফাত ততোটাই তফাত মুসলমান সমাজের আসরফ্-আজল্‌ফে। মুসলমান সমাজের মধ্যে যারা নিজেদের মনে করত বিদেশাগত মুসলমানদের উত্তরপুরুষ, তারা স্থানীয় ধর্মান্তরিত, বিশেষত নিম্নবর্গ থেকে ধর্মান্তরিত মুসলমানদের খুবই নিচু নজরে দেখত। নিচু নজরে দেখত বা দ্যাখে ধুনুরি, কলু, নাপিত, দর্জি, জেলে, তাঁতি এইসব করিগর শ্রেণীর আর জেলে চাষি এইসব শ্রেণীর মুসলমানকে। এই নিম্নবর্গীয় মুসলমানেরা হতে পারে না মসজিদের ইমাম কিংবা কাজি। কোনও-কোনও অঞ্চলে আসরফ্‌দের কবরখানায় কবর দিতে পরে না নিম্নশ্রেণীর মুসলমানেরা তাদের মৃত পরিজনের। আসরফ্-বংশীয়ের সঙ্গে এইসব নিম্নবর্গীয় মুসলমানের বৈবাহিক সম্বন্ধও বিরল ক্ষেত্রে হতে পারে। মুসলমান সমাজের উপরতলার লোকেরা এইসব নিম্নবর্গীয় মানুষকে অবজ্ঞা করত যদিও, তবু তাদের নিজেদের রাজনৈতিক স্বার্থে চমৎকারভাবে ব্যবহার করেছিল। ধর্মই ছিল তাদের স্বার্থসিদ্ধির উপায়। ফলে, ধর্মবৈষম্যের কারণে হিন্দু চাষি জেলে কারিগরের সঙ্গে মুসলমান চাষি জেলে কারিগরের ঐক্য গড়ে উঠতে পারল না।

দুই সম্প্রদায়ের নিম্নবর্গীয় মানুষদের মধ্যে যাতে ঐক্য গড়ে উঠতে না পারে, তার উদ্যোগ অবশ্য শুরু হয়েছিল বঙ্গবিভাজনের অনেক আগে থেকেই। বিশেষ করে চল্লিশের দশকের গোড়া থেকে হিন্দুসম্প্রদায়ের নেতৃত্ব বুঝেছিল, বাংলার মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠাতার সঙ্গে টক্কর দিতে হলে, নিজেদের সংখ্যা যতোদূর সম্ভব বাড়াতে হবে। সুতরাং হিন্দু সম্প্রদায়ের ছাতার তলায় জড়ো করতে হবে নিম্নবর্গীয় নিম্নবর্ণের হিন্দুদের, সেইসব তপশিলী সম্প্রদায়ের মানুষের, যাদের উচ্চবর্ণের হিন্দুরা মন্দিরে ঢুকতে দিত না, যাদের জল-অচল মনে করত, যাদের হিন্দু বলেই মনে করত না। অস্তিত্বের দায়ে, হিন্দু সমাজকে সংহত ঐক্যবদ্ধ করার প্রয়োজনে, নিম্নবর্গীয় তথাকথিত হিন্দুদের এখন উচ্চবর্ণের হিন্দুদের সঙ্গে একমঞ্চে জায়গা দেওয়া হলো। ফলে চল্লিশের দশক থেকে বহুক্ষেত্রেই হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা পর্যবসিত হয়েছিল নিম্নবর্ণের হিন্দুর সঙ্গে নিম্নবর্গীয় মুসলমানের দাঙ্গায়। জয়া চ্যাটার্জি তাঁর *Bengal Divided* গ্রন্থে লিখেছেন, ''In the early forties, when the movement to draw the low castes into Hindu politics was at its height, there were many incidents of violence involving low caste groups and Muslims.'' গোয়ালাদের সঙ্গে মুসলমানদের, সাঁওতালদের সঙ্গে মুসলমানদের, নমশূদ্রদের সঙ্গে মুসলমানদের সংঘর্ষের অনেক নিদর্শন জয়া চ্যাটার্জি তাঁর বক্তব্যের সমর্থনে উল্লেখ করেছেন। ফলে যে-ঐক্য নিম্নবর্গীয় তপশিলি হিন্দু এবং আতরফ্/আজল্‌ফ্ মুসলমানের মধ্যে হতে পারত, সেই সম্ভাবনা দেশভাগের আগে থেকেই নষ্ট হয়ে যেতে আরম্ভ করেছিল।

যোগেন্দ্রনাথ মন্ডল এই ঐক্যের উপর ভরসা করেছিলেন এবং মুসলিম লীগের সঙ্গে তপশিলভুক্ত নিম্নবর্গীয় হিন্দুর ঐক্য প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী ছিলেন তিনি। অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের মুসলিম লীগ মনোনীত মন্ত্রী ছিলেন তিনি, পরে মন্ত্রী হন পাকিস্থান সরকারেরও। তিনি ১৯৫০ সালের ২৫ মে তারিখে *The Hindu* পত্রিকার সাংবাদিককে এক গোপন সাক্ষাৎকারে জানান, গুন্ডা প্রকৃতির লোকদের নিয়ে মুসলিম লীগ আনসার বাহিনী সংগঠিত করেছে এবং এই বাহিনী 'perpetrated all sorts of crimes upon Hindus'। মুসলিম লীগের চোখে যেহেতু নেই, সেই কারণে যোগেন্দ্রনাথের চোখেও এখন আর বর্ণহিন্দু এবং তপশিলজাতিভুক্ত হিন্দুর কোনও পার্থক্য থাকল না। উৎপীড়নের মুখে শ্রেণীগত, জাতপাতগত পার্থক্য ঘুচে গেছে। পাকিস্তানের এই মন্ত্রী এই পরিস্থিতিতে নিরাশ হয়ে ভারতে অঘোষিত আশ্রয় নিলেন এবং ভারত থেকেই ১৯৫০ সালের অক্টোবরে পাকিস্তানের প্রধান মন্ত্রী লিয়াকত আলি খানের কাছে পদত্যাগপত্র পাঠিয়ে দিলেন। এই পত্রে তিনি জানান, শেষ পর্যন্ত তিনি উপলব্ধি করেছেন, পূর্ব পাকিস্তান সরকার সুপরিকল্পিত নীতি অনুসারে 'squeezing Hindus out of the Province' করে চলেছে। পাকিস্তানে হিন্দুরা কার্যত 'stateless'-এ পর্যবসিত হয়েছে। শেষ পর্যন্ত তাঁর সিদ্ধান্ত বর্ণহিন্দুই হোক বা তপশিল জাতিভুক্ত হিন্দুই হোক, 'Pakistan is no place for Hindus to live in', হয় তারা ধর্মান্তরিত হবে, অথবা তাদের 'liquidation' হবে।

ফলে ভারতে চলে এল লক্ষ-লক্ষ তপশিলজাতিভুক্ত হিন্দু পূর্ববঙ্গ/পূর্বপাকিস্তান থেকে, মোহান্ত মণ্ডল থেকে যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল। এদেশে এসে বাড়ি কেনে বা বিনিময়ে বাসস্থানের ব্যবস্থা করে বা বাড়ি ভাড়া নেয় এমন সংস্থান ছিল না তাদের। বেশির ভাগের এমন কোনো আত্মীয়পরিজন ছিল না ভারতে, যাদের কাছে আশ্রয় নিতে পারে। যাদবপুর ও দক্ষিণ কলকাতার অন্য এলাকায় বা দমদমে যারা কলোনি প্রতিষ্ঠা করেছিল সরকারি জমিতে বা জবরদখল জমিতে তারাও বেশির ভাগ ছিল শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বর্ণহিন্দু, কোনও-না-কোনও পেশা ছিল তাদের বৃত্তি। নিম্নবর্ণের হিন্দুরা প্রধানত আশ্রয় নেয় শেয়ালদা স্টেশনের প্লাটফর্মে বা ধুবুলিয়ার মতো কোনও ক্যাম্পে। তাদেরই পাঠানো হয় নৈনিতালে বা আন্দামানে বা দণ্ডকারণ্যে। দণ্ডকারণ্য থেকে ফিরে এলে তাদেরই মরিচঝাঁপি থেকে বলপ্রয়োগে উৎখাত করা হয় বামজমানায়, যেহেতু তুমি আর নেই সে তুমি। এই অন্ত্যজ জনগোষ্ঠীর, অসম্ভব পরিশ্রমী কৃষিজীবী নমশূদ্র সম্প্রদায়ের, নিম্নবর্গীয় তপশিলভুক্ত বাঙালি হিন্দু ছিন্নমূল উদ্বাস্তুর পায়ের ছাপ বাংলা সাহিত্যে কোথাও পড়ল না।

কীভাবে তারা স্বভূমির মূল থেকে উৎপাটিত উৎখাত হলো, কী বাধা-বিপত্তির মধ্যে দিয়ে সীমান্ত পার হয় তারা, এখানে এসে দালাল, পুলিশ, নানান শ্রেণীর

ধানধাবাজদের দ্বারা কীভাবে নাকাল হলো, কীভাবে উপার্জনহীনভাবে খয়রাতি নিয়ে ক্যাম্পে দিনাতিপাত করে স্বভাববিরুদ্ধভাবে অলস হয়ে গেল, কীভাবে ছন্নছাড়া হয়ে স্টেশনের প্লাটফর্মে, অন্য রাজ্যের অনুগ্রহের উৎপীড়নে দিন যাপন করতে বাধ্য হলো, তার কোনও ইতিহাস বাংলা সাহিত্যে লেখা থাকল না। বাংলা সাহিত্য গঙ্গোপাধ্যায়, বন্দ্যোপাধ্যায়, ঘোষ, বসু, মিত্র, সেন, চক্রবর্তীদের লেখা। এইসব পদাধিধারী যারা উদ্বাস্তু হয়ে সীমান্ত পার হয়ে এসেছিল তাদের প্রায় কেউ স্টেশনের প্লাটফর্মে থাকেনি, ক্যাম্পে কালাতিপাত করেনি বা দণ্ডকারণ্যে আন্দামানে গড্ডলপ্রবাহের মতো তাড়িত হয়ে প্রেরিত হয়নি। ফলে এইসব 'অপর' মানুষের দেশভাগের চূড়ান্ত মর্মান্তিক অভিজ্ঞতা ও আর্তনাদ বাংলা সাহিত্যে অনুপস্থিত। আর এক অখণ্ড নীরবতার মুখোমুখি হই আমরা। আমরা বাংলা সাহিত্যে নিম্নবর্গীয় মানুষেদের যে পাইনি তা নয়, বর্ণহিন্দু লেখকদের লেখনীতেই আমরা পেয়েছি কুবের, নিতাই-বানোয়ারি-করালী, ঢোঁড়াইকে, পেয়েছি সুরতুন, বৈজুচন্ডাল, ফরেস্টারচন্দ্র বাঘারু বর্মণকে। কিন্তু ভাঙা-দেশের ছিন্নমূল ছত্রখান নিম্নবর্গের মানুষ সম্বন্ধে বাংলা সাহিত্য বোবা হয়ে থাকল।

নারী এবং নীরবতা

সমাজের নিচের থাকের মানুষেরা 'অপর'। সমাজের যে-কোন থাকের মেয়েরাও 'অপর'। Can the Subaltern Speak ? প্রবন্ধে গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাক লিখেছেন, 'If, in the context of colonial production, the subaltern has no history and cannot speak, the subaltern as female is even more deeply in the shadow ...' এমনিতেই মেয়েদের অনেক কথা গোপন রাখতে হয়। বাপের বাড়ির মতো শ্বশুরবাড়িতে সবকথা খোলাখুলি বলা যায় না। বিবাহপূর্ব জীবনের সবকথা বিবাহোত্তর জীবনে বলা চলে না। ছেলে-মেয়েদের বিষয়ে কিছু কথা স্বামীদের কাছে গোপন রাখতে হয়। বীণা দাস 'হিংসা, দেশান্তর ও ব্যক্তিগত কণ্ঠস্বর' প্রবন্ধে যথার্থই বলেছেন, মেয়েদের দুটো জগৎ—যেখানে কথা বলা যায়, যেখানে বলা যায় না। ভালো বিয়ে হলে মেয়েদের খুব সতর্ক থাকতে হয়, অসাবধানী কথায় সব কাচের বাসনের মতো ভেঙে যেতে পারে। দেশভাগ-দেশত্যাগের ঘূর্ণাবর্তে-পড়া মেয়েদের অনেক কথা বলা হয়নি ইতিহাসে বা সাহিত্যে, মেয়েরাও তাদের অনেক কথা বলতে পারেনি।

উর্বশী বুটালিয়ার হিসাব মতো দেশভাগের সময়ে দাঙ্গায়, হিংসায় মাত্র উত্তর-পশ্চিম-ভারতেই প্রায় পঁচাত্তর হাজার মেয়ে অপহৃতা ও ধর্ষিতা হয়েছিল ভিন্ন ধর্মের পুরুষদের দ্বারা, ঘটেছিল 'widespread sexual savagery'।

হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সাম্প্রদায়িক বিরোধ কেন নারীধর্ষণ হয়ে ওঠে বিরুদ্ধ-সম্প্রদায়কে আক্রমণের একটি প্রধান পদ্ধতি সেটা বুঝতে গেলে নোবেলজয়ী দক্ষিণ আফ্রিকার ঔপন্যাসিক জে এম কোয়েট্জির *Disgrace* উপন্যাস আমাদের কাজে লাগতে পারে। শাদাচামড়ার এক সাহিত্য-অধ্যাপক, যিনি আবার ওয়ার্ডসোয়ার্থ ভক্তও, ডেভিড লরির মেয়ে লুসি এক নির্জন খামারে কালো চামড়ার দুই যুবক এবং এক কিশোরের দ্বারা উপর্যুপরি ধর্ষিত হয়। বাবার সঙ্গে পরে আলোচনার সময় লুসি বলে, 'It came down from the ancestors', যতো না ধর্ষণে, তার চেয়ে বেশি ধর্ষণকারীদের ধর্ষণকালীন ঘৃণার তীব্রতায় লুসি স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল। কালোদের পূর্বপুরুষেরা পীড়িত অপমানিত হয়েছিল বলে আজ ধর্ষণকালীন ঘৃণার মধ্য দিয়ে তারা শাদাদের উপর প্রতিশোধ নেয়। প্রতিশোধের সবচেয়ে চূড়ান্ত উপায় যেন ধর্ষণ। অনেক ঋণ জমে আছে, এবার উত্তরপুরুষের উপর দেনা শোধবার ভার। 'Why should I be allowed to live here without paying?' দক্ষিণ আফ্রিকায় অতীতে আধিপত্যকারী শাদাদের থাকতে হলে তাদের মূল্য দিতে হবে। ধর্ষিতা হয়ে লুসি সেই মূল্য দিচ্ছে, পূর্বপুরুষদের অত্যাচারের ঋণ শোধ করছে। অনেক ঘৃণা, অনেক অবজ্ঞা, অনেক অপমান জাতীয় স্মৃতির গভীরে পুঞ্জীভূত হয়ে থাকে—দাঙ্গার সুযোগে, আইন-শৃঙ্খলা যখন ভেঙে পড়ে, যখন একটা রাজনৈতিক ঘূর্ণাবর্তে সবকিছু এলোমেলো তছনছ হয়ে যায়, তখন অপমানিত সম্প্রদায় প্রতিশোধ নেয়। প্রতিশোধ নেবার প্রধান উপায় মনে করা হয় নারীধর্ষণ, যার মধ্যে দিয়ে এতদিনের আধিপত্যকারী সম্প্রদায়ের মর্যাদাবোধের উপর করা হয় চূড়ান্ত আঘাত।

মেয়েরা ধর্ষিতা হতে পারে, অন্য ধর্মাবলম্বী পুরুষের বীজ তাদের গর্ভে বপন হতে পারে। তাতে তারা ব্যক্তিগতভাবে শুধু অপমানিত হবে না, অপমানিত হবে তাদের ধর্ম, তাদের সম্প্রদায়। সুতরাং সম্প্রদায়ের পবিত্রতার কারণে, মেয়েরা যাতে অশুদ্ধ হতে না পারে, তার ব্যবস্থা করতে হবে। সেই অপবিত্রতার দুর্ভাগ্য যাতে ঘটতে না পারে, পিতৃতান্ত্রিক সম্মানবোধের চাপে মেয়েরা আত্মহত্যা করেছিল, অথবা তাদের হত্যা করা হয়েছিল। মেয়েদের মর্যাদা, তাদের যৌন-শুচিতা আর সম্প্রদায়ের সম্মান সমার্থক, এই পিতৃতান্ত্রিক সমীকরণে চাপে ঘটেছিল এইসব হনন-আত্মহননের ঘটনা। যশোধরা বাগচী ও শুভরঞ্জন দাশগুপ্ত সম্পাদিত *The Trauma and the Triumph* সংকলনের ভূমিকায় সঙ্গতভাবেই বলা হয়েছে, 'Women ... are seen as icons of the honour of the community. The easiest way to assail a comunity, therefore, is to defile the sexual purity of its women.' পাঞ্জাবে শত-শত মেয়ে কুয়োয় ঝাঁপ দিয়েছিল বা দিতে বাধ্য হয়েছিল, যাতে তারা ধর্ষিতা, অপহৃতা বা ধর্মান্তরিতা না হয়। বুটালিয়া জনৈক বীরবাহাদুর সিং-এর কথা জানিয়েছেন। এই সিংজী স্বচক্ষে দেখেছিল তার বাবা তার বোনকে হত্যা করল। সিংজীর কণ্ঠস্বরে

বোনের সাহস আর শহিদত্ব নিয়ে গর্ববোধ ছিল। একজন মঙ্গল সিং তার দুই ভাইয়ের সঙ্গে মিলে পরিবারের সতেরো জন নারীশিশুকে হত্যা করে। ভীষম্ সাহনির 'তমস' উপন্যাসে আমরা কুয়োয় ঝাঁপ দিয়ে সম্মান বাঁচানো মেয়েদের কথা পড়েছি। বাস্তবিকই ঘটেছিল এমন ঘটনা। মা লাজবন্তীর নিদর্শনে, রাজপুত নারীদের আত্মোৎসর্গের উদারহণ সামনে রেখে ১৯৪৭ সালের মার্চে রাওলপিন্ডি জেলার থোয়াখালসায় নব্বুই জন নারী কুয়োয় ঝাঁপ দেয়। তিন জন মাত্র বেঁচে যায় কুয়োয় অতো জল ছিল না বলে। অসম্মান থেকে বাঁচানোর জন্য গুরুদ্বারের অভ্যন্তরে আশ্রয় নেওয়া মেয়েদের গায়ে কেরোসিন ঢেলে তাদের জ্বালিয়ে দিয়ে হত্যা করা হয়। ভীষম্ সাহনি বলেন গুরুদ্বারে সমবেত "Everyone in the congregation, man or women, intensely felt that he or she was a link in the long chain of Sikh history, an integral part of it and, at the moment of crisis, like the ancestors, was ready to lay down his or her life." লর্ড ওয়াভেলের *Viceroy's Journal*-এ পড়ি বলদেব সিং-ও তাঁকে ১৯৪৭-এর মার্চে মোগল ও শিখদের মধ্যে 'old fuds'-এর উল্লেখ করেন সাম্প্রতিক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার কথা বলতে গিয়ে। মেনন ও ভাসিন এক জীবনপ্রেমী তরুণীর কথা বলেন যে মৃত্যুর আগে বিয়ের জন্য তৈরি নতুন পোশাক পরে নিয়েছিল। চরণজিৎ ভাটিয়া তার কাকার কথা জানায়, যে নিজের ছয় কন্যাসহ তের জনকে হত্যা করেছিল, যাতে তাদের ধর্মান্তরিত হতে না হয়। ড. বিরশা সিং নিজের স্ত্রীসহ পঞ্চাশ জনকে গুলি করে মারে। হাসপাতালের কম্পাউন্ডারের দেওয়া বিষ খেয়ে তিন বোন আত্মহত্যা করে, আঠারো বছরের নতুন বউকে স্বামী দুপাট্টা দিয়ে শ্বাসরোধ করে মারে। আফিং খেয়ে ব্রিজের উপর থেকে ঝাঁপ দিয়ে জলে পড়ে মারা যায় কেউ। জোর করে নিকা আর ধর্মান্তরের প্রতীকী মৃত্যুর চেয়ে সত্যিকারের মৃত্যু অভিপ্রেত মনে হয়েছিল তাদের। 'তমস' উপন্যাসে হরনাম সিং স্ত্রী বানটোকে বলেছিল তাকে গুলি করে মেরে সে নিজে মরবে। পুরুষের চাপে মেয়েরা কীই-বা করতে পারতো। এক রমণী বিষ খায়নি, তের বছরের মেয়েকেও খেতে দেয়নি। যুক্তি দিয়েছিল, পুরুষদের রান্না করে দেবার জন্য কাউকে তো বেঁচে থাকতে হবে। কিন্তু নিজের ভীরুতায় তাকে মর্মে-মর্মে লজ্জিত হয়ে থাকতে হয়। সম্মান আর লজ্জার বোধ এমন বদ্ধমূল, যে-মৃত্যু চাপিয়ে দেওয়া, তাকেও মনে হয়, এমন মেয়েদের কাছেও, স্বেচ্ছায় আত্মবলিদান। থোয়াখালসার বিখ্যাত ঘটনার মতো এইসব আত্মবলিদানের ঘটনা, জ্ঞানেন্দ্র পান্ডের ভাষায়, 'sanctification' পেয়ে যায়। কখনো, কখনো এইসব কাহিনীকে একটু গৌরবান্বিত করা হয়েছে, এইসব গৌরবময় কাহিনীকে তুলে ধরা হয়েছে জাতি-মহিমার প্রমাণ হিশাবে। এইসব গৌরবান্বিত কাহিনীতে বলা হয়েছে সবাই আত্মত্যাগ করেছিল, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে অনেক মেয়ে পালিয়েও বেঁচেছিল। বলা হয়েছে, কেউ অন্য ধর্ম শিরোধার্য

করে প্রাণ বাঁচায়নি, বাস্তবক্ষেত্রে কেউ-কেউ ধর্মান্তরিত হয়ে প্রাণে বেঁচেছিল। নারীর সম্মান যেমন রক্ষা করা হয়েছে, তেমনি কোনও-কোনও ক্ষেত্রে পরিবারের নারীকে বিপক্ষের হাতে তুলে দেওয়ার বিনিময়ে পরিবারের অন্যদের সুরক্ষা কেনা হয়েছে। এইসব সত্য ঘটনায় হিন্দুত্বের বা শিখধর্মের মহিমা বাড়ে না বলে, এইসব কাহিনী বিষয়ে মৌন পালন করা হয়। তবু একথা সত্য যে, পিতৃতান্ত্রিক মগজ-ধোলাইয়ের চাপে বহু মেয়ে সিদ্ধান্ত নেয়, বরং মরে যাব, কিন্তু মুসলমান হবো না। পূর্ব ভারতে পশ্চিম ভারতের দেশভাগ-জনিত ঘটনার মধ্যে পার্থক্যের দিকে আমাদের দৃষ্টি আর্কষণ করেছেন বাগচী ও দাশগুপ্ত তাঁদের সম্পাদিত সংকলনের ভূমিকায়। দুই অংশেই ঘটেছিল বাধ্যতামূলক দেশত্যাগ, কিন্তু পশ্চিমে সেটি একবার-মাত্র ঘটে যাওয়া ঘটনা— হিংস্রতায় অবিশ্বাস্য ভয়ংকর। আর পূর্বাঞ্চলে পঞ্চাশ বছরের বেশি সময় ধরে চলেছে আজও পর্যন্ত ঘটে যাওয়া দেশত্যাগের ঘটনা, অনর্গল রক্তমোক্ষণ। পশ্চিমে ধর্মের ভিত্তিতে লোক বিনিময় ঘটে গেছে, এমন লোকবিনিময় পূর্বাংশে হয়নি। পশ্চিমে সীমান্তরেখা নির্দিষ্ট কঠিন, কিন্তু পূর্ব সীমান্ত ছায়ারেখা 'porous and flexible'। কিন্তু এইসব পার্থক্য সত্ত্বেও দুই অঞ্চলেই কিন্তু আক্রমণের প্রধান লক্ষ্য মেয়েরা। যদিও যে বিপুল হারে ধর্ষণ, অপহরণ, ধর্মান্তর পাঞ্জাবে ঘটেছিল, বাংলায় সেই পরিমাণে হয়নি। বাংলায় ধর্ষণ, অপহরণ, ধর্মান্তর সেই পরিমাণে হয়নি বটে, কিন্তু ধর্ষণের আতঙ্ক, অপহরণ-ধর্মান্তরের ভয় সব সময় ছিল এবং সেই ভয়ই দেশ ছাড়তে মানুষকে প্ররোচিত করেছে। প্রফুল্ল রায়ের 'কেয়াপাতার নৌকো' উপন্যাসে ধর্ষিতা ঝিনুক দিনরাত শূন্য চোখে দূর ধানখেতের দিকে তাকিয়ে থাকে। মিছিলের বর্বর চিৎকার শুনলে, মশালের আলো দেখলে ভয়ে অস্থির হয়ে পড়ে সে। সে বলে, তাকে কোথাও পাঠিয়ে দেওয়া হোক, মেরে ফেলা হোক। দেশভাগ দেশত্যাগ কালে ধর্ষিতা নারীদের সম্বন্ধে একটি ভয়ংকর গল্প আছে সাদাত হাসান মান্টোর। ডাক্তার ঘরের জানলা 'খুলে দাও' নির্দেশ দিলে পুনঃপুনঃ ধর্ষিতা কিশোরী অর্ধচেতন অবস্থায় 'খুলে দাও' শুনে তার পাজামা খুলে দেয় এবং উরুদুটি ফাঁক করে দেয়। মেয়ের এই নড়া-চড়ায় মেয়ে বেঁচে আছে ভেবে বাবা সুখী হয়, কিন্তু ডাক্তারের শরীর ভিজে যায় ঠান্ডা ঘামে। 'তমস' উপন্যাসে শাহ্ নওয়াজ দেখে, একটি ছোট মেয়ে জামা তুলে শায়িত, তার নগ্ন উরুর উপর বসে আছে জামা-তোলা একটি ছোট ছেলে। অন্য বালক-বালিকারা দুজনকে ঘিরে হাসাহাসি করছে। ওদের চোখের সামনে ধর্ষণের অনেক ঘটনা ঘটেছে বলেই এমন খেলা খেলবার কথা ছোটদের মাথায় আসতে পারে। 'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে' উপন্যাসের ধর্ষিতা মালতী বারে বারে আত্মহত্যার চেষ্টা করে। এইসব মেয়েদের মতো পরিস্থিতি যাতে না হতে পারে তাই 'বকুলতলা পি. এল. ক্যাম্প'-এর কুমু দিদিকে চিঠি লিখে জানিয়েছিল, 'আবদুল গনির অঙ্কশায়িনী হওয়ার চেয়ে ধলেশ্বরীকেই বরণ করে নিলাম।' হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে যিনি ভেদ

করতে জানতেন না সেই প্রিয়বালা গুপ্ত-ও স্থির করেছিলেন, তেমনি পরিস্থিতি হলে নিজের বয়স্থা মেয়েদুটিকে মেরে নিজে মরবেন। পিতৃতান্ত্রিকতার বদ্ধমূল চাপে আত্মোৎসর্গের এইসব মুহূর্তে কী ভেবেছিল এইসব মেয়েরা সেইকথা আমরা কোথাও পড়িনি। তারা কি সত্যিই মরতে চেয়েছিল? ধর্মান্তরের চেয়ে, অপহরণের চেয়ে, এমনকি ধর্ষণের চেয়ে কি তারা জীবনকে বড় মনে করেনি, মৃত্যুকে কি তারা সত্যই অভিপ্রেত মনে করেছিল? কোনও জবাব নেই।

বহু-বহু মেয়ে অন্য ধর্মাবলম্বী পুরুষের সঙ্গে যৌন-সম্পর্কে লিপ্ত হতে বাধ্য হয়েছে বলাৎকারের ফলে। অনেক সময়, ফলে, তাদের গর্ভে সন্তান এসে গেছে। যখন তারা বুঝতে পেরেছে তারা ধর্ষণের পরিণামে সন্তান-সম্ভবা হয়েছে, তখন কেমন হয়েছিল তাদের মনের অবস্থা? এই ধরণের গর্ভধারণে তারা কি দ্বিগুণ কলুষিত বোধ করেছিল? গর্ভের অন্ধকারে সেই অনভিপ্রেত সন্তানের বেড়ে ওঠাকে সেই মেয়েরা কী দৃষ্টিতে দেখেছিল? উদ্ধার করা সেই মেয়েদের যখন গর্ভমোচনে বাধ্য করা হয়েছিল পারিবারিক সাম্প্রদায়িক শুচিতার দায়ে, তখন কেমন ছিল সেইসব মেয়েদের অনুভূতি? অথবা অপহৃত অবস্থায় যখন তারা ধর্ষণজাত সন্তানের জন্ম দিয়েছিল, তখন কেমন হয়েছিল তাদের অনুভূতি? ভাঙা দেশের ইতিহাসে, দেশভাগের সাহিত্যে এইসব প্রশ্নের কোনও জবাব নেই। মেয়েরা নিত্যন্ত ধর্ষিতাই হয়নি, তাদের শরীরকে সত্তাকে হিংস্রভাবে আক্রমণ করা হয়েছে নানাভাবে। মন্দিরে, মসজিদে, গুরুদ্বারে তাদের দলবদ্ধভাবে লাঞ্ছিত করা হয়েছে, পরিবারের লোকজনের সামনে ধর্ষণ করা হয়েছে, রাস্তায়-বাজারে মানুষের ইতর হল্লোড়ের সামনে নগ্ন করে ঘোরানো হয়েছে, তাদের স্তন কেটে দেওয়া হয়েছে কোনও কোনও নারীর শরীরের গোপনে 'শত্রু'-ধর্মের প্রতীক উল্‌কির দ্বারা এঁকে দেওয়া হয়েছে, সে যাতে সেই চিহ্ন সারা জীবন বয়ে নিতে বাধ্য হয়, যাতে সেই নারীর ধর্মসম্প্রদায়ের যৎপরোনাস্তি অপমান চলতেই থাকে। এইসব লাঞ্ছনার মুহূর্তে কী ভেবেছিল এইসব মেয়েরা, এইসব লাঞ্ছনার চিহ্ন নিয়ে ক্ষতার্ত দেহে-মনে কেমন করে উত্তরকালে বেঁচেবর্তে ছিল নারীরা? মেনন ও ভাসিনের বইতে একজন দুর্গাবাঈ জানাচ্ছেন, উদ্ধার-হওয়া ধর্ষিতা মেয়েদের বুক-মুখ-ক্ষতবিক্ষত, সারা শরীরে পাশব দংশনের ক্ষত। পরিবারের বড়রা এইসব নির্যাতিত মেয়েদের ফিরে পেয়ে বলত, কী করে ঘরে রাখব এদের, মরে গেলেই ভাল ছিল। নিজের পরিবারের লোকেরা যখন এইসব কথা বলত তখন লাঞ্ছিত মেয়েদের মনে কে জানে কী অনুভূতি জাগত!

পরে আবার ঘটেছিল অপহৃতাদের উদ্ধারের নামে অন্য এক নির্যাতন। ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে চুক্তি হয় অপহৃতাদের অন্য রাষ্ট্র থেকে উদ্ধার করে নিজ রাষ্ট্রে ফিরিয়ে আনবার। অপহৃতা মুসলমান হলে তাকে পাকিস্তানে, হিন্দু বা শিখ হলে তাকে

ভারতে ফেরত পাঠানো হবে। চুক্তির ভিত্তিতে প্রণীত হয় The Abducted Persons Recovery and Restoration Ordinance, পরে যেটি ১৯৪৯ সালে আইনে পরিণত হয়। মেয়েদের এই উদ্ধার পরিস্থিতির নিপুণ ও বিস্তারিত আলোচনা করেছেন উর্বশী বুটালিয়া। এই আইনে মেয়েদের ইচ্ছা-অনিচ্ছাকে বিবেচনা করবার কোনও সংস্থান রাখা হয়নি। অবশ্য অপহরণের পরিস্থিতিতে, অপহরণকারীর সম্প্রদায়ের মানুষের দ্বারা বেষ্টিত হয়ে, অপহৃতাদের পক্ষে নিজের ইচ্ছা স্বাধীনভাবে জানানোর সুযোগও ছিল না। মেয়েরা অনেকেই উদ্ধার হতে এবং নিজেদের পুরনো পরিবারে ফিরে যেতে রাজি ছিল না। 'তমস' উপন্যাসে প্রকাশো আল্লারাখা কর্তৃক অপহৃত হয়েছিল। মা বলে, যেখানেই থাকে যেন ভাল থাকে। ফিরে আসার কী দরকার। নিষিদ্ধ মাংস 'ওরা' নিশ্চয়ই খেতে বাধ্য করেছে। প্রকাশোর সঙ্গে আল্লারাখার সম্পর্ক গড়ে ওঠে, তার আলিঙ্গনে সে সাড়া দেয়। মনে হয় অতীত যেন মুছে যাচ্ছে, আর বর্তমান তাকে দুহাতে জড়িয়ে ধরছে। এইভাবে অনেক অপহরণকারীর সঙ্গে ইতিমধ্যে সম্পর্ক গড়ে উঠেছে, সন্তানও জন্মেছে। এমন কথা বলা হয়েছে, এবং একথা অনেকাংশে সত্যও বটে, অধিকাংশ ভারতীয় নারীর পক্ষে আজও বিয়ের অর্থ সামাজিকভাবে অনুমোদিত অজানা পুরুষ কর্তৃক অপরহণ ও বলাৎকার। সেইসব ক্ষেত্রে যদি মেয়েরা মানিয়ে নিতে পারে, সংসারজীবন যাপন করতে পারে, তাহলে পুরুষটি নিতান্ত ভিন্ন ধর্মাবলম্বী বলে অপহৃতাদের মানিয়ে নেওয়াটা মেনে নেওয়া হবে না কেন? একটা বড় পার্থক্য অবশ্য আছে। যে-পুরুষ তাকে নৈরাজ্যের সুযোগে অপহরণ করছে সে চিরকাল নিরাপত্তা দেবে, তাতে আস্থা কোথায়? সামাজিকভাবে বিবাহিত স্বামী সমাজের চাপে সহসা বউকে ত্যাগ করতে পারে না। সেটাই নিরাপত্তা। অপহৃতা রমণী অপহরণকারীর ঘরে সেই নিরাপত্তা পায় না। অপহরণকারীর সঙ্গে সহবাসে, এমনকি বিয়েতে তারা কি সুখী ছিল? নীরবতার স্তর ভেদ করে এই প্রশ্নের জবাব মেলে না। অসহায় বলে, বিকল্প নেই বলে হয়তো এই সম্পর্ককে মেনে নেওয়া। আদি-পরিবার আর ফিরিয়ে নেবে না বলে, হয়তো এই মেনে নেওয়া। অনেক সময় এমন লোকের সঙ্গে হয়তো মেয়েটিকে থাকতে হয়েছে যে তার বাবা বা স্বামীর ঘাতক। এই প্রশ্ন উঠে আসে জ্যোতির্ময়ী দেবীর 'এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা' উপন্যাসে। সুতারার যখন নিঃসঙ্গ অবস্থা তখন তার বাল্যবন্ধু সাকিনা প্রস্তাব দিয়েছিল, বৈবাহিক সম্পর্কের মাধ্যমে সুতারা সাকিনার পরিবারভুক্ত হয়ে যাক। সুতারা উত্তরে বলেছিল, বাবা মা দিদিকে সে ভুলবে কেমন করে। যে-সম্প্রদায়ের মানুষ তার বাবা-মা'র মৃত্যু, দিদির অপহরণের জন্য দায়ি, সেই সম্প্রদায়ের মানুষকে সে আপন করে নেবে কেমন করে? হরণ আর বরণ এক জিনিস নয়। যে অপহৃতা সে হয়তো ঘর-ও করে, কিন্তু বরণ করে না। বিয়েটা যদি মুসলমানী মতে হয়েও থাকে, তবে তা ভয়ে, ভক্তিতে নয়।

অনেক গরিব মেয়ে সচ্ছল সম্পন্ন পরিবারে স্থান পেয়ে সুখী হয়েছিল। দময়ন্তী সেহগল নানা বাধাবিপত্তি কাটিয়ে একটি হিন্দু মেয়েকে উদ্ধারের উদ্যোগ নিয়েছিলেন। কিন্তু সেই মেয়ে তাঁর প্রতি আদৌ কৃতজ্ঞ হয়নি, বরং তাঁকে গালি দেয়, জুতো দেখিয়ে তর্জন করে। অন্য একটি অপহৃত মেয়ে বাবা-মা'র কাছে ফিরতে নিতান্ত অনিচ্ছুক। পরে সে জানায়, সোনাদানা-জমি আর এই কন্যার বিনিময়ে এক পাকিস্তানি পুলিস কর্মচারী মেয়েটির পরিবারের অন্য সবাইকে নিরাপদে সীমান্ত পার করিয়ে দিয়েছিল। বাবা-মা নিজেদের নিরাপত্তার জন্য এই ঘৃণ্য চুক্তি করেছিল বলেই আজ এই তার অবস্থা। সে কেন বাবা-মা'র কাছে ফিরে যাবে? বহু হিন্দু আর শিখ পরিবার এই মেয়েদের ফিরিয়ে নিতে চায়নি। মেয়েদের যদিও-বা নিতে চেয়েছে তাদের ধর্ষণজাত সন্তানদের নিতে চায়নি। কারণ, ঐ সন্তানেরা তাদের মায়ের অশুচিতার জ্যান্ত সাক্ষী। গর্ভবতীরা, আগেই বলেছি, হয় স্বেচ্ছায় গর্ভমোচন করেছে, অথবা চাপে; জাত-শিশুদের পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে অনাথাশ্রমে। এই শিশুদের সম্বন্ধে উর্বশী বুটালিয়ার বাক্যটি মর্মান্তিক 'A child of history, without a history'। আর অপহৃতা মেয়েদের উদ্ধারের প্রশ্নের সঙ্গে জড়িয়ে গিয়েছিল শুধু সম্প্রদায়ের নয়, জাতিরও সম্মানের প্রশ্ন। দেশভাগ দেশমাতাকে খণ্ডিত, রক্তাক্ত করেছে, যেন ধর্ষিত করেছে; নারীহরণ নারীধর্ষণ দেশের মায়েদের, ভাবী-মায়েদের লাঞ্ছিত অপমানিত করেছে। দেশের মর্যাদার জন্য তাই দেশের মায়েদের, দেশের মেয়েদের ফিরিয়ে আনতে হবে। বিধর্মী-সংসর্গে অশুচি মেয়েদের শুচি করতে বলে, তাই অশুচিতার প্রমাণস্বরূপ গর্ভস্থ ভ্রূণকে হত্যা করতে হবে, জাত-সন্তান থেকে তাদের বিচ্ছিন্ন করতে হবে। উদ্ধার করা নারীদের প্রত্যর্পণ করা হবে তাদের পরিবারের, সম্প্রদায়ের, জাতির কোলে। তাহলেই মাত্র নৈতিক শৃঙ্খলার পুনঃপ্রতিষ্ঠা হবে। উদ্ধারের নামে আর এক প্রস্থ নারীনির্যাতনের কথা আমরা পেয়ে যাব সাদাত হাসান মান্টোর কোনও কোনও গল্পে। অপহৃত মেয়েকে যখন তার আদি পরিবারে ফিরিয়ে দেওয়া হতো, তখন মেয়েটির গর্ভমোচন ঘটে থাকলে তা পরিবারকে জানানো হতো না। কৃষ্ণা আয়ার জানাচ্ছেন, এটাই ছিল নিয়ম। উদ্ধার-করা মেয়েদের অতীত বিষয়ে দলের মহিলারা কোনও প্রশ্ন করতেন না। তাঁরা চাইতেন, এই দুঃস্বপ্ন পীড়িত মেয়েরা অতীতকে দ্রুত ভুলে যাক। যতো তাড়াতাড়ি ভুলবে, ততো তাড়াতাড়ি তারা মনস্তাত্ত্বিকভাবে বেঁচে উঠবে। অতীত খুঁড়ে বেদনা জাগানো তাঁর অভিপ্রেত মনে করেননি। মনে করেছেন নীরবতাই বাঞ্ছনীয়। কিন্তু ভুলতে বললেই কি ভুলতে কেউ পারে? সেই স্মৃতির বীভৎসতা নির্ভুলভাবে থেকে যায় অবচেতন সত্তার গহনে।

দেশভাগ-দেশত্যাগকে ঘিরে নীরবতার কতো-না স্তর-পরম্পরা। দেশভাগের দুর্যোগের দিনে জনৈক ত্রিলোক সিং-এর বয়স ছিল নয় বছর। ধর্মান্তরের হাত থেকে

বাঁচানোর জন্য পরিবারের অভিভাবকেরা নারী ও অন্য শিশুদের সঙ্গে ত্রিলোককেও হত্যা করতে উদ্যত হয়। ত্রিলোক কাতর অনুনয়ে নরম হয় বাবা-কাকাদের মন। সেই একমাত্র বেঁচে যায়। যে-কাকা মঙ্গল সিং-এর হাতে সে মরতেও পারতো, সেই কাকা আর ত্রিলোক সিং মাত্র বেঁচে আছে। কাকা-ভাইপোর মধ্যে এখন নীরবতার চক্রান্ত। সেই ভয়ংকর ঘটনার বাৎসরিক দিনটিতে প্রত্যেক বছর দুজনে স্বর্ণমন্দিরে যায়, আটচল্লিশ ঘণ্টা পূজাপাঠ করে, নীরবে মৃত পরিজনদের স্মরণ করে, নীরবে ফিরে আসে। কোন কোন উদ্ধার হওয়া মেয়ে বিধর্মীর সহবাসে অঙ্কুরিত গর্ভস্থ সন্তানের ভ্রূণ মোচন করতে চায়নি। সীমান্তের ওপারের মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক ঘুচে গেল, এপারে আত্মীয়রাও তাকে গ্রহণ করল না। সবদিকে গেল, হাতে থাকল মাত্র এই গর্ভের সন্তান, তাকে কেন সে নষ্ট করবে? অনেক মেয়ে অনাথাশ্রমে পরিত্যক্ত সন্তানদের দেখতে আসত। তাদের মনে কী হতো সেই সন্তানদের সঙ্গে মিলনের মুহূর্তে, সে সম্বন্ধে এক স্তব্ধ নীরবতা। যারা অপহৃতা হয়ে গিয়েছে বা যারা অপহৃতা হয়ে পরে ফিরে এসেছে তাদের সম্বন্ধে পরিবারে অতল মৌন। অনেক চেষ্টা করেও নোয়াখালিতে রিলিফের কাজের সময় অশোকা গুপ্তারা লাঞ্ছিতা অপহৃতা মেয়েদের শনাক্ত করতে পারেননি। হিন্দুরা বানিয়ে বানিয়ে বলত, মেয়েটি মাসির বা পিসির বাড়িতে ছিল। কখনোই স্বীকার করত না যে সে অপহৃতা হয়েছিল। এক ছিল লজ্জা, আর ছিল পরিত্যক্ত হবার ভয়। সতীশ গুজরালও লিখেছেন, 'it proved to be a Himalayan task to convince the kith to accept their women who bore the stigma of rape and molestation'. নিজেদের পরিবারে গৃহীত হবে না এই আশংকায় বহু নারী বরং সরকারি শিবিরে থেকে গেছে। মুসলমান পরিবারে এই সমস্যা কম ছিল। মেয়েদের শারীরিক শুচিতা নিয়ে তাদের মধ্যে হিন্দুদের মতো অসহ্য গোঁড়ামি ছিল না। তারা সহজেই নিজেদের অপহৃতা মেয়েদের সংসারে ফিরিয়ে নিয়েছিল। বীণা দাসের প্রবন্ধটিতে জনৈক মনজিতের কথা পাই। সে বলে, "দেশভাগের ওইসব সাংঘাতিক ঘটনায় মেয়েদের কুমারীত্ব নষ্ট হয়নি, তাই নিয়ে কেউ নিঃসন্দেহ হতে পারত না। তাই নিচু ঘরে বিয়ে দেওয়া ছাড়া উপায় ছিল না।" মনজিৎ নিজের খুড়তুতো বোনের কথা বলে। তাকে মুসলমানেরা অপহরণ করেছিল। "শুনেছি সে মুসলমান হয়ে গেছে। ভালোই করেছে। এখানে এলে কেউ কি বিশ্বাস করতো যে তার কুমারীত্ব নষ্ট হয়নি।" এই প্রসঙ্গে সন্তোষকুমার ঘোষের 'হয় না' গল্পটি উল্লেখ করা যেতে পারে, যে-গল্প যশোধরা বাগচী ও শুভরঞ্জন দাশগুপ্ত তাঁদের সংকলনের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। সরোজ উদ্বাস্তু মেয়ে আরতিকে বিয়ে করতে খুবই উৎসাহী ছিল। কিন্তু একজনের মুখে সরোজ শুনতে পায় আরতি মুসলমানদের দ্বারা অপহৃতা হয়েছিল এবং তাদের কাছেই দুইমাস থাকতে বাধ্য হয়েছিল। কেন আরতি

তার এই অতীত গোপন করেছে, সরোজ তীব্রভাবে অভিযোগ করে। দু-দিন পরেই ফিরে আসে অনুতপ্ত সরোজ। যে-লোক আরতি সম্বন্ধে কাহিনীটি বলেছিল সে ভুল করেছিল। সেই লোক যে অপহৃত নারীর কথা বলেছিল, সে এই আরতি নয়, অন্য মেয়ে। অনুশোচনা-পীড়িত সরোজ বিয়ে করতে চায়, কিন্তু এবারে প্রত্যাখান করে আরতি। কারণ আরতি অপহরণ ও মুসলমানদের মধ্যে তার বসবাসের ঘটনা অলীক জেনে ফিরে এসেছে সরোজ। যদি অপহরণ আর মুসলমানদের মধ্যে বাসের ঘটনা সত্য হতো, তাহলে সরোজ ফিরত না। কেমন প্রেমিক এই সরোজ, সংস্কারে বন্দী, মানবিকতাহীন? এই সরোজকে বিয়ে করতে রাজি হওয়া আরতির পক্ষে সম্ভব হবে না। শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'রিমঝিম' উপন্যাসে ভাবী বধূর অভিপ্রেত সব গুণ থাকা সত্ত্বেও প্রিয়ংবদার বিয়ে হওয়া কঠিন হয়, যেহেতু সে পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তু। ভাবী শ্বশুরবাড়ির লোকেরা তার শারীরিক শুচিতা বিষয়ে সংশয়ান্বিত। কে জানে, যদি সে ধর্ষিতা হয়ে থাকে! এক মহিলার কাহিনী জানিয়েছেন সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়। যশোর জেলার এই নারী দাঙ্গায় পরিবারের সবাইকে হারান। অপহৃত হয়ে সহবাস করতে বাধ্য হন এক বিধর্মীর সঙ্গে। অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় পালিয়ে পশ্চিমবঙ্গে আসেন, হোমে আশ্রয় পান। কন্যার জন্ম দেন তিনি। প্রাইভেটে পড়ে পরীক্ষায় পাশ করে চাকরিও পান। মেয়েকে নিয়ে পূর্বজীবন গোপন করে শুরু করেন নতুন জীবন। সামাজিক পরিচয় নেই তাঁর কোনও, তাই কাল্পনিক গল্প বানাতে হয়। যা সত্য তা নীরবতার চাদরে ঢাকা পড়ে যায়, বানানো গল্পই সত্য হয়ে ওঠে। আর একটি মেয়ে পাকিস্তানে এক তশিলদারের ঘরে আশ্রয় পেয়েছিল। এক বছর কেউ তাকে নিতে না আসায়, এক বছর অপেক্ষার পর সেই তশিলদার নিজের ছেলের সঙ্গে মেয়েটির বিয়ে দেয়। পরে রাষ্ট্রীয় উদ্ধার কর্মসূচি অনুযায়ী সেই মেয়েটিকে উদ্ধার করে ভারতে নিয়ে যাওয়া হয়। আশ্রমে থেকে, লেখাপড়া শিখে, সে আজ নিজের পায়ে দাঁড়িয়েছে। পরে সে নতুন করে সংসার জীবন শুরু করে। কিন্তু সে বর্তমান স্বামীকে বা সন্তানদের নিজের অতীতকথা বলেনি, বলতে পারেনি। নীরবতার মোড়কে সে তার সেই অতীতকে মনের গহনে চালান করে দিয়েছে।

'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে' উপন্যাসে মালতী ধর্ষিতা হয়েছিল। মুসলমানদের সঙ্গে থাকতে বাধ্য হয়েছিল। কিন্তু যতোই ফকিরসাহেব প্রবোধ দিন, 'গাঙ্গের পানিতে কতকিছু ভাইসা যায়, কিন্তু ঠাইরেন, মা জননীর কি কিছু হয়?' যতোই তিনি সর্বসমক্ষে মিথ্যা কথা জোর গলায় জানান, 'জননীরে কেউ অসতী করতে পারে নাই,' কিন্তু দাদা নরেন দাস বোনকে আর জলচল করে নিতে পারে না। 'বাঘে ছুঁলে আঠারো ঘা, যবনে ছুঁলে ছত্রিশ।' মালতীর থাকার জন্য তাই নির্দিষ্ট হয় ঢেঁকিঘরের বারান্দায় একটি খুপরি। ভারতের দুই প্রান্তে উদ্ধার-হওয়া ফিরে-আসা মেয়েদের একই নিয়তি। রাজিন্দর সিং

বেদীর 'লাজবন্তী' গল্পে ফিরে-আসা মেয়েদের স্বামী বাবা মা ভাইবোনেরা দেখেও চিনতে চাইছিল না। বরং উলটে গালমন্দ করছিল 'কেন ওরা মরল না? কেন বিষ খেয়ে নিজেদের সতীত্ব রক্ষা করল না? মান-সম্মান বাঁচাতে কুয়োতে ঝাঁপ দিয়েও তো মরতে পারত।' পরিবার ও সমাজের এই নিষ্ঠুর প্রত্যাখ্যান উল্লেখযোগ্যভাবে ফুটে উঠেছে জ্যোতির্ময়ী দেবীর 'এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা' উপন্যাসে। অপহৃত বা পরিস্থিতির দায়ে মুসলমান সংসর্গে বাস করা এবং পরে উদ্ধার হয়ে ফিরে আসা মেয়েরা যেন সত্যিই মধ্যিখানের চর! বাড়িতে আগুন লাগল, দাঙ্গার দিনগুলিতে বাবা হারিয়ে গেলেন, কালো-কালো ছায়ার হাত থেকে বাঁচতে মা পুকুরে ঝাঁপ দিলেন, দিদির কী হলো কে জানে। সুতারা আরো জেনেছে সম্মান বাঁচাতে দুর্গা গলায় দড়ি দিয়েছিল, নদীতে ঝাঁপ-দেওয়া অলকাকে গুন্ডারা তুলে নিয়ে গিয়েছে, সুরমারা কেউ বেঁচে নেই। বাবার ইস্কুলের হেডমাস্টার তমিজসাহেবের বাড়িতে সুতারার আশ্রয় মেলে। কলকাতাবাসী দাদারা সুতারার জন্য উৎকণ্ঠিত চিন্তিত নয়, তাদের চিন্তা পারিবারিক সম্মান নিয়ে। তমিজসাহেবের স্ত্রী-ও উদ্বিগ্ন, 'গেলে কি নেবে ওরা?' পরে পরিবারের সঙ্গে মিলিত হলে বউদি তাকে জড়িয়ে ধরলে বউদির মা তিরস্কার করে বলে, "একেবারে গিয়ে জড়িয়ে ধরলি। মুসলমানের ঘরের কাপড়। ছোঁয়া-লেপা সব। সবই কি আধিক্যেতা।" সুতারা যাতে বিছানা মাদুর ছুঁয়ে একাকার না করে, জলের জালাতে হাত না দেয়, সেই বিষয়ে সদাই সর্তকতা। সুতরাং অনুভব করে 'সে যেন বাড়ির কেউ নয়।' "এতদিন ধরে মুসলমানের ঘরে পড়ে ছিল। এক-আধ দিন নয়, ছ'মাসের ওপর। তাতে কি আর মেয়েমানুষের জাতজন্ম থাকে। তাকে এনেছিস বেশ করেছিস। তা একপাশে হাড়ি-বাগদির মতো বসে দাঁড়িয়ে থাক।" হাড়ি-বাগদি যেমন 'অপর', মেয়েরাও তেমনি। পিতৃতান্ত্রিকতা মেয়েদেরও মনে বদ্ধমূলভাবে বুঝিয়ে দেয় কীসে মেয়েদের জাতজন্ম থাকে, আর কীসে থাকে না। সুতারা ধর্ষিতা হয়েও থাকতে পারে, এই কথাটা ইশারায় ভেসে বেড়ায়। বলা হয় বটে, 'এনেছিস বেশ করেছিস', কিন্তু আবার বলাও হয় মুসলমানের অন্ন খেয়ে আসা এই মেয়েকে না আনলেই ভালো ছিল। 'থাকত সেখানেই। যা হয় হত।' 'কে আর নিজের ঘর ওদের এনে নোংরা করবে।' বাড়ির বিয়ে লাগলে নারীসমাগমে প্রশ্ন প্রখরভাবে উঠতেই থাকে, 'পাকিস্তানে কার কাছে ছিল? কোথায় ছিল, কী হয়েছিল? ধরে নিয়ে গিয়েছিল বোধহয়। কেনই-বা মরতে এল।' সুতারার বিয়ের চেষ্টা হলে সব জানাজানি হয়ে যাবে, পরিবারের অন্য মেয়েদের বিয়ে দেওয়া কঠিন হবে। এইভাবে সুতারা বাড়ির কেউ নয় হয়ে যায়; অস্তিত্ব হারিয়ে ফেলে—হয়ে যায় বিছিন্ন, নিঃসঙ্গ, একাকী। ইতিহাসে জীবনের নিচের তলার কথা, মগ্ন জীবনের কথা থাকে না—মানুষের অনুভূতি, আঘাত, যন্ত্রণাবেদনা, দুঃস্বপ্ন, অনুরাগ, হাহাকার সবকিছু নীরবতার চাদরে

ঢাকা পড়ে যায়। যে-কথা ইতিহাস বলতে পারে না, সেইকথা বলার দায়িত্ব সাহিত্যের। অথচ দেশভাগ-দেশত্যাগ নিয়ে ইতিহাস যা বলতে পারেনি, সাহিত্যেও তা বলতে অপারগ হল অনেকটাই। কেন সাহিত্য বলতে পারল না, অসামান্যভাবে তার কারণ বলবার প্রয়াস পেয়েছেন জ্যোতির্ময়ী দেবী 'এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা' উপনাসের ভূমিকা-স্বরূপ 'আমার কথা'-য়। প্রথমেই মৌষলপর্বের কথা বলেছেন তিনি। অর্জুনের চোখের সামনে কিছু নারী লাঞ্ছিত অপমানিত হলো, কিছু নারী দস্যুদলের সঙ্গে প্রকাশ্যে চলে গেল, কিছু নারীর সম্ভবত মৃত্যু হলো। 'সব লিখতে পারেননি ইতিহাসকার। কী হলো তারপর?' সেকথা লেখা হয়নি। কেন লেখা হয়নি, তার কারণ অনুমান করেছেন জ্যোতির্ময়ী দেবী।

"সেকথা লেখেননি ব্যাসদেব। ...মহাকবি হলেও পুরুষ, কাপুরুষের নারীদেহের ওপর সেই অত্যাচারের বর্বর লাঞ্ছনার কাহিনী লিখতে পারেন না। লজ্জা ধিক্কারে তাঁর লেখনী অভিভূত মূক স্তব্ধ হয়ে যায়। তাই পুরুষকবি সেকথা লেখেননি।

কাপুরষ তো ইতিহাস লেখে না। নারী কবি, মহাকবি নেই। থাকলেও নিজেদের মান লজ্জা মর্যাদা সম্ভ্রমহানির কথা লিখতে পারতেন না। সে ভাষা আজও পৃথিবীতে সৃষ্ট হয়নি।

তাই স্ত্রীপর্বের কোনও ইতিবাস কোথাও নেই।"

তবুও মানুষ থেকে যায়

প্রবন্ধের নানা অংশে সাহিত্য থেকে, বাস্তবের বিবরণ থেকে তুলে আনা অনেক গল্প ব্যবহার করেছি। ওয়াল্টার বেনজামিনের কথাটা— 'Anecdote brings things closer to us in space, allows them to enter into our lives.'—শিরোধার্য করেছি বলেই নানা আখ্যান তুলে ধরেছি। সেই দিনগুলিতে অমানুষ অনেক-অনেক ছিল। যখন মানুষের ভিতর থেকে অমানুষেরা জেগে ওঠে, তখনও কিন্তু মানুষ থেকে যায়। মনময়ী বসু দুটি ঘটনার কথা লিখেছেন। জনৈক বিধবা ধনী আত্মীয়া ঢাকার প্রাসাদোপম গৃহ ত্যাগ করেন মুসলমান ভৃত্যদের পরামর্শে। প্রতিবেশিনীদের দেওয়া বোরখা পরে পথে বেরোন তিনি। ঐ ভৃত্যরাই তাঁকে নিরাপদে সীমান্তে পৌঁছে দেয়। খুলনার রূপশ্রী মন্ডল পরিবারের সবাইকে হারিয়ে দুই বছরের পুত্রকে নিয়ে সীমান্ত পার হন এক প্রতিবেশিনী ভিখারির সাহায্যে, তারই বোরখা পরে। পরিবারের অন্য অন্য সবাই খুন হয়ে গেলে প্রমীলা দাস মুসলমান প্রতিবেশীদের কাছে আশ্রয় পেয়েছিলেন। সমীরা দত্ত ও তাঁর পরিবার ১৯৭১ পর্যন্ত দাঙ্গাপর্যুদস্ত খুলনায় থাকতে পেরেছিলেন তাঁর দাদার প্রভাবশালী বন্ধু সাভুর মিয়ার জন্য। যখন চলে আসেন তখন তাঁদের সীমান্ত পর্যন্ত পৌছে দেওয়া হয়, পরনে ছিল সাভুরের পরিবারের মেয়েদের

দেওয়া বোরখা। মণিকা দাস ও তাঁর পরিবারকে আশ্রয় দিয়েছিল পড়োশি খানেরা। মণিকার মা চলে আসার সময় বাড়ির চাবি খানপরিবারের কর্ত্রীকে দিয়ে বলেন, এখন থেকে এ বাড়ি তাঁদের। মহিলা চাবি ছুঁড়ে কুয়োয় ফেলে দিয়ে বলেন, "দ্যাখ্‌লা তো, চাবি ফ্যালাইয়া দিলাম। ওখানেই রইলো। তুমি আবার আইস্যা বাইর কইরা লইয়ো।" প্রবন্ধের শেষে কোনও কথা পেশ করছি না, কোন বিশ্লেষণের উদ্যোগ নিচ্ছি না, আরও কয়েকটি মানুষের গল্প বলছি। দু-একটি গল্প সাহিত্য থেকে নেওয়া, এই মানুষগুলি সাহিত্যের চরিত্র। কিন্তু তাদের এইসব গল্প তত্ত্বের ছাঁচে তৈরি বানোনো গল্প নয়;অকৃত্রিমতায় সেগুলি সত্য, একেবারে অথেনটিক। আর দু-একটা গল্প সত্যিকারের মানুষের গল্প। সেইসব কাহিনী আমরা পেয়েছি দেশভাগ দেশত্যাগের কোন প্রতিবেদনে। ভুলে যাওয়াই বাঞ্ছনীয় মনে করে হোক, পাছে সাম্প্রদায়িকতা উশকে ওঠে এই সন্ত্রস্ততায় হোক, ভারতের পূর্বাংশের দেশভাগের এই রকম সত্য কাহিনী আমরা সংগ্রহ করিনি। কোনও বিশ্ববিদ্যালয়, গবেষণা-প্রতিষ্ঠান, কোনও আকাদেমি দেশভাঙার ভাঙা-মানুষদের মৌখিক ইতিহাস সংগ্রহ করার উদ্যোগে নেয়নি।

'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে' উপন্যাসে তরুণী বিধবা মালতীকে জব্বর হরণ করে। করিমের কাছ থেকে টাকা নিয়ে সেই টাকার লোভে জব্বরের এই কাজ। মালতী বশ মানে না, এক ফাঁকে জলে ঝাঁপ দেয়। কিন্তু ধরা পড়ে যায় সে, তাকে বলাৎকার করা হয়। তাকে মৃত মনে করে তিন দুষ্কৃতী কবরখানায় ফেলে রেখে যায়। মুসলমান ফকিরের বউ জোটন তাকে উদ্ধার করে। 'জোটন সব ভুলে মালতীকে মায়ের স্নেহে চোখেমুখে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল। চুলে বিলি কেটে দিতে থাকল। সন্তানস্নেহে জোটনের চোখ ফেটে জল আসছিল।' মালতী হিন্দু বিধবা, তাকে অনেক আচার-নিয়ম মানতে হয়। জোটন তাকে বলেছিল সব মেনে খাবারের ব্যবস্থা করে নিতে। "ছুঁইয়া দিলে জাত যায় না। কার জাত? তোমার না মানুষের।" জোটন নানাভাবে মালতীকে বুঝ-প্রবোধ দিয়েছিল। ফকির সাহেবও তাকে বোঝায়, "সোনার অঙ্গে কালি লাগলে ধুইয়া ফেলান। ...ঠাইরেন, গাঙ্গের পানিতে কত কিছু ভাইসা যায়, কিন্তু ঠাইরেন, মা জননীর কি কিছু হয়?" আগেই বলেছি মালতীর জন্য ফকির জনসমক্ষে মিথ্যা বলতেও দ্বিধা করে না—'জননীরে কেউ অসতী করতে পারে নাই...।'

ঠাকুমার জ্যাঠামশাই, এই চূড়ান্ত রক্ষণশীল বুড়ো, *The Shadow Lines* উপন্যাসে, আজ ঢাকার খলিল বলে এক রিকশাওয়ালা ও তার পরিবারের উপর নির্ভরশীল। দশ ফুটের মধ্যে মুসলমানের ছায়া পড়লে যার খাবার অশুচি হয়ে যেত, আজ খলিলের বউ রেঁধে না দিলে তাকে অনাহারে থাকতে হতো। খলিল চায় না এই জ্যাঠামশাই, যে এখন উকিলবাবু নামে পরিচিত সে চলে যাক তার পশ্চিমবঙ্গবাসী আত্মীয়দের সঙ্গে। উকিলবাবু চলে গেলে খলিল ভয় পায়, গ্যারাজের মালিক সৈফুদ্দিন

গোটা বাড়িটা দখল করে নেবে এবং খলিলকে উৎখাত করবে। কিন্তু খলিলের বউ চায় বুড়ো চলে যাক, তার দরিদ্র সংসারে বুড়োর দায় এক বড়ো বোঝা। কাশ্মীরে হজরতবাল থেকে পবিত্র কেশ চুরি গেলে যখন দাঙ্গার তীব্র উত্তেজনা, সেই সময় জ্যাঠামশাইকে নিয়ে আসার উদ্যোগ নেওয়া হয়। জ্যাঠামশাই একেবারেই যেতে রাজি নয়, তাকে দূতাবাসের গাড়িতে তোলার প্রশ্নই ওঠে না। উকিলবাবুকে বোঝানো হয় তাকে আদালতে যেতে হবে। তাকে উকিলের শামলা পরিয়ে খলিলের রিকশায় ওঠানো হয়। সামনে দূতাবাসের গাড়ি, পিছনে জ্যাঠামশাইকে নিয়ে রিকশা চালিয়ে ছুটছে খলিল। দাঙ্গাবাজদের দ্বারা গাড়ি আক্রান্ত হয়, দূতাবাসের রক্ষী গুলি চালালে গাড়ি আর গাড়ির আরোহীররা রক্ষা পায়। কিন্তু রিকশারোহী জ্যাঠামশাই আর রিকশার চালক খলিল রক্ষা পায় না। তাদের বাঁচাতে গিয়ে ত্রিদিবও খুন হয়ে যায়। রক্ষণশীল হিন্দু জ্যাঠামশাই, যার রক্ষণশীলতা আর বজায় থাকতে পারেনি, আর তাকে দেখাশুনো করত যে দরিদ্র রিকশাওয়ালা সেই খলিল দুজনে একসঙ্গে খুন হয়ে যায়। এক আত্মনির্বাসিত হিন্দু আর গরিব মুসলমানের রক্ত এক ধারায় মিশে যায়।

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্-র 'একটি তুলসী গাছের কাহিনী' গল্পে হিন্দুর পরিত্যক্ত বাড়ি দখল করেছে কলকাতা থেকে চলে আসা মুসলমান উদ্বাস্তুরা। অপরাধের বোধ দখল-নেবার বিজয়-উল্লাসে উড়ে যায়। তারা দ্যাখে হিন্দুয়ানির চিহ্ন একটি তুলসীগাছ রয়ে গেছে। তারা ভাবে হিন্দুয়ানির এই চিহ্ন রাখবে না, গাছটি উপড়ে ফেলবে। কিন্তু পারে না। শুকনো মৃতপ্রায় তুলসীগাছ যেন একটি অন্তঃপুরের কথা প্রকাশ করছে। আকাশে যখন সন্ধ্যাতারা, তখন শান্ত-শীতল প্রদীপ জ্বলে উঠত এই তুলসীর নীচে। কোথায় এই গৃহকর্ত্রী এখন, কে জানে কোথায় সে আশ্রয় নিয়েছে। তুলসীর রস সর্দির ওষুধ, এই যুক্তিতে কেউ গাছটাকে বাঁচাতে চায়। মৌলবীধরনের মানুষটিও চুপ। তুলসীগাছটি অক্ষত থেকে যায়। শুধু তাই নয়, শুকনো গাছটি সবুজ হয়ে উঠছে, কেউ নিশ্চয় লুকিয়ে গাছে জল দিচ্ছে। সরকার পুলিশ পাঠিয়ে বাড়িটি রিকুইজিশন করায় দখলকারী উদ্বাস্তুরা চলে যেতে বাধ্য হয়। পানির অভাবে তুলসীগাছও শুকিয়ে যায়। মানবিক সম্পর্কে রাষ্ট্রশক্তিই বাধা হয়ে ওঠে।

সাহিত্যের কাহিনী নয়, দুটি সত্য কাহিনী বিবৃত করছি উর্বশী বুটালিয়ার *The Other Side of Silence* নামের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বই থেকে। বাংলা সাহিত্য যেমন বোবা হয়ে থেকেছে, তেমনি দেহে-মনে আহত মানুষের মুখ থেকে এই রকম সব সত্য কাহিনী আমরা পূর্বাংশে সংগ্রহ করিনি। হিংস্রতার স্মৃতি যেমন রক্ষিত হয়নি, তেমনি রক্ষিত হয়নি মানবিকতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্তগুলি। সেইসব মানবিক কাহিনীর কুশীলব নিতান্ত হিন্দু ছিল না, নিতান্ত মুসলমান ছিল না, একেবারে মানুষ ছিল। মৃত্যুর

সঙ্গে-সঙ্গে তাঁদের স্মৃতিবিধৃত কাহিনী হারিয়ে গেল, কেউ লিখে রাখল না উত্তরকালের জন্য।

বুটালিয়ার বইয়ের প্রথম কাহিনীটি একটি মুসলিম মেয়ে জয়নাবের। জয়নাব দেশভাগের দুর্যোগের দিনগুলিতে অপহৃতা হয়। নানা হাত ঘুরে শেষ পর্যন্ত তাকে বিক্রি করা হয় শিখ যুবা বুটা সিং-এর কাছে। অবিবাহিত বুটা জয়নাবকে বিয়ে করে। দুটি কন্যাও জন্মায় তাদের। সম্ভবত বুটার ভাই বা ভাইপোরা সম্পত্তির কারণে জানিয়ে দেয় তাদের ঘরে একজন অপহৃতা মুসলমান মেয়ে আছে। সরকারি তল্লাশি পার্টি এসে জয়নাবকে 'উদ্ধার' করে। কাঁদতে কাঁদতে ছোট মেয়েকে কোলে নিয়ে জয়নাব চলে যেতে বাধ্য হয় বুটার সংসার ছেড়ে। যাবার সময় সে বুটাকে বলে যায় সে শীঘ্র ফিরে আসবে, আর ইতিমধ্যে সে যেন বড় মেয়েকে সযত্নে দেখাশুনো করে। এদিকে জয়নাব পাকিস্তানে ফিরে গেলে, জয়নাবের কাকাও সম্পত্তির কারণে, চায় জয়নাব ঐ কাকার ছেলেকে বিয়ে করুক। ছেলেটি প্রথমে অনিচ্ছুক ছিল, কিন্তু পারিবারিক চাপাচাপিতে শেষ পর্যন্ত ঐ যুবক বিয়েতে রাজি হয়। ইতিমধ্যে পাকিস্তানে জয়নাবের বিয়ের চেষ্টা হচ্ছে এই খবর পেয়ে বুটা সিং জমি বেচে টাকা জোগাড় করে পাকিস্তানে যেতে উদ্যোগী হয়। মুসলমান হলে পাকিস্তানে যাওয়া সহজ হবে মনে করে বুটা সিং ধর্মান্তরিতও হয়। নানা বিঘ্ন অতিক্রম করে পাকিস্তানে গিয়ে বুটা দেখে জয়নাবের সেই বিয়ে হয়েই গেছে। অন্যদিকে, পাকিস্তানে গিয়ে সেখানকার কর্তৃপক্ষের কাছে নিজের উপস্থিতি না-জানানোয় বুটা গ্রেপ্তার হয়ে যায়। সে তখন ম্যাজিস্ট্রেটকে সব কথা খুলে বলে। ম্যাজিস্ট্রেট তলব করে জয়নাবকে। বৈবাহিক সূত্রে নতুন আত্মীয়স্বজন পরিবেষ্টিত জয়নাব বুটাকে অস্বীকার করে, বা অস্বীকার করতে বাধ্য হয়। এমনকি বলে, ছোট মেয়েটিকেও বুটা নিয়ে যেতে পারে। পরের দিন চলন্ত ট্রেনের সামনে ঝাঁপিয়ে পড়ে বুটা সিং আত্মঘাতী হয়। আর বুকের মধ্যে অদৃশ্য ক্ষত থেকে হয়তো রক্তমোক্ষণ হতেই থাকে, কিন্তু তবু জয়নাবকে নিশ্চয়ই নীরব থেকে যেতে হয়।

দ্বিতীয় গল্পটি দুইজন পুরুষ মানুষের গল্প। লাহোরের ইসলামপুরের চৌধুরী লতিফ দেশভাগের ফলে উদ্বাস্তু হয়ে গিয়ে যে চমৎকার বাড়িটিতে বসবাস করতে আরম্ভ করেন, তিনি জানতেনই না ঐ বাড়ির আদি বাসিন্দা কে ছিল। কিছুদিন পরে ঐ বাড়িতে বসবাসকারীর উদ্দেশে লেখা একটা চিঠি পেলেন চৌধুরীসাহেব পূর্ব পাঞ্জাবের জলন্ধর থেকে র‍্যাডক্লিফের টানা সীমান্তরেখার এ-পার থেকে। পত্রলেখক হরিকিষণদাস বেদী ঐ বাড়ির পূর্ব-বাসিন্দা ছিলেন। বিনা নোটিসে দাঙ্গার ভয়ংকর দিনগুলিতে হরিকিষণদাসকে বাড়ি ছাড়তে হয়েছিল প্রাণপ্রিয় বই, কাগজপত্র ফেলে এবং সেইসময় যে-জ্যামিতির বই তিনি লিখছিলেন তার অর্ধ-সমাপ্ত পাণ্ডুলিপি ফেলে। কোথায়-কোথায় কী রক্ষিত ছিল, কোন্ আলমারিতে, কোন্ ট্রাংকে তার পুঙ্খানুপুঙ্খ

বিবরণ ছিল ঐ চিঠিতে। চিঠিতে হরিকিষণদাস বাড়ির নতুন বসবাসকারীকে অনুরোধ করেছেন, যদি তাঁর দরকারে না লাগে তাহলে ঐ সব যেন তিনি হরিকিষণদাসকে পাঠিয়ে দেন। আর জানান তিনি, স্কুল-শিক্ষকতার সমস্তটা জীবন ধরে ধর্ম-নির্বিশেষে সব ছাত্রকে তিনি পড়িয়েছিলেন যথাসাধ্য যত্নে। হরিকিষণদাসের অনুরোধ মতো সব জিনিস লতিফসাহেব প্যাকেট করে-করে পাঠিয়ে দেন। আর এইভাবে দুজনের মধ্যে পত্রমিতালি গড়ে ওঠে। লতিফসাহেবের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্রবধূ বেদীর চিঠিগুলি পান, সুন্দরভাবে সাজানো গোছানো এবং ফিতে দিয়ে বাঁধা। দ্বিতীয় চিঠিটিতে হরিকিষণদাস বেদী লিখেছিলেন, "I shudder to think of what Hindus and Muslims have done to their fellow countrymen...And worst part of it is that it was all perpetrated in the name of religion. No religion allows such bloodletting." যে-সময় সবারই পরিচয় হয়ে গিয়েছিল ধর্মগত বা সম্প্রদায়গত পরিচয়, হিন্দু হয়ে উঠেছিল নিতান্ত হিন্দু, মুসলমান হয়ে উঠেছিল মুসলমান ছাড়া আর কিছু নয়, সেই দুঃসময়েও কিছু ব্যক্তি বেঁচে ছিল। চৌধুরী লতিফের মতো, হরিকিষণদাস বেদীর মতো। তাঁদের একজন, হরিকিষণদাস বেদীর এই বেদনাপীড়িত বাক্যটি হোক এই প্রবন্ধের শেষ বাক্য।

ভাঙা বাংলা আখ্যানে 'আমরা' আর 'ওরা'

বাংলা ভাগ হয়নি তখনও, হবে-হবে এমন অবস্থা। সাম্প্রদায়িক সংঘাতের পরিস্থিতিতে পাকশি ইস্কুলের হেডমাস্টারমশাইকে সপরিবারে নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে বাড়ি ছাড়তে হয়েছিল। সেই পরিবারের একজন লিখেছেন—"অল্প কিছু জিনিসপত্র সঙ্গে নিয়ে, হাতে একটা লণ্ঠন নিয়ে, সামনের বিরাট মাঠ পেরিয়ে ওপারের কোন নিরাপত্তায় পৌছব আমরা।" দাদা অর্থাৎ বাড়ির বড়ো ছেলে ফেলে-আসা বাড়িতে থেকে গেল। মা জানালেন সবাই চলে গেলে চলবে কেমন করে, বাড়ির পাহারায় একজনকে তো থাকতেই হবে। সবাই চলে গেল ভিন্ন আশ্রয়ের নিরাপত্তার দিকে। "আক্রান্ত হলেও হতে পারে যে বাড়ি, তাকে পাহারা দেবার জন্য, তাকে বাঁচাবার জন্য, বৈঠকখানার দরজা ধরে সেই অন্ধকারের মধ্যে রয়ে গেল দাদা।" দাদা অর্থাৎ সত্যপ্রিয় ঘোষ। তখন তাঁর বয়স ঠিক বাইশ বছর। অন্ধকারে তাঁর একা থেকে যাওয়ার এই সাহসী নিঃসঙ্গ ছবিটি আমার মনে গেঁথে যায়। এই ঘটনার কিছুদিন পরে দেশভাগের মর্মান্তিক রক্তক্ষয়ী আঘাতে পরিবারের সকলের সঙ্গে সত্যপ্রিয় ঘোষ কলকাতায় চলে আসতে বাধ্য হন।

চলে আসার পর দেশভাগ নিয়ে, উদ্বাস্তুর অভিজ্ঞতা নিয়ে, সেই সময়কার উদীয়মান কথাসাহিত্যিক সত্যপ্রিয় ঘোষ লিখেছিলেন দু-একটি উপন্যাস, কিছু ছোট গল্প। তিনি দেখেছেন স্থিতাবস্থার অবসান, ভাঙন ও বিপর্যয়। শশীনাথ দারোগার আলো আর বাতাস ছিল বানারিপাড়া গ্রাম আর নয় পুরুষের বাস্তুভিটা। পাকিস্তান, মুসলমানরাজ মেনে নিতে পারছিলেন না তিনি। মিথ্যা টেলিগ্রাম করে শশীনাথকে যখন কলকাতায় আনানো হয়, তখনও তাঁর মন জুড়ে থাকে ছাদে শুকোতে দেওয়া সুপুরির স্তূপ। জজকোর্টের নাজির দুর্গাচরণ ভূসম্পত্তি চকমিলানো বাড়ি ফেলে, পাকিস্তানের গ্রামে জোতজমা তালুক মালামাল খুইয়ে এখন বৈঠকখানা বাজারের তিনতলায় এক ঘুপচি ঘরে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছে। মোক্তারের মুহুরির মেয়ে বেঙ্গি আজ স্টেশন প্লাটফর্মে খোলা আকাশের নীচে চাটাই বিছায়। যখন-তখন তাদের উপর লাঠি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে পুলিশ, আর আবার উৎখাত হয় উদ্বাস্তুরা। পণ্ডিতমশাইয়ের পরিবার আজ ঝুপড়ির বাসিন্দা। নীতিবাগীশ মানুষটি অনন্যোপায় হয়ে বিনাটিকিটে

ট্রেনে চড়লে পুলিশ তাঁকে দড়িতে বেঁধে নিয়ে যায়। পরিবেশের ইতরতায় ছেলেদের নৈতিক পতন ঘটছে, উদ্বাস্তু পরিবারে মেয়েদের মনে করা হয়, তারা যেন হাফগেরস্ত।

এই ক্লিন্নতার মধ্যেও জীবনপ্রবাহ মানবিকতা অব্যাহত থাকে। প্রসূতির প্রসবে ধাত্রীর কাজ করে বেঙ্গি, নবজাতকের কান্নায় উদ্বাস্তুতে থিকথিক-করা প্লাটফর্ম উল্লসিত হয়। সহৃদয় নরেশ 'দুঃস্থ মানুষের দীর্ঘশ্বাসের অভিশাপে' গুমোট ঘরে বন্দিনী মেয়েকে বিয়ে করার সিদ্ধান্ত নেয়। অতীতে স্বদেশী-করা, 'গীতাঞ্জলি' যার সব মুখস্থ সেই রেল কর্মচারী কেষ্টদা ওভারটাইম খাটে, বাড়তি অ্যালাউন্স নেয়, আর দুঃস্থ অনাত্মীয় উদ্বাস্তু পরিবারকে নিয়ে আসে নিজের বাসায়। নাটক-পাগল পি. সি. রায়ের একলব্যশিষ্য রমানাথ বরিশালের নামজাদা বংশের সন্তান। হিন্দুনিধন চরমে উঠলে তিনি একবস্ত্রে দেশত্যাগ করেন। ১৯৪৮ সালে বানারিপাড়াতে যখন শেষবার তাঁর নেতৃত্বে 'চাঁদসদাগর' মঞ্চস্থ হয়, তখন চারিদিকে সর্বনাশের চিহ্ন, সব ভেঙে পড়ছে, সবাই দিশাহারা। কলকাতায় এসেও রমানাথ ছোটদের নিয়ে নাটকের আয়োজনে মেতে উঠতে চান। গ্রামে পরিচিত প্রিয়জনেরা নাটকের নেপথ্যে যন্ত্রসঙ্গীত বাজাত। এখন পশ্চিমবঙ্গে তারা কে কোথায় ছড়িয়ে পড়েছে। যারা উদ্বাস্তু কলোনিতে জায়গা পেয়েছে তারা হয় বাদ্যযন্ত্র ফেলে এসেছে অথবা সঙ্গে আনলেও সেই সব বাদ্যযন্ত্র আজ অকেজো। সুর বাজে না আর। মনসা এখন চাঁদের মহাজ্ঞান হরণ করেছে, মধুকরডিঙা ডুবিয়ে দিয়েছে। তবু রমানাথ স্বপ্ন ফেরি করা ছাড়তে পারেন না। দেশভাগের ফলে মধ্য-শ্রেণীর মানুষের বিপর্যয় নিয়ে লেখা এইসব অ্যাখ্যান। সত্যপ্রিয় ঘোষের একটি গল্প পাই নিম্নবর্গের মানুষকে নিয়ে লেখা, বঙ্কুঘরামির গল্প। উদ্বাস্তু শিবিরের টিকিট মেলেনি তার। তার বউ সোনাই সংসার পাতে ফুটপাতের ধারে এক আস্তানায়। সেই ঘরও ভাঙার চেষ্টা হলে উন্মাদিনী সোনাই বঁটি হাতে ছুটে আসে, যেন খড়্গধারিণী ভয়ংকরী কালী।

দেশভাগের সঙ্গে জড়িত হিংস্রতার অভিজ্ঞতা আমাদের কল্পনাশক্তিকে অসাড় করে দিয়েছিল। দেশভাগের কষ্টকে আমরা ভুলে থাকতে চেয়েছি। আমরা ভেবেছি দেশভাগের অভিজ্ঞতার আকাঁড়া বাস্তবকে সাহিত্যে তুলে ধরলে সাম্প্রদায়িকতাকে প্রশ্রয় দেওয়া হবে। দেশভাগের সঙ্গে জড়িত হিংস্রতায় নৈতিকবিশ্ব বিধ্বস্ত হয়ে গিয়েছিল আর নৈতিকতার সমর্থন ব্যতিরেকে লেখকের লেখনী অচল হয়ে যায়। তাই দেশভাগ নিয়ে বাংলা সাহিত্য অনেকটাই নীরব। যেখানে নীরব নয়, সেখানেও প্রগতিসাহিত্যের তত্ত্বকাঠামোর দায়ে অনেক কঠিন সত্য গোপন করা হয়েছে, নরম করা হয়েছে, এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে। এইসব বাধা আর দ্বিধা এড়িয়ে বাংলায় দেশভাগের অভিজ্ঞতা বিষয়ে যতোটুকু সাহিত্য রচিত হয়েছে, সেখানে লেখা হয়েছে 'আমাদের' কথা—সমাজের মধ্যস্তরের মানুষের কথা, ভদ্রলোকেদের কথা, যেমন সত্যপ্রিয় ঘোষের লেখা আখ্যানগুলিতে, তেমনি নরেন্দ্রনাথ মিত্রের জনপ্রিয় গল্পে

উপন্যাসে। নরেন্দ্রনাথের 'দ্বিচারিণী' গল্পের তরঙ্গ উদ্বাস্তু ক্যাম্পবাসিনী হয়ে ঝি-গিরি করতে বাধ্য হয়। স্বামী সুস্থ হলেই কাজটা ছেড়ে দেবে সে। সে ভাবে 'ভদ্রলোকের মতো স্বাধীনভাবে থাকবে আলাদা বাসা করে।' পরে পরিস্থিতির চাপে সে অন্যসব ঝি-র মতো ঝি-র স্তরে নেমে যায়। কিন্তু তরঙ্গর মানসিকতা মধ্যশ্রেণীর ভদ্রলোকের। পূর্ববঙ্গের বর্ণহিন্দু জমির উপস্বত্বভোগী শ্রেণীর মানুষ, যারা ভদ্রলোকের পেশার সঙ্গে জড়িত—ইস্কুল-কলেজশিক্ষক, উকিল, ডাক্তার, সরকারি কর্মচারী, এঁদের স্থিতিশীল পরম্পরা বঙ্গ-বিভাজনের চূড়ান্ত আঘাতে চুরমার হয়ে গিয়েছিল। এরা 'traditional and ortherdox social order'- কে সনাতন বলে জানত। ধর্মের পবিত্রতা বিষয়ে, জাতপাতের সামন্ততান্ত্রিক স্তরবিন্যাস বিষয়ে এদের ধারণা ছিল অনড় এবং বদ্ধমূল। এই বর্ণহিন্দু সমাজের মানুষের কথা, তথাকথিত বাঙালি ভদ্রলোকের কথা, অর্থাৎ আমাদের কথাই দেশভাগের আখ্যানে জায়গা পেয়েছে। জমিতে তারা কাজ করে না, উৎপাদনে তাদের ভূমিকা নেই। তারা জমির উপস্বত্ব ভোগ করে হাতে মাটি না মেখে। তারা 'rentier' এবং 'sedentary occupations' তাদের। তারা ইংরেজি শিক্ষা পেয়েছে বা টোলে সংস্কৃত পড়েছে। এই স্তরের মানুষেরা এমন কিছু সামাজিক মর্যাদা ও সুযোগসুবিধা ভোগ করে, যা নিম্নবর্ণের হিন্দুর কাছে, বেশির ভাগ মুসলমান সমাজের মানুষের কাছে ছিল একেবারে দুর্লভ। এই ভদ্রলোক শ্রেণীর মানুষের কাছে দেশভাগ এক চূড়ান্ত ঐতিহাসিক বিপর্যয় হিশেবে উপস্থিত হয়েছিল। এবং তাদের সামাজিক অবস্থানের ভিত্তিকে টলিয়ে দিয়েছিল।

বাংলাভাগের বেশকিছু আগে থেকেই এই বাঙালি ভদ্রলোকসমাজের মানুষের উপর আঘাত একের পর এক এসে পড়ছিল। ঠিক একশো বছর আগের ১৯০৫ সালের কার্জন প্রস্তাবিত বঙ্গভঙ্গ রদ হওয়ায় বেশকিছু বাঙালি, যারা ছিল প্রধানত ইসলামধর্মাবলম্বী তারা ক্ষুব্ধ হয়েছিল। কারণ, পূর্ববঙ্গ ও আসাম মিলে যে নতুন প্রদেশের প্রস্তাব ছিল সেই প্রদেশে নবোদিত মুসলমান মধ্যশ্রেণী ইংরেজ শাসনের সীমাবদ্ধতার মধ্যে খানিকটা ক্ষমতা অর্জন করতে পারত। কিন্তু 'settled fact' 'unsettled' হয়ে যাওয়ার সেই সম্ভাবনা অঙ্কুরে বিনষ্ট হয়। কিন্তু ১৯৩২ সালে সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারা ও স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থা মধ্যশ্রেণীর বাঙালি মুসলমানের সামনে ক্ষমতার দরজা খুলে দিল। এই বাটোয়ারার সংখ্যাগরিষ্ঠতার নীতি স্বীকৃত হওয়ায় ক্ষমতার ভারসাম্য মৌলিকভাবে মুসলমান সম্প্রদায়ের হাতে চলে এল। ১৯৩৫ থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত অবিভক্ত বাংলায় ক্ষমতায় ছিল ফজলুল হক, নাজিমুদ্দিন, সোহরাবর্দি মন্ত্রিসভা। দু-চারজন খুচরো হিন্দুমন্ত্রী, যাঁদের আবুল হাশিম বলেছেন, 'লোক দেখানো এবং গৃহশত্রু' সেইসব মন্ত্রিসভায় থাকলেও হিন্দু ভদ্রলোকেরা ছিল মূলত ক্ষমতাচ্যুত। উনবিংশ শতাব্দীর একেবারে গোড়া থেকে সামাজিক অর্থনৈতিকভাবে অগ্রণী হিন্দু ভদ্রলোকসমাজ এই ক্ষমতাচ্যুতি মেনে নিতে পারেনি। এই ফজলুল হক, নাজিমুদ্দিন, সোহরাবর্দি মন্ত্রিসভাগুলি অনগ্রসর মুসলমান সম্প্রদায়ের

স্বার্থের কথা ভেবে কতকগুলি আইন-প্রণয়নের উদ্যোগ নেয়। হতে পারে, এইসব আইনের সাহায্যে উদীয়মান মুসলমান মধ্যশ্রেণী তাদের শ্রেণীগত স্বার্থেই গরিব, এবং পিছিয়ে পড়া মুসলমানকে ইসলামের নামে নিজেদের ছাতার তলায় জড়ো করতে চেয়েছিল। উদ্দেশ্য যাই হোক, সংখ্যাগরিষ্ঠ অথচ অর্থনৈতিক সামাজিকভাবে অনগ্রসর মুসলমান সমাজের অগ্রগতির স্বার্থে এই সব আইনের প্রবর্তন ন্যায্য এবং সংগতও ছিল। জমিতে কৃষকদের অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত করার প্রয়োজনে বর্ণহিন্দু জনপ্রতিনিধিদের বাধা সত্ত্বেও চালু করা হয় ১৯৩৮, ১৯৩৯ সালের প্রজাস্বত্ব সংশোধনী আইন, ১৯৩৯ সালে প্রবর্তিত হয় ঋণসালিশী আইন এবং মহাজনি প্রতাপ ও শোষণ খর্ব করার জন্য আইন। এই সব আইনে কৃষকেরা উপকৃত হয়; কৃষকেরা বেশির ভাগই ছিল মুসলমান। কলকাতা পুরসভায় একচ্ছত্র হিন্দু আধিপত্য খর্ব করার জন্য আনা হয় ক্যালকাটা মিউনিসিপাল বিল। উচ্চবর্ণের হিন্দুদের কবলস্থ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের হাত থেকে মাধ্যমিক শিক্ষার নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নেবার লক্ষ্যে এক মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড গঠনের প্রস্তাব নিয়ে বিল পেশ করা হয়। এই সব প্রতিটি উদ্যোগ বর্ণহিন্দু ভদ্রলোকদের স্বার্থে আঘাত করে। বর্ণহিন্দুর স্বার্থ রক্ষায় কংগ্রেস আইনসভার ভিতরে ও বাইরে তীব্র প্রতিরোধের আন্দোলনও গড়ে তোলে। ফলে, অর্থনৈতিক আইনগুলি অনুমোদিত হয়ে গেলেও মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড সংক্রান্ত আইন পাশ হতে পারেনি, কারণ শিক্ষা তো বাঙালি হিন্দু ভদ্রলোকদের একেবারে চোখের মণি। মুসলিম লীগের ডাকা প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবসে কলকাতার হত্যাকাণ্ডের ও নোয়াখালিতে হিন্দু হননের নারকীয় অভিজ্ঞতা ছিলই, অভিঘাত ছিল পূর্ববঙ্গের গ্রামে-শহরে অত্যাচারের হত্যার ধর্মান্তরের নারীধর্ষণের; কিন্তু তারও আগে ছিল মুসলমান নেতৃত্বাধীন মন্ত্রিসভার উদ্যোগে গৃহীত এইসব বর্ণহিন্দু স্বার্থবিরোধ আইনের আঘাত। এই সব অভিঘাতের যৌথ ফল হিসাবে, যে উচ্চবর্ণের হিন্দু ভদ্রলোকেরা ১৯০৫ সালে বঙ্গবিভাজন প্রতিরোধ করেছিল, তারাই ১৯৪৬-৪৭ সালে হয়ে ওঠে বঙ্গবিভাগের সমর্থক।

দেশভাগপূর্বকালে অর্থনৈতিক দাবির সঙ্গে পূর্ববঙ্গে মুসলমান প্রজাদের একটা দাবি ছিল জমিদারের কাছারিতে তাদের মর্যাদা দিতে হবে। মৈমনসিংহ জেলার জনৈক ইংরেজ রাজকর্মচারী জানাচ্ছেন, একটা প্রধান অভিযোগ, হিন্দু জমিদার ও তাদের আমলারা এমনকি সম্পন্ন মুসলমান প্রজাদেরও কাছারিতে বসবার আসন দেয় না। এই অভিযোগের সত্যতা রবীন্দ্রনাথ স্বীকার করেছিলেন। বর্ণহিন্দুর কাছে মুসলমান হচ্ছে যবন, আর নমশূদ্র জল- অচল চণ্ডাল, দুই-ই অস্পৃশ্য। মুসলমান স্পর্শ করলে খাদ্যপানীয় অশুচি হয়ে যায়। দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে এতোটাই সামাজিক দূরত্ব ছিল যে, আত্মজীবনীতে নীরদ সি. চৌধুরী জানিয়েছেন, দ্বিজাতিতত্ত্ব জিন্নাহ্ বা মুসলিম লীগের প্রচারিত তত্ত্ব নয়, ' in truth, it was not a theory at all; it was a fact of history.' যারা জুতো পরে বাড়ির সামনে দিয়ে গেলে জুতোপেটা খেত তারা মসমসিয়ে জুতো পরে এসে কাছারিবাড়িতে চেয়ারে বসছে, এই দৃশ্য প্রাক্তন

ক্ষমতাভোগীদের মনোরঞ্জন করেনি। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরে মুসলমানদের সমকক্ষতার দাবিকে মনে করা হলো, 'most serious socio-cultural affront to the Hindus'। এতদিন যারা ছিল অবজ্ঞাত পদানত তাদের সমকক্ষতার দাবিতে খুব বিচলিত হয়েছিলেন হিন্দু ভদ্রলোকেরা। সমর গুহ তাঁর *Non-Muslims Behind the Curtain of East Pakistan* বইতে লিখেছেন যারা ছিল 'formerly predominant' তারা হয়ে গেল 'socially routed, economically shattered and politically non-existent'। তাদের অস্তিত্ব হয়ে গেল 'precarious'। নোয়াখালির অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে অশোকা গুপ্ত তাঁর স্মৃতিকথা *In the Path of Service*-এ লিখেছেন, 'It was not a fear of life, but of one's social dignity or status that drove many Hindu families to leave their hearth and home and migrate to India.' স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগ দেওয়া মানুষেরাই ছিলেন পূর্ববঙ্গে হিন্দুভদ্রলোকদের নেতৃত্বে। তাঁদের মনে হলো, ইংরেজশাসনের অবসান হলেও তাঁদের পরাধীনতা ঘুচবে না, মুসলমানদের অধীনতা মেনে থাকতে হবে তাঁদের। যেন অন্য সম্প্রদায়ের করুণার উপর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে তাঁদের। এই সব ভাবনা মনের মধ্যে কাজ করছিল। তার সঙ্গে যোগ হলো মোল্লা ও সাম্প্রদায়িক রাজনীতিবিদ্‌দের প্রচার, নবোদিত মুসলমান মধ্যশ্রেণীর উশ্‌কানি, গুণ্ডাশ্রেণীর লোকেদের বদমাইশি। ফলে হিন্দু ভদ্রলোকদের ভিটেত্যাগ শুরু হলো। এতদিনের ঘৃণা অবজ্ঞার বদলা নেওয়া যখন আরম্ভ হলো, তখন মন্দির ভাঙা হলো, দেবমূর্তি অশুচি করা হলো, মেয়েদের নিরাপত্তা অনিশ্চিত হয়ে গেল। আর উচ্চবর্ণের হিন্দুরা দ্রুত দেশ ছাড়তে আরম্ভ করলো জমি ছেড়ে, বাড়ি ছেড়ে, বৃত্তি ছেড়ে। জমি-জমিদারি হিন্দুর, চাকরি হিন্দুর, উকিল মহাজন মাস্টার ডাক্তার সব হিন্দু। জমি ছেড়ে, পদমর্যাদা ছেড়ে এবারে পথে নামতে হলো হিন্দু ভদ্রলোকদের। দেশভাগকালে পাঞ্জাবের সমান বীভৎস রক্তাক্ত হিংস্রতা বাংলায় হয়নি। তবে একেবারে হয়নি তাও নয়। এখানে হিংসার চেয়েও হিংসার গুজবের ভূমিকা ছিল বেশি। ধর্মান্তরের ভয়, মেয়েদের সম্ভ্রমহানি নিয়ে উদ্বেগ ছিল হিন্দুদের দেশ ছাড়ার বড়ো কারণ। কিন্তু বাঙালি হিন্দু ভদ্রলোকের পূর্ববঙ্গ ত্যাগ করেছিল মর্যাদাহানি এবং ক্ষমতাচ্যুতির কারণে প্রধানত।

জননীকল্প গ্রামের স্থিতিশীল জীবনযাপন ছেড়ে, শ্রদ্ধাশীল প্রজাদের শ্রমে নিশ্চিন্ত জীবনযাপন ছেড়ে এই যে ভদ্রলোকদের চলে আসতে হলো, তাতে ছিল এক 'stunned disbelief'। সেই গৃহকাতরতা, হতচকিত বিমূঢ়ভাব, 'sense of tragedy' এবং 'sense of trauma' রূপায়িত হয়েছে দেশভাগের বাংলা আখ্যানে। পবিত্রতা ও সৌন্দর্যের প্রতীক গ্রামগুলি থেকে, যেন স্বর্গ থেকে, ভদ্রলোকদের ঘটেছিল জবরদস্তি প্রস্থান। তুলসী লাহিড়ীর 'বাংলা মাটি' নাটকে অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারী কালীবাবু গোড়ায় পূর্ব পাকিস্তানে থেকে যাবার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। পাঁচ বছরের মধ্যে এই সিদ্ধান্তের ঔচিত্য বিষয়ে তার মনে সংশয় জন্মায়। কারণ প্রজা

গরিবুল্লা এখন আর মান্য করে না, ভদ্রলোকদের সুপ্রতিষ্ঠ সুশৃঙ্খল জগৎ ভেঙে পড়ছে। দেশভাগে পূর্ববঙ্গে মুসলমান মধ্যশ্রেণী লাভবান হয়েছিল মোটের উপর, সেই কারণে দেশভাগের যন্ত্রণা নিয়ে পূর্ববঙ্গে বিশেষ উল্লেখযোগ্য কথাসাহিত্য রচিত হয়নি। কিন্তু বাংলা ভাগে পূর্ব থেকে পশ্চিমে উদ্বাস্তু হয়ে আসা হিন্দু মধ্যশ্রেণী বিপর্যস্ত হয়েছিল। সেই তাদের বিপর্যয় নিয়েই দেশভাগের আখ্যান এই বাংলায় লেখা হয়েছে। বাঙালির ইতিহাসে সবচেয়ে মর্মান্তিক ঘটনা যে বঙ্গবিভাজন তা নিয়ে যে স্তরের সাহিত্য লেখা উচিত ছিল তা লেখা হয়নি, কিন্তু যতোটুকু লেখা হয়েছে সে হয়েছে ভদ্রলোকের অভিজ্ঞতার কথা, মধ্যশ্রেণীর কথা 'আমাদের' কথা। আমাদের কথাই লেখা হয়েছে সাবিত্রী রায়ের 'স্বরলিপি'তে, জীবনানন্দের 'জলপাইহাটি'-তে, অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে' উপন্যাসে, জ্যোতির্ময়ী দেবীর গল্পে আখ্যানে। এই আমাদের কথাই আছে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'অর্জুন' এবং 'পূর্ব- পশ্চিম' উপন্যাসে। নারায়ণ সান্যালের 'বল্মীক' উপন্যাসে হরিপদ মাস্টারের পরিবারের কথা। 'বকুলতলা পি. এল. ক্যাম্প'-এর কুসুম ও কমলা নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়ে। শঙ্খ ঘোষের 'সুপুরিবনের সারি'-তে, শান্তা সেনের 'পিতামহী'-তে অমিতাভ ঘোষের ইংরেজি উপন্যাস *The Shadow Line*'- এ, অভিজিৎ সেনের 'স্বপ্ন ও অন্যান্য নীলিমা'-য় এদেরই কথা। এই আমাদের মতো মধ্যশ্রেণীর মানুষের কথা পেয়ে যাব রমেশচন্দ্র সেন, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, দিনেশচন্দ্র রায়, দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় দেবেশ রায়, অমর মিত্রের ছোটগল্পে।

পূর্ববঙ্গে যেমন মুসলমান কৃষিজীবীরা, মৎস্যজীবীরা, কারিগরেরা তেমনি গতরে-খাটা নিম্নবর্ণের হিন্দুরা, বর্ণহিন্দু ভদ্রলোক-সম্প্রদায়ের দ্বারা উপেক্ষিত ও শোষিত ছিল। উচ্চবর্ণের শোষণ ও অবজ্ঞার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হিসাবে নমশূদ্র আন্দোলন শুরু হয় ১৮৭২-৭৩ খ্রিস্টাব্দে। শোষিত ও অবজ্ঞাত নিম্নবর্ণের হিন্দু আর মুসলমানের মধ্যে ঐক্য গড়ে ওঠা স্বাভাবিক ছিল। প্রথম বঙ্গভঙ্গের আমল থেকেই এই ঐক্য গড়ে তোলার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। নমশূদ্র সম্প্রদায়ের নেতা গুরুচাঁদের পুত্র শশিভূষণ এই উদ্দেশ্যে ঢাকা নবাব সলিমুল্লাহ্‌র সঙ্গে যোগাযোগও করেছিলেন। শেখর বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন ' The alliance between the two communities was viewed as a combination of two social underdogs, equally despised and exploited by the highcaste Hindu gentry.'' ভদ্রলোকদের পত্রিকায় মাঝে মাঝেই অভিযোগ করা হচ্ছিল, মুসলমানেরা আর নমশূদ্ররা ভদ্রলোকদের বিরুদ্ধে একত্রিত সংঘবদ্ধ হচ্ছে। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নমশূদ্ররা মুসলমানদের সঙ্গে সহযোগিতা করায় বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশক থেকে মূলত উচ্চবর্ণের হিন্দুদের প্রতিনিধি জাতীয় কংগ্রেস অখণ্ড বাংলায় ক্ষমতাচ্যুত ছিল। "নমশূদ্র কৃষকদের ব্যবহারের মধ্য দিয়ে যেটা সব সময়ই প্রকাশ পেত তা হলো আর্থিক

শোষণমুক্তি আর সামাজিক সম্মানলাভের ঐকান্তিক ইচ্ছা।" এই ইচ্ছা থেকে তারা শোষিত মুসলমান কৃষকদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছিল। রজতকান্ত রায় জানাচ্ছেন, " The rural Hindu gentry, greatly outnumbered by a restive Muslim and Namasudra peasantry. were in a state of seige.'' পরবর্তীকালে ড অম্বেডকর তাঁর *Pakistan or the Partition of India* পুস্তিকায় প্রস্তাব দিয়েছিলেন, হিন্দু সমাজের সব নিম্নশ্রেণীর মানুষ নাগরিক অধিকার ও সামাজিক সংগ্রামের মর্যাদার জন্য মুসলমান সম্প্রদায়ের সঙ্গে হাত মিলিয়ে হিন্দু উচ্চবর্ণের বিরুদ্ধে সংগ্রামের লিপ্ত হোক। বাংলাভাগের আগে যিনি ছিলেন তপশিলী হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রধান নেতা সেই যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল মুসলিম লীগের সঙ্গে তপশিলভুক্ত নিম্নবর্ণীয় হিন্দু রাজনৈতিক ঐক্য প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হয়েছিলেন। পাকিস্তান কায়েম হওয়ার সময় এই নিম্নবর্ণীয় হিন্দুদের সমর্থনের জন্য মুসলিম লীগ এক অভিন্ন স্বার্থের কথা বলেছিল। মুসলমান সম্প্রদায়ের প্রতি যেমন, তেমনি নিচুজাতের হিন্দুর প্রতি মুসলিম লীগের ওয়াদা ছিল নিপীড়ন অবসানের। কিন্তু সেই প্রতিশ্রুতি বজায় থাকেনি, সেই ওয়াদা টেকেনি। চল্লিশের দশকের গোড়া থেকে ঘটে যাওয়া হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গাগুলি ছিল আসলে মুসলমানদের সঙ্গে নমশূদ্রদের দাঙ্গা। এই সময় তপশিলী সম্প্রদায়ের মধ্যে হিন্দুত্ববোধ জাগানোয় সচেষ্ট হয় ভারত সেবাশ্রম সংঘ, হিন্দু মহাসভা ইত্যাদি। পরবর্তীকালের নোয়াখালির অভিজ্ঞতায় ও কলকাতার দাঙ্গার ফলে তপশিলী সম্প্রদায়ের মানুষ মুসলমান সম্প্রদায়ের প্রতি আস্থা হারিয়ে ফেলে। যোগেন্দ্রনাথ ক্রমে নিজের সম্প্রদায়ের মধ্যে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে থাকেন এবং তপশিলী সম্প্রদায়ের মধ্যে এই সময় যোগেন্দ্রবিরোধী নেতৃত্ব শক্তিশালী হয়ে উঠতে থাকে। এবং সেই নেতৃত্ব কংগ্রেসের সঙ্গে হাত মেলায়। দেশভাগের সিদ্ধান্তের সময় ত্রিশজনের মধ্যে পঁচিশ জন তপশিলভুক্ত সম্প্রদায়ের জনপ্রতিনিধি বিধানসভায় উচ্চবর্ণের হিন্দুদের সঙ্গে একত্রে বঙ্গবিভাজনের পক্ষে ভোট দিয়েছিলেন। তা সত্ত্বেও গোড়ার দিকে কিন্তু এই নিম্নবর্ণের হিন্দুরা কৃষিজীবী-মৎস্যজীবী 'ওরা' দেশ ছাড়েনি। ১৯৪৯ সাল পর্যন্ত যারা পূর্ববঙ্গ ত্যাগ করেছিল, নীলাঞ্জনা চ্যাটার্জির হিসাব মোতাবেক, তাদের শতকরা ষাটজনই ছিল অকৃষিজীবী। কিন্তু সম্পন্ন বা মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক হিন্দুরা দেশত্যাগ করায় নমশূদ্র অথবা নিম্নবর্গীয় হিন্দুদের বলভরসা চলে যায়। জমিদার-তালুকদার, উকিল-মাস্টার ডাক্তার বাড়ি খালি হয়ে যেতে চাষি, ধোপা, নাপিত, কুমোর-কামার-জেলে নিরাশ্রয় বোধ করতে থাকে। আগের ওয়াদা ভুলে মুসলিম লীগ তাদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে। অশোকা গুপ্ত তাঁর 'নোয়াখালির দুর্যোগের দিনে' পুস্তিকায় গান্ধিবাদী ঠক্কর বাপ্পার উক্তি উদ্ধৃত করেছেন, "তপশিলী হিন্দুরা পরিশ্রমী শান্তিপ্রিয় ও ধর্মভীরু। সবচেয়ে মর্মান্তিক আঘাত এরা পেয়েছিল ধর্মান্তরিত করায় ও মেয়েদের সম্ভ্রমহানিতে।" নমশূদ্র সম্প্রদায়ের বসতি ছিল বরিশাল, ফরিদপুর, ঢাকা, মৈমনসিংহ, যশোর খুলনা জেলায়। দেশভাগের নিজস্ব ভূখণ্ড

হারালো তারা, হারালো সংহত রাজনৈতিক শক্তি, ছড়িয়ে পড়লো শ্রমমাত্রসম্বল এই মানুষগুলি ভারতের নানান প্রান্তে।

ভারতে চলে এল নমশূদ্র ও অন্যান্য লক্ষ লক্ষ তপশিলভুক্ত হিন্দু পূর্ববঙ্গ/ পূর্ব পাকিস্তান থেকে। এদেশে বাড়ি কেনার, বাড়ি বিনিময় করার বা বাড়ির ভাড়া নেবার সংস্থান তাদের ছিল না। এদেশে এমন কোন আত্মজন ছিল না যার কাছে আশ্রয় নিতে পারে। যেসব উদ্বাস্তু কলকাতার দক্ষিণে বা দমদমে সরকারি বা বেসরকারি জমিতে জবরদখল কলোনি গড়ে তুলেছিল তারাও বেশির ভাগ ছিল ভদ্রলোক শ্রেণীর মানুষ। ছিন্নমূল নিম্নবর্ণের মানুষের প্রথম আশ্রয় হলো শেয়ালদা অথবা অন্য কোনও রেলস্টেশনের প্লাটফর্মে, অথবা ধুবুলিয়া-রাণাঘাটের মতো কোনও ক্যাম্পে। তাদেরই পরে ঢোল বন্ধ করে জোর করে পাঠানো হলো নৈনিতালে, আন্দামানে কিংবা দণ্ডকারণ্যে। উদ্বাস্তু মানুষদের একজন সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় লিখেছেন, "আমি আন্দামানের রিফিউজি কলোনিগুলোও দেখেছি। দণ্ডকারণ্য-মালকানগিরির বহুজনের সঙ্গে কথা বলেছি, তাদের মধ্যে একজনও ঘোষ-বোস-মিত্তির-চ্যাটার্জি-ব্যানার্জি গাঙ্গুলি নেই। সেইজন্য কি এত অবজ্ঞা?" যাদবপুর, দমদম, বেলঘরিয়া ইত্যাদি অঞ্চলের জবরদখল কলোনির পূর্ববঙ্গীয়রা এখন আর রিফিউজি নয়। তথাকথিত নিম্নবর্ণের যারা তাদের ঠেলে পাঠানো হয়েছে দূরদুর্গম অঞ্চল। তারা প্রান্তিক মানুষই থেকে গেছে। বাংলা আখ্যানে তবু উদ্বাস্তু ভদ্রজনের কথা কিছু বলা হয়েছিল, কিন্তু এই সব প্রান্তিক অন্ত্যজ জনগোষ্ঠীর কথা, নিম্নবর্গীয় তপশিলভুক্ত বাঙালি হিন্দু উদ্বাস্তুর কথা, 'ওদের' কথা বাংলাসাহিত্যে বলা হলো না। *Economic and Political*

প্ররোচনামূলক প্রচার করতে থাকেন, উদ্বাস্তুদের আন্দামানে পাঠানো চলবে না। সব শরণার্থীকে পশ্চিমবঙ্গেই পুনর্বাসিত করতে হবে। উদ্বাস্তুদের পশ্চিমবঙ্গের বাইরে পাঠানোর প্রস্তাবের বিরুদ্ধে জননেতা এবং বুদ্ধিজীবীরা জনমত গড়ে তোলেন। ১৯৫০ সালে Bengal Rehabilitation Organisation-এর হিশেব অনুসারে পশ্চিবঙ্গের ১৫ লক্ষ একর জমি আছে যেখানে পুনর্বাসন হতে পারে, কৃষিকাজ হতে পারে। অর্থনীতিবিদ্ রাধাকমল মুখোপাধ্যায় দেখালেন অসমে ১৭৩ লক্ষ একর, বিহারে ৬৫ লক্ষ এবং পশ্চিমবঙ্গে ২৮ লক্ষ একর জমি আছে যেখানে পূর্ববঙ্গ আগত কৃষকেরা পুনর্বাসিত হতে পারে ও কৃষিকাজ করতে পারে। বাইরে পাঠালে তাদের শারীরিক মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে হবে আত্মিক মৃত্যু। তারা তাদের ভাষা ও সংস্কৃতি অক্ষুণ্ণ রাখতে পারবে না। একদা কম্যুনিস্ট নিখিল মৈত্র 'জনসেবক' পত্রিকায় আন্দামানে পুনর্বাসনে অখণ্ড কম্যুনিস্ট পার্টির বাধা দেওয়ার কাহিনী সবিস্তারে লিখেছিলেন। এই আন্দামানে চলে যাওয়া মানুষের কথা বাংলাসাহিত্যে নেই বললেই চলে। ব্যতিক্রম প্রফুল্ল রায়ের 'নোনাজল মিঠেমাটি' উপন্যাস, কিছু ছোটগল্প। প্রফুল্ল রায়ের উপন্যাসটিতে জাহাজ থেকে নেমে ডেলা পাকিয়ে বেলাভূমিতে বসে থাকে ভীত জর্জরিত নিঃস্ব একদল মানুষ। রহস্যময় চরিত্র পালসাহাব এদের অভিভাবক। তাঁর নির্দেশে এরা প্রথমে ট্রানজিট ক্যাম্পে স্থান করে নেয়। পরে এই হৃদয়বান মানুষ তাদের জন্য চাষের ও বসবাসের জমি বন্দোবস্ত করে দেয়। 'পদ্মা-মেঘনা-ধলেশ্বরী পারের মাটি হারিয়ে এসেছে মানুষগুলো। বঙ্গোপসাগর পাড়ি দিয়ে উত্তর আন্দামানের এই দ্বীপে আবার তারা মাটি পেল।' এই সোনার মাটিতে, বাহারের মাটিতে, দাঙ্গায় উপর্যুপরি ধর্ষিতা, কাপাসীর সঙ্গে হারানের মিলন হয়। পঙ্গু হরিপদর স্ত্রী তিলির গর্ভে যোগেনের সন্তান আসে। এই সন্তান বৈধ বা অবৈধ এই প্রশ্ন অবান্তর হয়ে যায়, বড়ো হয়ে ওঠে এই দ্বীপে মানুষ জন্মেছে এই কথাটা। 'সুখে-দুঃখে-প্রেমে আর প্রাণের তাপে' মানুষেরা এখানে 'উপনিবেশ গড়ে তুলেছে।' এই আন্দামানে উপনিবেশ-গড়া মানুষেরা যেন তারা অন্তর্ধান করে গেল বাঙালির চৈতন্য থেকে। বাঙালি শরণার্থীদের পুনর্বাসনের জন্য মধ্যপ্রদেশ, ওড়িশা ও অন্ধ্রের প্রাচীন বনাঞ্চলে কেন্দ্রীয় সরকার গড়ে তোলে দণ্ডকারণ্য প্রোজেকট। কেন্দ্রীয় সরকারের পুনর্বাসন বিভাগ প্রকাশিত ইউ, ভাস্কর রাও লিখিত *The Story of Rehabilitation* বইতে দাবি করা হয়, "Dandakaranya is the pride of Rehabilitation Ministry, the most enduring monument to its dedicated labours—and the biggest. As an experiment in resettlement, it is, perhaps, the most ambitious of its kind in the world today." উদ্বাস্তুরা অবশ্য মনে করত দণ্ডকারণ্যে তাদের অবস্থা পাকিস্তানের চেয়েও খারাপ। দণ্ডকারণ্য উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের প্রাক্তন প্রধান শৈবালকুমার গুপ্ত জানিয়েছেন, দণ্ডকারণ্যের জমি পাথুরে, কৃষিকাজের অনুপযুক্ত। বংশপরম্পরায় যারা ছিল কৃষক, সেই সব বাঙালি উদ্বাস্তুকে ওড়িশা ও

মধ্যপ্রদেশ সরকার রাস্তা ও সেচব্যবস্থা গড়ে তোলার কাজে জনমজুর হিসেবে ব্যবহার করেছিল। শৈবালকুমার গুপ্তের স্ত্রী সমাজসেবিকা অশোকা গুপ্ত *In the Path of Sarvice* গ্রন্থে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে জানিয়েছেন যারা নদীর সংসর্গে আর জলে মানুষ, তাদের এনে ফেলা হলো এমন জায়গায় যেখানে জল নেই, বৃষ্টিপাত বিরল। জনৈক গবেষকের মতে যারা ছিল 'deeply anchored in the unique ecological setting of their deltaic homeland' তাদের এনে ফেলা হলো অন্ধকার অরণ্য আর কঠিন পাহাড়ের অপরিচিত ভৌগোলিক এলাকায়। এই 'arid and difficult' ভূখণ্ডে প্রতিষ্ঠিত দণ্ডকারণ্য প্রোজেকটে ছিল 'terrible lack of infrastructure' এবং শরণার্থীদের রাখা হয়েছিল যেন 'concentration camp'- এ। আর এই অরণ্য অঞ্চল ছিল প্রাচীন জনজাতির আদি নিবাস। তারা বহিরাগতদের এই উপস্থিতি একেবারেই পছন্দ করেনি। এখানে জঙ্গল কেটে নতুন জমি উদ্ধার করে গড়ে উঠেছিল উদ্বাস্তুদের গ্রাম। সেই লড়াইয়ের কথা লিখেছেন নারায়ণ সান্যাল 'অরণ্যদণ্ডক' উপন্যাসে। না হতে পারে সাহিত্য হিসেবে উঁচুমানের তবু এই একটিমাত্র উপন্যাসে আমরা পাই দণ্ডকারণ্যে পুনর্নির্বাসিত নিম্নবর্গের বাঙালির কথা।

নিম্নবর্গের নিম্নবর্ণের মানুষের প্রতি রাষ্ট্রীয় হৃদয়হীনতার ও বাংলা সাহিত্যের নীরবতার একটি উদাহরণ সবিস্তারে না দিয়ে পারছি না। শরণার্থীদের দণ্ডকারণ্যে পাঠানোর বিরোধিতা করেছিল কম্যুনিস্ট নেতৃত্বাধীন UCRC। ১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বরে সমর মুখোপাধ্যায় কেন্দ্রীয় পুনর্বাসনমন্ত্রী খাদিলকরকে জানান, পশ্চিমবঙ্গেই বিশেষ করে সুন্দরবন অঞ্চলে উদ্বাস্তুরা পুনর্বাসিত হতে চায়। ১৯৭৫ সালের ২৫ জানুয়ারি তারিখে, জ্যোতি বসু ভিলাইতে সভা করেন এবং সেখানকার উদ্বাস্তু নেতাদের ডাকিয়ে বলেন, ক্ষমতার এলে তাঁরা উদ্বাস্তুদের পশ্চিমবঙ্গে, ফিরিয়ে নিয়ে আসবেন। বামপন্থীদের পাশাপাশি অন্যেরাও শরণার্থীদের দণ্ডকারণ্যে বা বহির্বঙ্গে পাঠানোর বিরোধিতা করেছিলেন। যেমন পূর্ববঙ্গ রিলিফ কমিটির সভাপতি বিজ্ঞানী মেঘনাদ সাহা। কম্যুনিস্টরা যে বাংলার বাইরে উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন চায়নি তার একটা দীর্ঘমেয়াদি কারণ ছিল। কম্যুনিস্ট নেতৃত্ব বুঝেছিল এই declassed উদ্বাস্তুরা হয়ে উঠতে পারে, তাদের ভোটব্যাংক। বস্তুত তারাই পশ্চিমবঙ্গে বামপন্থীদের পক্ষে ক্ষমতার ভারসাম্য বদলে দিয়েছিল।

আগে সকলেই বলেছিলেন, পশ্চিমবঙ্গে বিশেষ করে সুন্দরবনে উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের যোগ্য যথেষ্ট জমি আছে। আবার সব সরকারই একই রকম ভাবে ক্ষমতা প্রয়োগ করে বা অপপ্রয়োগ করে। শৈবালকুমার গুপ্ত তাই মন্তব্য করেছেন, "ক্ষমতা পেলে কংগ্রেস বা কমিউনিস্ট দলে কোন তফাত থাকে না। দু পক্ষই ঘাড় থেকে আপদ বিদায় করতে পারলে বাঁচে।" 'পূর্ব-পশ্চিম' উপন্যাসের দ্বিতীয় খণ্ডে ঔপন্যাসিক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় মন্তব্য করেন, 'কিন্তু বিরোধীপক্ষে থাকা আর সরকারপক্ষে থাকার মধ্যে অনেক তফাত ঘটে যায়।' ১৯৭৫ সালের জুন মাসে দণ্ডকারণ্য ও অন্যান্য

জায়গা থেকে উদ্বাস্তুরা পশ্চিমবঙ্গের দিকে রওয়ানা হলে কংগ্রেসের মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থশংকর রায় ব্যবস্থা নেন যাতে তারা কিছুতেই হাওড়া পর্যন্ত পৌঁছতে না পারে। পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট জমানা শুরু হলে, বামপন্থীদের বিরোধীপক্ষে থাকাকালীন কথায় ভুলে, বামফ্রন্টের অন্তর্গত দু-একটি খুচরো দলের মন্ত্রীর প্ররোচনায়, বহু উদ্বাস্তু দণ্ডকারণ্য থেকে পশ্চিমবঙ্গে চলে আসে। ১৯৭৮ সালের জানুয়ারি-জুন মাসে ১৪, ৩৮৮ পরিবার অর্থাৎ ১,২০,০০০ মানুষ তাদের সব বিক্রি করে পশ্চিমবঙ্গের উদ্দেশে রওয়ানা হয়। তারা বলে 'their love for West Bengal in alive as their hope about Dandakaranya is dead.' মানা ক্যাম্পগুচ্ছেই প্রথম মরিচঝাঁপি অভিযানের আন্দোলন শুরু হয়। উদ্বাস্তু উন্নয়নশীল সমিতির নেতৃত্বে শরণার্থীরা জড়ো হয়, হাসনাবাদে, তাদের লক্ষ্য সুন্দরবনের ৩৯ মাইল দীর্ঘ, ৮ মাইল চওড়া মরিচঝাঁপি দ্বীপ। বিশেষত, খুলনা জেলা থেকে আগত উদ্বাস্তুরা সুন্দরবনে পুনর্বাসিত হতে চায়। বিংশ শতাব্দীর গোড়ার ইংরেজরা এই খুলনা জেলা থেকেই মানুষ এনেছিল সুন্দরবনের জঙ্গল পরিষ্কারের জন্য। সেখানে তাদের আত্মীয়পরিজনেরা আগে থেকেই আছে বলে খুলনার উদ্বাস্তুরা সুন্দরবনে উপনিবেশ স্থাপনে আগ্রহী ছিল। অপরিচিত দণ্ডকারণ্যে তারা থাকতে চায়নি। এরা এবং অন্যান্যরা স্রোতের মতো পশ্চিমবঙ্গে চলে এলে কঠোর সরকারি বাধার সম্মুখীন হয়। শরণার্থীদের ফেরত পাঠানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়, স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলিকেও শরণার্থীদের সাহায্য করার কাজে বাধা দেওয়া হয়। ত্রিশ হাজার মরিয়া উদ্বাস্তু মানুষ সরকারি বাধা উপেক্ষা করে সুন্দরবনের মরিচঝাঁপিতে সরকারি সাহায্য ব্যতিরেকে এক আদর্শ উপনিবেশ নিজেদের শ্রমে গড়ে তোলে। কেন্দ্রীয় সরকারের একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী সন্তোষকুমার মল্লিকের জবানে উদ্বাস্তুরা বলে, "আমরা কারো বোঝা হয়ে থাকব না। আমরা সম্পদ সৃষ্টি করব। এই ছোট মরিচঝাঁপি দ্বীপেই আমরা লক্ষাধিক লোকের জীবিকার সংস্থান করতে পারব এবং পশ্চিমবাংলার বনসম্পদ আমরা বৃদ্ধি করে দেব।" তারা বাঁধ দিয়ে মাছের চাষ করে, ইস্কুল-স্বাস্থ্যকেন্দ্র করে, টিউবওয়েল বসায়।

দণ্ডকারণ্য থেকে আবার ছিন্নমূল হয়ে আসা মানুষগুলির সঙ্গে মিলেছিল প্রতিবেশী দ্বীপ—সাতজেলিয়া কুমিরমারি, ঝড়খালির বাসিন্দারা। দুই তরফে ছিল 'fraternal bonding'। দ্বীপবাসীরা দণ্ডকারণ্য-আগত উদ্বাস্তুদের মধ্যে দেখেছিল নেতৃত্ব দেবার ক্ষমতা, অধিকার অর্জনের জন্য লড়াইয়ের ক্ষমতা। এরা ছিল অনেক বেশি বলিয়েকইয়ে, তাদের মধ্যে ছিল কলকাতার শাসকশ্রেণীর মুখোমুখি হওয়ার মতো নৈতিক সাহস। প্রতিবেশী দ্বীপসমুহের বাসিন্দারা বিস্মিত হয়ে দেখেছিল যে উন্নয়ন তাদের জীবনে ঘটেনি দণ্ডকারণ্য-প্রত্যাগত উদ্বাস্তুরা কয়েক মাসের মধ্যে তা মরিচঝাঁপিতে ঘটাতে পেরেছে। কিন্তু এই স্বাবলম্বী উপনিবেশ থেকে নরনারীদের উৎখাতে নেমে আসে সরকারি দমনক্রিয়া। কলকাতার ভদ্রলোকদের বিবেকের কাছে গ্রহণযোগ্য করার জন্য উৎখাতের যুক্তি হয়, পরিবেশ সংরক্ষণের, বনরক্ষা আইন

লঙ্ঘনের। মরিচঝাঁপিতে আশ্রয় নেওয়া মানুষের বিরুদ্ধে নির্জলা মিথ্যা প্রচার শুরু করা হয়। তারা নাকি হোমল্যান্ড দাবি করছে, পালটা সরকার গঠন করেছে। ১৯৭৯ সালের ফেব্রুয়ারিতে মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু জানান, 'কোন সরকার নিজের এলাকার মধ্যে কোনও সমান্তরাল সরকারকে বরদাস্ত করতে পারে না।' বিনয় চৌধুরীর মতো মানুষও বলেন মরিচঝাঁপি উদ্যোগের পিছনে বিদেশী চক্রান্ত আছে। তারা নাকি বাংলাদেশের সঙ্গে চোরাচালানে লিপ্ত, তারা বাকি বনসম্পদ নষ্ট করছে। অথচ সেখানে জ্বালানিযোগ্য আগাছা ছাড়া কোনও বনসম্পদ ছিল না। তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ তারা ব্যাঘ্রপ্রকল্পের ক্ষতি করছে। এই শেষ অভিযোগ বিষয়ে একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন তুলেছিলেন শৈবালকুমার গুপ্ত। তাঁর জিজ্ঞাসা, "যেখানে গাছপালা নেই এবং ষাট সত্তর বৎসরের মধ্যেও এমন গহন অরণ্য গড়ে ওঠবার সম্ভবনা নেই, যেটা বাঘের ও তার আহার্য শিকারের বিচরণস্থান হতে পারে, সেখানে সুদুর ভবিষ্যতের ব্যাঘ্রপ্রজনন বৃদ্ধির অজুহাতে ছিন্নমূল মানুষের বর্তমান প্রয়োজন অগ্রাহ্য করা যায় কোন যুক্তিতে?" হঠাৎ কেন মানুষের চেয়ে বাঘ দামি হয়ে উঠলো জনদরদি বামপন্থীদের কাছে কে জানে।

এই উদ্বাস্তুদেব বিরুদ্ধে বামফ্রন্ট সরকারের আরও অভিযোগ তারা সরকারি জমি জবরদখল করেছে। কলকাতার আশেপাশে কলোনিসমূহ গড়ে উঠেছিল সরকারি ও বেসরকারি জমি বেআইনিভাবে দখল করে এবং সেই কাজে সেদিন মদত জুগিয়েছিল বামপন্থীরাও। কিন্তু সেই সব জবরদখলকারীরা ছিল প্রধানত উচ্চবর্ণের হিন্দু আর তাদের প্রভাবজাল বিস্তারিত ছিল যেমন বিরোধীপক্ষে, তেমনি সরকারিপক্ষের লতাপাতায়। তাই উপরতলার ভদ্রলোক হিন্দুদের সেইসব জবরদখল বৈধ হয়ে গিয়েছিল বামপন্থীদের আন্দোলনের চাপে এবং সরকারপক্ষের নমনীয়তায়। এখন যে সেই বামপন্থীরাই মন্ত্রীসভায় শোভমান হয়ে মরিচঝাঁপির উদ্বাস্তুদের বিরুদ্ধে অবৈধ জবরদখলের অভিযোগ আনলেন তার কারণ, এই উদ্বাস্তুরা 'আমরা' নই, 'ওরা', তপশিলভুক্ত সম্প্রদায়ের মানুষ, প্রধানত নমশূদ্র। ভারতীয় বংশোদ্ভূত কানাডার গবেষক রস্ মল্লিকের ১৯৯৯ সালের ফেব্রুয়ারিতে *The Journal of Asian Studies*-এ প্রকাশিত Refugee Resettlement in Forest Reserves: West Bengal Policy Reversal and the Marichjhapi Massacre প্রবন্ধের ভাষায় এই মানুষগুলি 'untouchable and other marginalized peoples.'। সুতরাং তাদের উৎখাত করতে অসংকোচে পুলিশ কাঁদানে গ্যাস ও গুলি চালাতেই পারে। ১৯৭৯ সালের ৩১ জানুয়ারি পুলিশের গুলি চালনায় ছত্রিশ জনের মৃত্যুর হয়। যদিও তিনশো রাউন্ড গুলি চলেছিল, হিসেবের কারচুপি করে দেখানো হয় অনেক কম। যখন আত্মরক্ষা ছাড়া আর কিছুই জানে না বুলেট তখন 'তিন রাউণ্ড গুলি খেলে তেইশজন মরে যায় লোকে এত বজ্জাত হয়েছে।' অন্য-অন্য ভাবে মারা যায় পাঁচশো মানুষ। উদ্বাস্তুদের দেশি নৌকার বিরুদ্ধে নৌযুদ্ধে স্টিমার লঞ্চ লেলিয়ে দেওয়া যায়,

জল ও খাবার সরবরাহ বন্ধ করা যায়, অর্থনৈতিক অবরোধ ঘটনো যায়। তাদের মনোবল ভেঙে দেওয়া গেছে স্রেফ ক্ষুধার অস্ত্রে। জমির লোভ দেখিয়ে পুলিশের সহযোগী হিশেবে পার্টির ক্যাডারবাহিনীকে লেলিয়ে দেওয়া যায়, তাদের স্বপ্ন দিয়ে গড়া কুঁড়েঘরগুলিকে আগুনে পুড়িয়ে দেওয়া যায়। মরিচঝাঁপি নিয়ে পান্নালাল দাশগুপ্তের লেখা 'যুগান্তর'-এ এক কিস্তির পরে ছাপানো বন্ধ হয়ে যায়, সাংবাদিকদের ঐ দ্বীপে যেতে বাধা দেওয়া হয়,হাইকোর্টের নির্দেশ অমান্য করা হয়, পুলিশের গুলিতে মৃতদের জলে ভাসিয়ে দেওয়া হয়। আন্নু জালাইস তাঁর প্রবন্ধে বলেছেন, প্রতিবেশী দ্বীপগুলির মানুষের ধারণা, পুলিশের গুলিতে মৃত, জলে ভাসানো, মানুষদের মৃতদেহের মাংস খেয়েই সুন্দরবনের বাঘেরা মানুষ-খেকো হয়ে উঠেছে। মরিচঝাঁপিতে আক্রমণ ও প্রতিরোধের গোলমালে বিরক্ত হয়েই বাঘেরা মানুষদের আক্রমণ করতে শুরু করে। সত্য-মিথ্যা সে যাই হোক, কলকাতাস্থ ভদ্রসমাজের কাছে এই মানুষগুলি ছিল নিতান্ত বাঘের খাদ্য—এরা 'disposable people' বর্জনযোগ মানুষ। সমস্ত অভিযান শেষে তৎকালীন তথ্যমন্ত্রী সাংবাদিকদের জানান, মরিচঝাঁপি এখন শরণার্থীশূন্য। যেন পশ্চিমবঙ্গ এখন জীবাণুমুক্ত! চলে আসা চোদ্দ হাজার পরিবারের মধ্যে দশ হাজার পরিবার আবার দণ্ডকারণ্যে ফিরে যায়। চার হাজার পরিবারের মানুষেরা হয় মরে গেল, অথবা বারাসতে গোবরডাঙায় বনগাঁয় ঝুপড়িতে থেকে গেল অথবা জনারণ্যে হারিয়ে গেল। দেশভাগে ছিন্নমূল 'ওদের' কথা কীভাবে নৈঃশব্দের অন্তরালে হারিয়ে গেছে তা জানাতেই মরিচঝাঁপি নিয়ে এত কথা লিখতে হলো।

এই মরিচঝাঁপির আখ্যানও বাংলা-বিভাজনের উত্তরকালীন কথা। বামপন্থী সরকার ক্ষমতার দোর্দণ্ড প্রতাপ দেখিয়ে নিম্নবর্গীয়, নিম্নবর্ণীয় বলে ছিন্নমূল মানুষগুলিকে শ্রম দিয়ে গড়া উপনিবেশ থেকে আবার উৎখাত করতে পেরেছিল। আর নিম্নবর্গীয় নিম্নবর্ণীয় বলে দু-চারজন বিবেকবান সাংবাদিকের প্রতিবেদন বাদে 'ওদের' কথা বাংলা সাহিত্যে প্রায় অকথিত থেকে যায়। রাষ্ট্রিক উৎখাত আর সাহিত্যিক নীরবতা একই মুদ্রার দুই পিঠ। যতোদিন রাষ্ট্রিক ক্ষমতা উচ্চবর্ণের হাতে থাকবে, ততোদিন নিম্নবর্গীয়-নিম্নবর্ণীয় মানুষ রাষ্ট্রীয় উৎপীড়নের শিকার হবে। অথচ উৎপীড়িত মানুষের কথা বলাটা শিল্পের সাহিত্যের দায়। শিল্প হবে ক্ষমতার প্রতিপক্ষ। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত, অনেক সময় শিল্প আর শিল্পী হারিয়ে ফেলে তার-দায়বদ্ধতা। কিন্তু কালের সাক্ষী দুজন কবি মরিচঝাঁপির নিপীড়িত মানুষগুলির কথা না বলে পারেন না। মরিচঝাঁপির ঘটনা নিয়ে সুভাষ মুখোপাধ্যায় লেখেন 'ঠাকুমার ঝুলি' কবিতা। উদ্বাস্তুরা,

এ-দুয়োর যায় ঃ দূর, দূর।
ও-দুয়োরে যায় ঃ ছেই-ছেই।

এই সব নিম্নবর্গীয় ছিন্নমূল আমাদের কাছ থেকে কোনও সহানুভূতি পায় না।

'পাথর-চাপা কপাল যার সেই/ ঘুঁটে কুড়ানির ছানা' এরা। মন্ত্রী আর কোটালের নৃশংস যৌথ উদ্যমে,

ঢোল ডগরে পড়ে লাঠি
রক্তে হয় রাঙা মাটি

কাড়ে না কেউ রা
ভালোমানুষের ছা

বুদ্ধিজীবী ভালোমানুষেরা মৌন পালন করেন, সংবাদপত্রগুলি দিনকয় চেঁচামেচি করে চুপ করে যায়, মানবাধিকার আন্দোলনও সাড়া দেয় না। কলের ডুলি বা রেলগাড়িতে করে দণ্ডকারণ্যে ফিরে যেতে বাধ্য হয় সেইসব মানুষেরা যারা পুলিশের গুলি, গুণ্ডার আক্রমণ, রোগ, অবরোধ, আর অনাহার থেকে বেঁচেছিল। শচীন দেববর্মণের গানের ধুয়া অবলম্বনে শঙ্খ ঘোষ মরিচঝাঁপি কাণ্ডে কম্যুনিস্ট-নেতৃত্বাধীন সরকারের কার্যকলাপে বেদনার্ত হয়ে বলেন, 'তুমি আর নেই সে তুমি'। সরকারি পক্ষ অতীতে যা বলেছিল সেই 'তুমি' যা বলে আজ দিনবদলের পর 'আমি' বা বেসরকারি সমাজ সেই কথা বললে হয়ে যায় বিরুদ্ধতা।

তুমি বললে মানবতা
আমি বললে পাপ.....
তুমি বললে হিটলারি-ও
জনপ্রেমে ভরা.....
তুমি বললে বাঁচার দাবি
আমি বললে ছুতো.....

কম্যুনিস্ট পার্টি একদা বলেছিল দণ্ডকারণ্যে নয়, পশ্চিম বাংলাতেই শরণার্থীদের পুনর্বাসন দিতে হবে। সেই কথাই ১৯৭৮ সালে যখন বেসরকারি সমাজ বলে তখন সেটা হয়ে যায় লোক খ্যাপাবার ষড়যন্ত্র।

তুমি বললে দণ্ডকে নয়
আপন ভূমিই চাই
আমি বললে ভণ্ড কেবল
লোক খ্যাপাবার চাঁই।...
তুমি বললে, বিপ্লব, আর
আমি প্রতিক্রিয়া।

'উলটোরথের ভিখিরি'-দের ফেরত পাঠানোর কথা, 'দেশ নেই যার এইভাবে' তাদের দেশ খুঁজে বেড়ানোর কথা, এই কবি, যিনি হতে পারতেন তাদেরই একজন, লেখেন 'উলটোরথ' কবিতায়।

১৯৪৭ সালে বঙ্গবিভাজন ঘটেছে, কিন্তু সেই দেশভাগ এখনও অতীত নয়, এখনও ঘটমান বর্তমান। সেই বাংলাভাগেরই একটি উত্তরকালীন অধ্যায় মরিচঝাঁপির ঘটনাবলী। সেই আখ্যানে সমস্ত কুশীলব ছিল 'ওরা' আমাদের সমাজের নিম্নবর্গের, নিম্নবর্গের মানুষেরা। ডাণ্ডিযাত্রা আমাদের ইতিহাসের এক মহিমান্বিত ঘটনা, মরিচঝাঁপিতে উপনিবেশস্থাপন এবং সেখান থেকে রাষ্ট্রীয় দাপটে মানুষকে উৎখাত হতে পারতো এক মহাকাব্যের বিষয়। কিন্তু ইতিহাসের পাদটীকাতেও তার স্থান নেই, বাংলাসাহিত্যে তার স্থানই বা কোথায়। ইতিহাসের পাতা থেকে মুছে এই আখ্যানকে বিস্মৃতিতে নিক্ষেপ করেছে নাগরিক সমাজের মাথার ইলেকেরা, যাদের কাছে নিম্নবর্গের মানুষের চেয়ে বাঘ মূল্যবান। 'পূর্ব-পশ্চিম' উপন্যাসের দ্বিতীয় খণ্ডের উপসংহারে সেই দুঃখকথা একটু পাই আমরা। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় দণ্ডকারণ্য থেকে হাজার হাজার শরণার্থীর পশ্চিমবাংলায় চলে আসাকে চিহ্নিত করেছেন, 'একটা অদ্ভুত ঘটনা' বলে। মাঝরাস্তায় এদের আটকাবার চেষ্টা করা হলো, কিন্তু জনজোয়ার থামানো গেল না। অথচ সুন্দরবনের দ্বীপে তাদের তো বসতিস্থাপন করতে দেওয়া যায় না, কারণ 'সুন্দরবনে ব্যাঘ্রপ্রকল্প হয়েছে, বাঘেদের বাঁচিয়ে রাখা আন্তর্জাতিক দায়িত্ব।' উদ্ধৃত বাক্যটির মধ্যে হয়তো আমরা উপন্যাসিকের আয়রনিক কণ্ঠস্বর শুনতে পাই। কিন্তু উদ্বাস্তুদের উৎখাতের প্রধান দায়িত্ব সেইসময়ের প্রধানমন্ত্রী মোরারজি দেশাইয়ের ঘাড়ে চাপিয়ে বামফ্রন্ট সরকারকে নিষ্কলঙ্ক রাখতে চেয়েছেন সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। মোরারজি দেশাইয়ের কঠোর নির্দেশ উদ্বাস্তুদের প্রশ্রয় দেওয়া চলবে না, তাই ভারি অনুগত পশ্চিমবঙ্গ সরকার 'প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে উদ্বাস্তুদের ফেরত পাঠাতে বদ্ধপরিকর হলো।' আসল কথা, লোকসভায় বামপন্থীদের সমর্থন বজায় রাখার দায়ে দেশাইকে পশ্চিমবঙ্গের বামপন্থী সরকারের কাজকে সমর্থন করতে হয়। ফেরত পাঠানোর উদ্যোগ সত্ত্বেও ফিরে গেল না উপন্যাসের চরিত্র হারীত মণ্ডলের নেতৃত্বাধীন ত্রিশ হাজার মানুষ—তারা জানালো 'দণ্ডকারণ্যের আদিবাসীদের হাতে মার খাওয়ার বদলে না হয় বাঙালিরাই আমাদের মারুক।' সরকারি নির্দেশ অগ্রাহ্য করে স্বাবলম্বী উপনিবেশ গড়ার উদ্যোগকে কিছুতেই মেনে নিতে পারল না সরকার। লঞ্চ স্টিমার দিয়ে ঘেরা হলো, পুলিস দিয়েও যখন হলো না, তখন আক্রমণ করল এক গুণ্ডাবাহিনী।—'কেউ বলে, তারা কোনো একটি বড়ো রাজনৈতিক দলের কর্মী, কেউ বলে তারা সরকারেরই ভাড়া করা গুণ্ডাবাহিনী।' এক রাতের মধ্যে মরিচঝাঁপি সাফ। কুঁড়ে ঘরগুলি জ্বলে পুড়ে শেষ। প্রতিবেশী সাতজেলিয়া, ছোট মোল্লাখালি দ্বীপের মানুষ দূর থেকে শুনতে পায় সেই রাতে আক্রান্ত মানুষের আর্তনাদ।

কুড়ি বছর আগে দণ্ডকারণ্যে যারা এসেছিল পুনর্বাসনের আশায় তাদের কথা লিখেছেন শক্তিপদ রাজগুরু তাঁর 'দণ্ডক থেকে মরিচঝাঁপি' উপন্যাসে। আট বছর ক্যাম্পে নিষ্কর্মা জীবনযাপনের পর তাদের নিয়ে যাওয়া হয় পুনর্বাসনের গ্রামে। জমি পেয়ে রামানুজ-নিশিকান্ত-শরৎ-রামগতি মাঠে নামে লাঙল নিয়ে। খুঁজে পায় হারানো

জীবনের সুর ও ছন্দ। কিন্তু সুধাকান্ত, হরিশ পালদের বদমাইশিতে, আদিবাসীদের সঙ্গে সংঘর্ষে তাদের মন ভেঙে যায়। 'আমাগো পশ্চিম বাংলায় পাঠাই দ্যান। বাঁচি মরি হেই মাটিতেই মরুম।' তাছাড়া 'মরা মাটি—জল কুনোদিন আইব না।' গিরিজা কেতকী খোকনকে নিয়ে সংসার গড়ে তুলেছিল। কিন্তু নিশিকান্তের প্রবর্তনায় তারাও দণ্ডকারণ্য ছাড়ে। মরিয়া উদ্বাস্তুরা বারাসাত হাসনাবাদ হয়ে মরিচঝাঁপিতে চলেছে। পুলিশ-প্রশাসনের বাধা মানে না; বাঘের গর্জন, কুমিরের তোয়াক্কা করে না, গাং দেখে মুগ্ধ হয়। দণ্ডকারণ্য কেন ছেড়েছেন জিজ্ঞাসা করলে খ্যাপা নিশিকান্ত জবাব দেয়, 'ক্যান আইছি? মরণের জন্যি! দ্যাশের মাটিতেই শ্যাষ শয্যা নিমু!' পুলিশ-অবরুদ্ধ দ্বীপে অনাহারের জ্বালা। বিনা চিকিৎসায় ভবিষ্যতের প্রতীক খোকনের মৃত্যু হয়। পানীয় জলও নেই। নিশিকান্তের মৃত্যু হয়। 'নিশিকান্ত হালদার দীর্ঘ দশ বছর ছিন্নমূল জীবনের পথে-পথে ঘুরে আজ আদিম অরণ্যের গহনে এসে তার ঘরের ঠিকানা খুঁজে পেল।' হেরে গেল এই মরিয়া মানুষেরা। হারিয়ে গেল আশা ভালোবাসা স্বপ্ন আপনজন মনুষ্যত্ব। বুভুক্ষু মানুষের স্তব্ধ চাহনির সামনে দিয়ে দ্বীপের দখল নেয় পুলিশবাহিনী। গিরিজার চোখে অতীত ভবিষ্যৎ হারিয়ে যায়, কেতকীর চোখে জল নামে, যমুনার বুক শূন্য হয়ে যায়। ভেসে চলে যায় ছত্রভঙ্গ মানুষের দল। 'কোথায় ভেসে চলেছে আবার বানে ভাসা খড়কুটোর মতো আশ্রয়ের আশায় তা তারাও জানে না।'

দেশভাগের অবশেষের মরিচঝাঁপির এই মর্মান্তিক আখ্যান প্রাধান্য পায় এক বাঙালির লেখা ইংরেজি উপন্যাস—অমিতাভ ঘোষের লেখা *The Hungry Tide*-এ। উপন্যাসের দুটি কাহিনীর একটি কাহিনী অবসরপ্রাপ্ত হেডমাস্টার নির্মলকে নিয়ে। ব্যর্থ কবি সে আজও বিপ্লবের স্বপ্ন দেখে। স্ত্রী নীলিমার সমাজসেবামূলক কাজে তার কোনও আস্থা নেই। মরিচঝাঁপিতে উদ্বাস্তুদের উপনিবেশ নির্মাণের কাজের সঙ্গে নির্মল জড়িয়ে পড়েছিল। সে সেই বিবরণ লিখে গেছে পরবর্তী প্রজন্মের কানাইয়ের জন্য। নির্মলের মৃত্যুর পর সেই লেখা কানাইয়ের হাতে আসে। গ্রাম্য গরিবের মধ্যেও যারা গরিব, 'oppressed and exploited both by the Muslim communalists and by the Hindus of the upper caste', ছিন্নমূল এরা দণ্ডকারণ্যে আশ্রয় পেয়েছিল। সেখানে তারা থাকতে পারেনি, সেই চূড়ান্ত অনভ্যস্ত পরিবেশে— ' we couldn't settle there: rivers ran in our heads, the tides were in our blood.' পূর্বের উদ্দেশে যেন আর এক লং মার্চ শুরু করে প্রেতের মতো ধূলিধূসর এক মানুষের মিছিল। ধানবাদ থেকে ছেলে ফকিরকে নিয়ে সেই মিছিলে যোগ দেয় কুসুম। 'Such industry! Such diligence!' আসার কয়েক সপ্তাহের মধ্যে মরিচঝাঁপিতে তারা গড়ে তুলছিল এক আত্মনির্ভর জনপদ। নির্মল বিস্মিত হয়ে দেখেছিল, 'an experiment imagined not by those with learning and power, but by those without.' যেমন কংগ্রেস সরকার উদ্বাস্তু কলোনি স্থাপনের

আদিপর্বে মনে করতো, তেমনি বামপন্থী সরকারও পাশার দান উল্টে যাওয়ায় মনে করে মরিচঝাঁপিতে উপনিবেশ গড়া মানুষগুলিও 'squatters and land-grabbers'। পুলিশ দিয়ে গুন্ডা দিয়ে আবার তাদের বাস্তুহারা করা হয়। নির্মলের মতো সদিচ্ছাপরায়ণ, তত্ত্বে-বিপ্লবী নপুংসক বুদ্ধিজীবী কিছুই করতে পারে না। কুসুমের মনে হয় সারা দুনিয়াটা আজ পশুদের জন্য সংরক্ষিত— 'our fault, our crime, was that we were just human beings.' সমাজসেবিকা নীলিমা ভাবে তার আদর্শবাদী কল্পনাপ্রবণ স্বামী 'does not understand that when a party comes to power, it must govern; it is subject to certain compulsions.'শুধু প্রশ্ন থেকে যায় যায়, যদি বামুন কায়েত বদ্যিরা মরিচঝাঁপিতে উপনিবেশ স্থাপন করত তাহলে কি আখ্যানের একই পরিণতি হতো?

দেশভাগের পঞ্চাশ-ষাট বছর পরে এখনও রক্তমোক্ষণ হয়ে চলেছে। সীমান্ত পেরিয়ে মানুষ যখন চলাচল করে, যখন অনুপ্রবেশ হয়, যখন কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে সীমান্ত সুরক্ষিত করা হয়, যখন সীমান্তরক্ষীরা গুলি চালায়, তখন দেশভাগ অতীত থাকে না, প্রতিদিন বর্তমান হয়ে ওঠে। এখনও বহু ছিন্নমূল মানুষের পুনর্বাসন হয়নি, অগণিত মানুষের বুকে এখনও গভীর ক্ষত। অনেক বাস্তুহারা মানুষ ও তাদের উত্তরপুরুষেরা ছড়িয়ে রয়েছে দণ্ডকারণ্যে, নৈনিতালে, বিহারে, আন্দামানে। তারা বাঙালি পাঠকের চেতনাবৃত্তের বাইরে রয়ে গেছে। সেইসব নিম্নবর্ণ-নিম্নবর্গের বাঙালিরা কীভাবে রয়েছে, কেমন তাদের সত্তা আর ভবিষ্যৎ তার পরিচয় তুলে আনেনি বাংলা কথাসাহিত্য। অসাধারণ পরিশ্রমী এই সব ছোটজাতের মানুষেরা মরিচঝাঁপিতে যে স্বনির্ভর উপনিবেশ গড়ে তুলেছিল, জনদরদী রাষ্ট্রক্ষমতা নির্মমভাবে তাদের প্রতিরোধকে চুরমার করে তাদের উৎখাত করল। সেই আখ্যান হয়ে উঠতে পারত এক মহাকাব্যিক উপন্যাসের বিষয়। সেই উপন্যাস লেখা হলো না। বাংলা সাহিত্যের এই নীরবতার পাপের খানিকটা প্রায়শ্চিত্ত করেন বাঙালি অমিতাভ ঘোষ ইংরেজিতে উপন্যাস লিখে। বাঙালি লেখকেরা হিন্দু সমাজের নিম্নবর্গের মানুষের কথা লেখেননি তা নয়। তাঁরা লিখেছেন কবিয়াল নিতাই আর বনোয়ারির কথা, শবলা-পিঙ্গলার কথা, লবটুলিয়ার নাকছেদী ভানুমতী-কুন্তার কথা, কুবের-কপিলার কথা,—ঢোঁড়াই, বৈজুনাথ চণ্ডাল, রুইতন কুরমির কথা, লখিন্দর দিগারের কথা, চ্যারকেটু-খ্যাতখেতু বাঘারুর কথা। শুধু লেখা হয়নি বাংলাভাগে ছিন্নমূল নিম্নবর্গের নিম্নবর্ণের মানুষের কথা, 'ওদের' কথা। কপিলা মালা কুবের এরা সবাই পদ্মাপার থেকে উৎখাত হলো, অনেকে উৎখাত হলো মেঘনা যমুনা কীর্তনখোলার পার থেকে। তারা কোথায় গেল? তাদের পদচিহ্ন কেন বাংলাসাহিত্যে থেকে গেল না, সেই জিজ্ঞাসার নিরন্তর উত্তর খুঁজে বেড়াই।

কালপ্রতিমা, শ্রাবণ ১৪১২

একজন অজানা বাঙালির আপনকথা

তখন পর্যন্ত তিনি ছিলেন অজানা ভারতীয়। তখন তিনি আপনকথায় লিখেছিলেন বিশ শতকের প্রথম দশকে কীভাবে বেড়ে উঠেছিল এক বালক। নীরদ সি চৌধুরির কাহিনী ছিল 'the story of the struggle of a civilization with a hostile environment'। তাঁর মূল লক্ষ্য ছিল ব্যক্তিগত নয়, ঐতিহাসিক। যথাসাধ্য সততার সঙ্গে লেখা *An Autobiography of an Unknown Indian*-কে লেখক 'as a contribution to contemporary history' হিশেবে দেখতে চেয়েছেন। তিনিও ছিলেন পূর্ববঙ্গের মানুষ, জন্মেছিলেন মৈমনসিংহ জেলার কিশোরগঞ্জ নামের ছোট শহরে, যে শহরকে নীরদচন্দ্র 'the gift of the river' বলেছেন। কিশোরগঞ্জের ও গ্রামের বাড়ি বনগ্রামের ঋতুচক্র নিয়ে, উৎসব-পরম্পরা নিয়ে—ছন্দোময় জীবনের চমৎকার বর্ণনা আছে এই অজ্ঞাত ভারতীয়ের আত্মচরিতে। তখনই দেখি, সাম্প্রদায়িকতার বিষ কীভাবে সমাজদেহে ছড়িয়ে পড়েছে—ইস্কুলে একই ক্লাসের হিন্দু আর মুসলমান ছাত্রেরা স্বতন্ত্র সেকশনে বিভক্ত। ১৯১০ সালে তাঁরা কিশোরগঞ্জ ত্যাগ করে স্বেচ্ছায় কলকাতায় চলে আসেন এবং কলকাতার বাসিন্দা হয়ে যান। সেই ছোট্ট প্রায়-গ্রাম্য কিশোরগঞ্জ থেকে কলকাতায় আসায় লেখকের সামনে 'opened out endless vistas of ambition before us'।

প্রায় পঞ্চাশ বছর পরে বরিশাল জেলার এক গ্রামে বড় হয়ে ওঠার এবং সেখান থেকে নিষ্ক্রমণের কথা লিখেছেন মিহির সেনগুপ্ত তাঁর স্মৃতিকথা 'বিষাদবৃক্ষ'-এর পৃষ্ঠাগুলিতে। মিহিরও পুব বাংলা ছেড়ে, ইস্কুলের পড়া শেষ করার পর কলকাতায় চলে আসেন; কিন্তু স্বেচ্ছায় নয়, দারিদ্র্যের জীবনে জর্জরিত হয়ে এবং সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতির শিকার হয়ে। যে সাম্প্রদায়িক বিষাক্ততার কথা নীরদচন্দ্র লিখেছেন, তারই চূড়ান্ত পরিণামে ক্লাসের সেকশন শুধু আলাদা থাকে না, দেশ ভেঙে যায়। সেই ভাঙা দেশের পূর্বাংশের বাসিন্দা বালক মিহির গ্রামের ইস্কুলের পড়া শেষ করে বরিশালের বিখ্যাত ব্রজমোহন কলেজে পড়তে গিয়েছিল, তখন থেকেই বৃহত্তর জীবনে তার প্রবেশের সূত্রপাত। গোটা বরিশাল জেলাই তো 'gift of the river'। মিহির লঞ্চে-স্টিমারে নদীপথে ঘুরে শান্তি পায়। নদীমাতৃক বরিশালের ছেলে মিহির নদীর আশ্রয়ে বাল্যাবধি কাটিয়ে নদীর প্রসাদগুণ বোঝে। সে জানে নদীর চলমান

জলস্রোতের ছলোচ্ছল শব্দে মানুষ বড় 'শান্ততা পায়, গতি পায়, জীবন পায়'। 'পিছারার খালের সোঁতায় ভেসে ভেসে বড় খালে পড়া, তারপর সেই গাবখানের খালের বৃহত্তর পরিধি অতিক্রম করে ঝালকাঠি নদী অর্থাৎ সুগন্ধার বিস্তীর্ণতা পেরিয়ে কীর্তনখোলার আরও প্রসারতার মধ্যে' এবং তারপরে সেও ছাড়িয়ে কলকাতায় এসে পড়েছিলেন মিহির। নীরদচন্দ্রের সামনে যেমন 'endless vistas' খুলে গিয়েছিল, তেমনি বলিশাল শহরে কলেজে পড়তে গেলে মিহিরের মনে হয়েছিল সে 'অতি দ্রুত অজানা এক জগতের দিকে ছুটে' চলেছে। তার চলার গতি এখন থেকে বাড়তেই থাকবে। প্রিয় কোনো স্থান, ব্যক্তি বা বস্তু ভালোবাসা দিয়ে তাকে ধরে রাখতে পারবে না।

নীরদচন্দ্র তাঁর আত্মজীবনীকে সাম্প্রতিক ইতিহাস বিষয়ে একটি অবদান হিশেবে দেখেছিলেন, মিহিরের স্মৃতিকথাও একটি 'ব্যক্তিক অভিজ্ঞতার দলিল' নিশ্চয়ই, কিন্তু নিতান্ত তাই নয়। এই স্মৃতিকথা মিহিরের নিজের জবানিতে 'তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানের সাধারণ বাঙালি হিন্দুজীবনের চিত্র'। এই আলেখ্যের সময়কাল মোটামুটি দশ বছর, উনিশশো একান্ন-বাহান্ন থেকে উনিশশো বাষট্টি-তেষট্টি। 'এই সময়টায় আমি শৈশব, কৈশোর অতিক্রম করে যৌবনের দরজায় সবে পা দিয়েছি। পাকিস্তান তখনও শিশুরাষ্ট্র। আমার অভিজ্ঞতার দৌড় পিছারার খালের চৌহদ্দি থেকে শুরু করে বরিশাল শহর পর্যন্ত।' নিজের ব্যক্তি হিসাবে বেড়ে ওঠার আলেখ্য দিয়ে মিহির তখনকার সেখানকার সংখ্যালঘুদের অবস্থা বর্ণনা করতে চেয়েছেন। 'একটি ঘোষিত সাম্প্রদায়িক রাষ্ট্রে আমার মতো একটি সংখ্যালঘু সমাজের কিশোরের কী ধরনের সামাজিক তথা রাষ্ট্রীয় প্রতিকূলতা মোকাবিলা করে পথে চলতে হয়েছিল তারই আলেখ্য এটি।' সেই দিক থেকে এই রচনাটিও সাম্প্রতিক ইতিহাস বিষয়ে এক উল্লেখযোগ্য অবদান। এই বিষণ্ণ ব্রতকথায় শুধু ব্যক্তিক উত্থানপতন বিবৃত হয়নি, বিবৃত হয়েছে একটি স্থান ও কালের কথা। মিহির বলেন, 'আমি শুধু কথকমাত্র।' সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতি সম্বন্ধে 'বিষাদবৃক্ষ'-এর লেখক অকপটে কটু সাম্প্রদায়িক সত্য বলতে দ্বিধা করেননি, কিন্তু রচনাটির মধ্যে কোথাও সাম্প্রদায়িক মনোভাবের লেশমাত্র নেই। আর তাতেই রচনাটি উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। কিন্তু কে এই মিহির সেনগুপ্ত? গুটি চার-পাঁচ বইয়ের রচয়িতা মিহির সেনগুপ্ত ব্যাংকের চাকরি থেকে স্বেচ্ছাবসর নিয়েছেন। এই অজ্ঞাতপরিচয় বাঙালি, পরে জেনেছি, গল্পকার ও ঔপন্যাসিক অভিজিৎ সেনের সহোদর ভাই।

উচ্চবর্ণের হিন্দুরা সমানভাবে ঘৃণা করত নিম্নবর্গের হিন্দুদের এবং মুসলমানদের। নিম্নবর্গের হিন্দু আর নিম্নবর্গীয় মুসলমানের মধ্যে অর্থনৈতিক ও সামাজিক পার্থক্য বিশেষ ছিল না। আবার নিম্নবর্গীয় মুসলমানরা এমনকি নিজের ধর্মের আশরফ্‌দের কাছেও অবজ্ঞাত উপেক্ষিত ছিল। উচ্চবর্গীয়দের সঙ্গে নিম্নবর্গীয় মুসলমানের মাত্র

ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে সমানাধিকার ছিল, অন্য ক্ষেত্রে ছিল না। দুই ধর্মের নীচের থাকের মানুষের মধ্যে গভীর সাংস্কৃতিক যোগ ছিল। এতটাই ছিল যে, এইসব নীচের স্তরের মানুষের সংস্কৃতি হয়ে উঠেছিল সমন্বয়ের সংস্কৃতি। জারিগানের আসরে বয়াতিরা খোদ আল্লাহ্ তায়লা বা নবীর বন্দনার আগে লোকায়ত দেবী বিপদনাশিনীর বন্দনাগান গাইত। দুই ধর্মের নীচের থাকের মানুষেরা লোকায়ত দেবদেবীদের যেমন মান্যতা দিত, তেমনি মান্যতা দিত পীর-পয়গম্বরদের। জারিগান শুরু হয় আল্লাহ্‌র নাম নিয়ে, পরে চলে আসে দীনবন্ধুর কথা। একই গানে কবি বলেন, 'তুমি বিনে মা এই অধমের নাইকো কোন গতি'; এই কবির জিহ্বায় লক্ষ্মী-সরস্বতী কথা জোগান। আবার যে জারিগান শুরু হয় বিপদনাশিনী মা-কে স্মরণ করে, তাতে পরে সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধির দিনে ঢুকে যায় হিন্দুয়ানি খতম করার ও শিব-দুর্গা-কালীমূর্তি ভাঙার কথা। একজন মুসলমান কবি লেখেন,

হিন্দু আর মুসলমান
একই পিণ্ডের দড়ি
কেউ বলে আল্লা রসুল
কেউ বলে হরি।

দেশবিভাগ-জাতিদাঙ্গার পরেও অপবর্গী হিন্দু-মুসলমানের একসঙ্গে ছোরাখেলা, লাঠিখেলা হতো, গুণবিবির গান, রূপবান কন্যার পালা, রয়ানী আর কীর্তন হতো রাতের পর রাত। পরে সব শুকিয়ে গিয়েছিল। কখনো কখনো সমাজের উপরের স্তরেও দেখা যেত এই সিনক্রেটিজমের নমুনা। রাজা কীর্তিনারায়ণ যাবনিক খাদ্যের ঘ্রাণে জাতিচ্যুত হন, অথবা যবনীর সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে জাতিত্যাগ করেন। ইসলামি নাম গ্রহণ করেননি তিনি, কিন্তু হিন্দু-মুসলমান উভয় ধর্মের আচার তিনি মানতেন। তাঁর পুত্র মামুদ হাসান নাম নেয়, কিন্তু সেও হিন্দু আচার ত্যাগ করেনি। এই পরিবারের ফুলবানু নামে এক মহিলা রীতিমতো হিন্দু আচার পালন করতেন। এই ভূখণ্ডের সমাজ হিন্দু-মুসলমান রক্তের মিশ্রণে গড়া। মিহির সেনগুপ্তের জিজ্ঞাসা, এখানে ভেদের আগুন জ্বলল কেন?

মেলাগুলি ছিল সব ধর্মের মানুষের মিলনের মেলা। জাতকরণী খোলা, পঞ্চদেবতার খোলা, গলুইয়া খোলা, কামেশ্বরী খোলার মতো লোকায়ত ধর্মীয় স্থানগুলিতে বাংলা নতুন বছরের প্রথম দিনে মেলা বসত। বুড়ি-আধবুড়ি বিধবারা, যারা ছিল অন্যের সংসারে আশ্রিত ভাতকাপড়ের দাসী, তারাও পূজার থানে উৎসাহে যোগ দিয়ে এক দিনের মুক্তির আনন্দ পেত। চমৎকার এইসব মেলায় হিন্দু-মুসলমান সব নিম্নবর্গের মানুষ আনন্দে একত্রিত হতো। প্রমোদ হতো, বিনোদন হতো, সংসারের দরকারি জিনিস খরিদ হতো এসব মেলায়। মেলা হয়ে উঠত এক আনন্দের জগৎ। নট্টমশাইরা বাজনা বাজিয়ে মাতিয়ে দিতেন। ১৯৫০-৫১ সালের দাঙ্গার পরেও

নিম্নশ্রেণীর হিন্দুরা দেশত্যাগ না করায় এইসব মেলা ছিল জীবন্ত। পরে মিহির-উল্লেখিত জব্বরের মতো গুণ্ডাদের জুয়ার আড্ডায়, কিশোরী ও সুন্দর মুখের কিশোরদের প্রতি যৌন-নির্যাতনে এইসব মেলার পরিবেশ নষ্ট হয়ে যায়। এইসব গুণ্ডাদের আক্রমণে শেষ অবধি নিম্নবর্গের হিন্দুরাও দেশ ছাড়ে, ছিন্নমূল হয়। অথচ শুধু সংস্কৃতির দিক থেকে নয়, রাজনীতির দিক থেকেও নিম্নবর্গের সংখ্যালঘুর সঙ্গে পাকিস্তানপন্থী সংখ্যাগুরুর সমঝোতা ছিল, যেহেতু উভয়েই ছিল উচ্চবর্ণের হিন্দুদের দ্বারা শোষিত এবং উৎপীড়িত। পাকিস্তান কায়েম করার সময় এই নিম্নবিত্ত নিম্নবর্গীয় হিন্দুদের সমর্থনের জন্য মুসলিম লীগ এক অভিন্ন স্বার্থের কথা বলেছিল। আধিয়ার, তেভাগা-আন্দোলনকারী বেঠবেগারি-বিরোধী, সামন্ত-নিপীড়িত সব নিম্নবর্গীয় হিন্দু ও মুসলমান সমাজের কাছে মুসলিম লীগের ওয়াদা ছিল নিপীড়ন অবসানের। কিন্তু পরে নিম্নবর্ণের হিন্দুর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করা হয়েছিল। যখন ভদ্রলোক হিন্দুরা উচ্ছেদ হলো, যখন তাদের ছেড়ে যাওয়া জমিজমা অনায়াসে করায়ত্ত করা গেল, তখন লোভ তার জিহ্বার সংখ্যা বাড়িয়ে ফেলল। তখন গরিব-বড়লোক নির্বিচারে সব হিন্দুর বাড়িঘর, জমিজায়দাদ দখল করা শুরু হলো। 'সংখ্যাগুরু... সদ্য-আহৃত স্বাধীনতাকে বর্ণনির্বিশেষে এক নৈরাজ্যপন্থা হিসেবেই গ্রহণ করে এবং তা সংখ্যালঘুর উপর যা কিছু করার অধিকার হিশেবে জারি করতে প্রয়াসী হয়।' আগে শুরু হয়েছিল বর্ণহিন্দু বিতাড়ন, পরে শুরু হয় নিম্নবর্ণের হিন্দুদের উপর অত্যাচার। অথচ উচ্চবর্ণের হিন্দুসমাজের শোষণ ও জাতিবিদ্বেষে পর্যুদস্ত নমশূদ্র ইত্যাদি তফশিলি জাতির মানুষেরা মুসলিম লীগের আশ্বাসে ও পাকিস্তান-প্রতিষ্ঠায় নিজেদের উদ্ধারের সম্ভাবনা দেখতে পেয়েছিল। 'কিন্তু এক সময় সাম্প্রদায়িক ভিন্নতার বর্বর পশুরা সেইসব সম্ভাবনাকে তছনছ করে দিয়ে তার নখদন্ত ব্যাদান করে তাকে আক্রমণ করে বসল।'

এই পরিস্থিতিতে পুব বাংলার মুসলমানেরাও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ভদ্র হিন্দু গৃহস্থেরা দেশত্যাগ করায় গরিব মুসলমান প্রজাদের রুজিরোজগারের উপর দিয়ে যেন ঝড় বয়ে গিয়েছিল। হিন্দুদের ফেলে যাওয়া জমিজিরেত তারাই পেয়েছিল যাদের কিছু ছিল। ভূমিহীনেরা বিশেষ পায়নি। যারা ফেলে যাওয়া ঘরবাড়ি সম্পত্তি দখল করে, তারাও সংরক্ষণ বা উন্নয়ন করতে পারে না। গার্হস্থ্য শিক্ষার অভাবে সব নষ্ট হতে থাকে। ফলে গরিব মানুষেরা কর্মহীন হয়ে পড়ে। চুরি-ডাকাতি-নৈরাজ্য যখন বাড়তে থাকে, তখন ধর্ম বা সম্প্রদায়ের ভেদবিচার থাকে না। এমনকি নিম্নবর্ণের হিন্দুরাও দেশত্যাগ করায় বা গুণ্ডাদের উৎপীড়নে সম্পদহীন হওয়ায়, জব্বরের মতো গুণ্ডাদের এবার নজর গিয়ে পড়ে স্বধর্মের পরিবারগুলির উপর। এবার তাদের গৃহস্থালির সম্পদ ও তাদের বাড়ির যুবতীরা লুণ্ঠিত হতে থাকে। অনন্যোপায় অবস্থাপন্নেরা গ্রাম ছেড়ে শহরে চলে যেতে শুরু করে। আর গ্রামগুলি সংস্কার ও যত্নের অভাবে ক্রমেই প্রেতার্ত হয়ে যায়। মিহির সেনগুপ্ত দেখিয়েছেন কীভাবে নিম্নবর্গের হিন্দু-মুসলমানেরা এক

সাধারণ সংস্কৃতির উত্তরাধিকারী ছিল। হিন্দুরা দেশত্যাগ করল, আর বাঙালি মুসলমানেরাও সেই সাধারণ সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার—জারি, সারি, কথকতা, মারফতি, রামযাত্রা, কিস্‌সা ইত্যাদি লোকরঞ্জক অনুষ্ঠানকে বাঁচিয়ে রাখতে পারল না শুচিবায়ুগ্রস্ত কট্টর মোল্লাপন্থীদের চাপে। নিম্নবর্গীয় হিন্দুরা দেশত্যাগ শুরু করলেও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে তাদের শূন্যস্থান পুরণ করতে পারত নিম্নবর্গীয় মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষেরা। কিন্তু তারা পারল না, মোল্লাতন্ত্রের ফতোয়ায়, চোখরাঙানিতে।

পাকিস্তান নামক শিশু রাষ্ট্রটির দাঁতনখ ধারালো হয়ে উঠতে হিন্দুরা সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। সংখ্যালঘুরা অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দুর্ভাবনায় ক্রমশ ভারতের দিকে চলমান। নিজেদের ভদ্রাসন, সাজানো বাগান, বাঁধানো ঘাট, পুরুষানুক্রমিক সম্পদ ফেলে বা নামমাত্র দামে বেচে তারা দেশ ছাড়তে শুরু করে। মিহির দেশভাগের পরেও বছর পনেরো পূর্ব পাকিস্তানে থেকে গিয়েছিলেন। তিনি চোখের সামনে দেখেছিলেন, কোথাও টিনের চালা, কাঠের ফ্রেমের সুন্দর বাড়িগুলির ভিতমাত্র পড়ে আছে। সামান্য পয়সায় কিনে অথবা জবরদখল করে বাড়িগুলির টিন কাঠ, বাড়ির চারিদিকের গাছপালা তুলে কেটে, বাড়ির ভিতটাকে একটা চিতার আকৃতি দেওয়া হয়েছে। তুলসীমঞ্চে সন্ধ্যাবেলা প্রদীপ জ্বলে না, শঙ্খ বাজে না, গাছের গোড়ায় কেউ জল দেয় না, এইসব বাড়ির ছেলেরা আর খেলার মাঠে আসে না। ঐসব বাড়ির দিকে তাকালে বুক ভেঙে যায়। এখানে এই সেদিনও ব্যাপক জনবসতি ছিল। আজ আর নেই। অন্যান্য অঞ্চলের গুণ্ডামির খবর অতিরঞ্জিত হয়ে পৌঁছায় ও অনিশ্চয়তা সৃষ্টি করে। উচ্চবর্ণীয়েরা দেশ ছাড়লেও, যুগী নাপিত কামার কুমোর নমশূদ্ররা গোড়ায় নিশ্চিত ছিল। তারা জাতব্যবসায় ব্যস্ত থাকত, গ্রামীণ সুখে গৃহস্থালির রস উপভোগ করত। এইসব পরিবারের মানুষেরা ভেবেছিল দোল-দুর্গোৎসব-পুণ্যাহ চলতেই থাকবে। তারা সন্ধ্যাবেলা কীর্তন গাইত, ব্রতানুষ্ঠান করত। পরে তারাও নিশ্চিন্ত থাকতে পারে না। সবচেয়ে বড় ভয় যুবতী মেয়েদের নিয়ে। সেই সময়টিতে, দাঙ্গায় সমূলে বিনাশ হওয়ার চাইতেও ভয়াবহ ছিল যুবতী মেয়েদের লুণ্ঠিতা ও ধর্ষিতা হওয়ার আশঙ্কা। এমনিতেই মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষ নিজস্ব সমাজে মেয়েদের সঙ্গে সহজ মেলামেশায় অভ্যস্ত ছিল না বলে হিন্দু মেয়েদের প্রতি বড়ই আকাঙ্ক্ষী ছিল। কারণ হিন্দু মেয়েরা আদৌ পর্দানশিন ছিল না। যেমন ডাক্তারবাবুর মেয়ে, কুট্টিদির উপর নজর পড়ে মালেকের। মালেক ভয় দেখায়, যে কোনো দিন সে কুট্টিদিকে তুলে নিয়ে যাবে। আবার, যে কোনো রকম যৌন-সম্পর্ক বলাৎকার বলে গৃহীত হচ্ছিল, যদি পাত্রী হিন্দু আর পাত্র মুসলমান হত। জোলা আর যুগীর জাতব্যবসা একই। পুতুল যুগী এবং হিন্দু, কাসেম জোলা এবং মুসলমান। বিধবা পুতুল আর কাসেমের মধ্যে প্রেম। কাসেম পুতুলকে উঠিয়ে নিয়ে গেছে এই হলো অভিযোগ। ব্যাপারটা দাঁড়াল মুসলমান যুবক কর্তৃক হিন্দু যুবতীর শ্লীলতাহানি। কিন্তু কিশোরবয়সি মিহির সেদিন বুঝেছিল, শুধু

পীরিতের জন্য পুতুল কাসেমের সঙ্গে বেরিয়ে যায়নি, নিজের ও কন্যা কুসুমের পেটের ভাতের ব্যবস্থাও ছিল জরুরি প্রশ্ন। যাই হোক, এই অনিশ্চয়তা, উদ্বেগ ও উৎপীড়নের পরিস্থিতিতে 'আমার পিছারার খালধারের মানুষেরা অনির্দেশ্য যাত্রায় ক্রমশই আরও সচল হতে থাকে। অতঃপর যাদের আর কোনো উপায়ই নেই, তারাই শুধু মাটি কামড়ে পড়ে থাকে।'

গাজী-আখ্যান থেকে তৎকালীন পরিস্থিতি স্পষ্টতা পায়। এই গাজীর উপাখ্যান মিহিরের দাদা অভিজিৎ তাঁর একটি গল্পে ব্যবহার করেছেন। গাজী নিজেকে মনে করত সে মিহিরের বাবার শিষ্য। সেই গাজী এক রাত্রে হাজার আনসার নিয়ে আল্লাহু আকবর ধ্বনি দিয়ে মিহিরদের বাড়িতে হাজির হলে, সেই দেশকালের পরিস্থিতিতে ধরেই নেওয়া হয়, আক্রমণ করাই তার উদ্দেশ্য। মিহিরের বাবা বাড়িতে তখন একমাত্র পুরুষ। তিনি সবাইকে দোতলায় তুলে রামদা নিয়ে দরদালানে পায়চারি করছিলেন। এমন সময় ডাক শোনা যায় 'গুরুদেব'। সবার নিষেধ অগ্রাহ্য করে বাবা এগিয়ে যান এবং 'হারামজাদা বেইমান' বলে গাজীর গালে চড় কষান। ঐ উত্তেজনার দিনগুলিতে কোনো মুসলমানকে হারামজাদা বেইমান বলা ছিল চরম হঠকারিতা। সামন্ত অহমিকায় সেটা ভেবে দেখেননি মিহিরের বাবা। গাজী বলে, আগে খবর না দেবার কসুর যেন মাপ করা হয়। এ বাড়িতে হামলা হতে পারে খবর পেয়ে সে আসলে রক্ষা করতে এসেছিল। গাজীর আন্তরিকতায় মিহিরের বাবার অবিশ্বাস ছিল না, কিন্তু তাঁর সামন্ত-অহমিকায় লেগেছিল যে, গাজীকে যদি রক্ষাকর্তা ভাবতে হয়, তাহলে সম্মান থাকে কোথায়! কোনো হিন্দুই সেই দিনগুলিতে বিশ্বাস করত না যে কোনো মুসলমান দাঙ্গা-বিরোধী হতে পারে। গাজীর ঘটনা পরিষ্কারভাবে প্রমাণ করে দিল যে, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষদের আর নিজেদের সংরক্ষণের শক্তি নেই।

সংখ্যালঘুদের মধ্যে যারা অবস্থাপন্ন, যাদের বাড়িতে যুবতী মেয়ে আছে, তাদের বাড়িতে হামেশা ডাকাতি হতো। এই সাম্প্রদায়িক ডাকাতির মদতদাতা ছিল নতুন অর্থ আর ক্ষমতার অধিকারী সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের সেইসব মানুষেরা যারা দাঙ্গার সময় হিন্দুদের রক্ষকের ভূমিকা নিয়ে কৌশলে তাদের বাড়ি-জমি-সম্পত্তি হস্তগত করেছিল। তারা একদিকে বিপদে অভয় দিত, অন্যদিকে পোষা বদমাশদের ব্যবহার করত ডাকাতির এই নতুন প্রকল্পে। আগেও ডাকাতি ছিল। ভূস্বামী নিজেদের স্বার্থে কিছু মানুষকে ডাকাতি করতে প্ররোচিত করত। রুজিরোজগারের ব্যবস্থা না থাকায় তখন ছিল মরশুমি ডাকাতি। ডাকাতির উদ্দেশ্য তখন ছিল ক্ষুধানিবারণ, সংখ্যালঘু বিতাড়ন নয়। মেয়েদের ইজ্জত নিয়ে তারা নষ্টামি করত না। কিন্তু এই নতুন ডাকাতেরা ভয় দেখাত, এরপরে দেশ না ছাড়লে একেবারে নিকেশ করে দেওয়া হবে। ফলে, পাতার খচমচ অথবা অন্য কোনো প্রাকৃতিক শব্দ শুনলেও আতঙ্ক। 'রক্ষক হিসেবে রাষ্ট্রও একচক্ষু ষণ্ডের মতো নিষ্ঠুর।' নায়েবমশাইয়ের বাড়িতে ডাকাতির

প্রত্যক্ষদর্শী ছিল মিহির। রাত্রে আর্ত চিৎকার শুনে তার বাবা ও সে ছুটে যায়। ডাকাতেরা পালিয়ে যাবার পর, দেখা গেল পুরুষেরা রক্তাক্ত, বাড়ির মেয়েটি ধর্ষিত। সরেজমিনে তদন্ত করতে এসে দারোগা একান্তে জিজ্ঞাসাবাদের নামে ধর্ষিতা কিশোরীকে আবার ধর্ষণ করে। তিন ডাকাতের দ্বারা ধর্ষিত হবার পর, রাজপুরুষের দ্বারা সে যে উপরন্তু ধর্ষিত হয়, সেটা কিশোর মিহিরও বিলক্ষণ বুঝতে পারে। ডাকাতি ছেড়ে সুস্থ সামাজিক জীবনে মগ্ন ছিল যে আহমেদ মোল্লা, তাকে খুন করে জব্বর। যে মানুষটি পঞ্চাশ-একান্ন'র দাঙ্গার সময় হাজার দাঙ্গাবিরোধী স্বেচ্ছাসেবীর সর্দার ছিলেন, সেই মান্যবান মানুষের ছেলে জব্বর দুর্ধর্ষ ডাকাত, খুনি এবং লম্পট। পিছারার খালের পবিত্রতা জব্বরের মতো হার্মাদের দলবলেরা ধর্ষণ করতে থাকে। তারা 'নবজাত রাষ্ট্রের স্বাধীনতাকে স্বেচ্ছাচার হিশেবে নিয়েছিল।' এটা ছিল এক জঘন্যতম সময়, 'worst of time' 'এইসব লোচ্চা লম্পট এবং লুম্পেনদের সে সময় রাষ্ট্রই ছেড়ে দিয়েছিল সংখ্যালঘুদের অবশিষ্টতম মানুষদের উচ্ছেদকল্পে।' পঞ্চাশ-একান্ন সালের দাঙ্গা বরিশালে এক বীভৎস কাঁপন ধরিয়ে দিল। প্রায় পাঁচশো বছরের প্রাচীন সামাজিক ভিতে ফাটল ধরল, যেন ঘটে গেল এক ভয়ংকর ভূমিকম্প।

হিন্দুরা দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক। সরকারি চাকরি তারা পাবে না, যোগ্যতা থাকলেও। ব্যাবসার ক্ষেত্রে তাদের উপর সতর্ক নজরদারি, যাতে তারা লাভের টাকা হিন্দুস্থানে পাঠাতে না পারে। অথচ পাঠানো তো নৈতিক কর্তব্য, যেহেতু পরিবার আজ বিভাজিত। মিহিরদের পিছারার খালের এলাকায় দাঙ্গা হয়নি, বলাৎকারও বিরল। কিন্তু অন্য অঞ্চলের দাঙ্গা খুন রাহাজানি বলাৎকার অগ্নিসংযোগের কাহিনী ভেসে আসে আর নিরাপত্তা নষ্ট করে দেয়। গ্রাম শূন্য হতে থাকে। তাঁতি তাঁত বোনে না, কারণ ডাকাতেরা পুঁজি লুঠ করে। কামার লোহার কাজ ছেড়ে দেয়, কারণ মজুরির পয়সা তো পায়ই না, উপরন্তু চোখরাঙানি খায়। ফলে এইসব পেশার মানুষও গ্রাম ছাড়তে শুরু করে। খেলার মাঠে, ইস্কুলে, মাছ ধরার সময় বা খালের জলে ঝাঁপানোর মুহূর্তে বালক মিহির ও তার বন্ধুরা টের পাচ্ছিল সংখ্যাগুরুদের মধ্যে ক্ষমতাশালী গোষ্ঠীর মানুষেরা তাদের অবাঞ্ছিত মনে করছে।

গাজীর ব্যাপারটিতে এবং আরও অনেক প্রাসঙ্গিক ঘটনায় মিহিরের দাপুটে পিসিমার কর্তৃত্ব আমূল নাড়া খেয়েছিল। তাঁর দাপটের জগতে ব্যাপক ভাঙন দেখা দিলে ১৯৫২-৫৩ সালের কোনো এক ফাল্গুনের সকালে বড়খালের ঘাটে একখানা বড়সড় নৌকা এসে লাগে। সেই নৌকায় পিসিমা চিরকালের জন্য ভিটেমাটি ছেড়ে দেশান্তরে চলে যান। সেই চলে যাওয়ার দীর্ঘ বর্ণনাটি মিহিরের আপনকথা থেকে উদ্ধৃত করি। 'পিসিমাবুড়ি তাঁর বয়স্থ-বয়স্থা নাতিনাতনিদের নিয়ে জীবনের দ্বিতীয়বারের মতো তাঁর বাপের বাড়ি ছাড়লেন। প্রথম ছেড়েছিলেন সাত বছর বয়সে, 'রোহিণী বউ' হিসেবে, কেননা তখন 'পঞ্চম বর্ষে ভবেৎ গৌরী, সপ্তমে চ রোহিণী'।

একাদশ বর্ষে বৈধব্য নিয়ে ফিরে এসেছিলেন বাপের বাড়িতে 'স্বামীখাগি' অভিধা শিরোধার্য করে। তারপর এই তাঁর দ্বিতীয়বার বহির্গমন এবং শেষ। তাঁর চোখে আমরা কোনো কারণে কোনোদিন জল দেখিনি। কিন্তু নৌকায় ওঠার আগে, বাড়ির সব ঠাকুরদেবতা, তাঁর জাগেশ, উঠোনের গাছপালা, তাঁর তাবৎ প্রিয় বৃক্ষাবলি এবং মন্দিরগুলোকে প্রণাম করার সময়, তাঁর আকুল কান্না আমি দেখেছি। সে চিত্র ভোলার নয়। তাঁর আজীবনের অবলম্বন ঐ সিংহপালঙ্ক ভর্তি অজিনাসনে উপবিষ্ট অসংখ্য ঠাকুরদেবতার ছবি, পালঙ্কের আনাচে-কানাচে সব দেবতা, দেবকল্প নুড়িপাথর এবং ইত্যাকার তাবৎ আড়ম্বর আর জীবনের সব অবলম্বন পরিত্যাগ করে বুড়ি পিসিমা পিছারার খালের জগৎ ছাড়লেন। এই সাথে আমাদের ব্রতকথা, পাঁচালি, বিভিন্ন খোলার মোচ্ছব এবং সমুদয় কিংবদন্তির যুগের অবসান হল। আমরা বাকি যারা রইলাম, তারা নেহাতই একটা শ্মশানের পোড়া কয়লা আর ভাঙা কলসি হিশেবেই রইলাম।' এই শেষযাত্রার মুহূর্তের বর্ণনার মধ্যে ফুটে উঠেছে লক্ষ লক্ষ মানুষের চিরদিনের ঘরদুয়ার নিজস্ব পরিমণ্ডল ছেড়ে চিরকালের জন্য অপরিচিতের উদ্দেশে শঙ্কিত যাত্রার কাহিনী। অনির্দেশ যাত্রায় সব ফেলে পা বাড়িয়ে শেষ পর্যন্ত কোথায় গেল তারা! জমিদারবাড়ি, তালুকদারবাড়ির বউরা বাপের বাড়ি যাবে সে-ও একদিন পূর্ববাংলার স্থিতিশীল জীবনে ছিল উৎসব। তারা যখন নৌকায় চাপে, আভিজাত্য বজায় রাখতে নজর রাখা হয় যাতে তাদের ছুরাৎ ইতরজনের নজরে না আসে। সেই পর্দানশিন বউরা ভিটেমাটি ছেড়ে সীমান্ত পেরিয়ে কোথায় কোন্ বিদেশ-বিভুঁইয়ের রেললাইনের পাশে হঠাৎ গজিয়ে ওঠা কোন্ কুঁড়েঘরে অথবা কোনো বস্তির কোন্ অন্ধকার ঘরে, কিংবা দণ্ডকারণ্য বা আন্দামানের কোন্ অপরিচিত আকাশের নীচের অপরিচিত ভূমিতে তাদের দেহশেষ মিলিয়ে গেছে তার কি কোনো খোঁজ আছে? অথচ এইসব সোনা, ছোট বা বড়, মেজো, সেজো, ন' বউদের তো কথা ছিল চন্দন কাঠের চিতেয় চড়ে 'সগ্‌গে যাবার।' 'বিষাদবৃক্ষ' গ্রন্থের ভূমিকায় দীর্ঘশ্বাস ফেলে মিহির জানান, 'পঞ্চাশের সেই ক্যারাভানের শেষপ্রান্ত আজও বহমান। আরও কতকাল তার প্রবাহ চলবে, কেউ জানে না।' নিজেও শেষ পর্যন্ত দেশত্যাগী হয়েছিলেন মিহির।

কলেজে পরীক্ষার জন্য ফর্ম পূরণ করতে হবে। নিঃস্ব মিহির জলপানির টাকা এসেছে কিনা খোঁজ নিতে গেলে কলেজের কেরানির কাছে পায় কুৎসিত ব্যবহার। খাতাপত্র খুলেও দেখল না সে। কলেজ বন্ধ থাকায় ইউনিয়নের কেউ নেই যে প্রতিবাদ করে। টাকা জোগাড়ে ব্যর্থ হয়ে গ্রামের বাড়িতে ফিরে আসে আর ধুম জ্বরে শয্যাশায়ী হয়। লেখাপড়া শেখার উদ্যোগের এই পরিণতি দেখে উদাসীন বাবাও মর্মপীড়া বোধ করেন। তারপরেই ঘটে ভাগ্যের মর্মান্তিক পরিহাস—জলপানির মাসিক ১৫ টাকা এবং স্টাইপেন্ডের মাসিক ১০ টাকা না-নেবার 'gross misconduct'-এর জন্য কলেজ থেকে চিঠি আসে। চিঠি পেয়ে হতবাক মিহির, এই টাকার খোঁজ করেই তো সে

পেয়েছিল কেরানির দাঁতখিঁচুনি। কলেজে গিয়ে অধ্যক্ষের সঙ্গে দেখা করে সে। সেইদিনই পরীক্ষা শুরু হয়েছে; সহপাঠীরা পরীক্ষা দিচ্ছে, আর টেস্টে ভালো ফল করেছিল যে মিহির সে পরীক্ষা দিতে পারছে না। পরীক্ষার ফর্ম পুরণ না করতে পারার কারণ সে অধ্যক্ষকে সব খুলে বলে। মুসলমান অধ্যক্ষ জানতে চান, মিহির হিন্দু কিনা। সে হিন্দু জেনে অধ্যক্ষ বলেন, মুসলমান কেরানির অসদাচরণের এটাই কারণ—'That's the reason. These people here in this office are awfully communal'। তিনি পরামর্শ দিলেন, 'try your luck in India'। আর খুব দুঃখ প্রকাশ করলেন তার জন্য। মুসার মতো গুণ্ডা মিহিরকে নিত্য অপমান করত, হিন্দুস্থানে চলে যেতে বলত। জনৈক কালী দত্ত এদেশ ছেড়ে যেতে বলে, এদেশে থাকলে আমাদের কিছু হবে না, মিহির যেন দাদাদের কাছে কলকাতা চলে যায়। মিহির ভাবে ছোট ভাইবোনদের ছেড়ে গেলে কি স্বার্থপরতা হবে না! আবার সবাইকে নিয়ে চলে গেলে দাদারাই বা চালাবে কীভাবে? পড়াশুনো বন্ধ, বাড়িতে মন বসে না—'বাড়ির বিশালকায় থামগুলির খিলানের খাঁজে জালালি কবুতরগুলো সারা দুপুর হুম্‌হুম্ করে ডেকে আমার শূন্যতাবোধ যেন আরও বাড়িয়ে দেয়।' একদিকে নিজস্ব সমাজের চূড়ান্ত অবক্ষয়, সাংস্কৃতিক অবনতি, পারিবারিক আর্থিক দৈন্য, অন্যদিকে সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের অবহেলা, অসম্মান আর চাপা ক্রোধের জাঁতাকলে নিষ্পিষ্ট হতে-হতে, এই তরুণের মন ভবিষ্যৎ সম্পর্কে একেবারে হতাশ হয়ে পড়েছিল। 'সবাই আমাকে এদেশ ছেড়ে ভাগ্যের সন্ধানে অন্য এক দেশে চলে যেতে বলেছে, আমি কি সেখানে যাব? এই দেশ, এই নদী, এর গাছপালা, এর প্রান্তর আমি বড় ভালবাসি। এখানে সহস্র অপমান সত্ত্বেও একে ছেড়ে যেতে ইচ্ছা হয় না। যদি ছেড়ে যেতেই হয়, পিছারার খালের স্মৃতির মতো এর সব নদী, সব খাল এবং সব আয়োজনই এক সময় আমার স্মৃতিই হয়ে থাকবে।' বাস্তবিক স্মৃতিই হয়ে আছে। পিছারার খালের জগৎ—তার মানুষ আর প্রকৃতির কথা নিদ্রায়-জাগরণে লেখকের চেতনাকে হানা দেয়। 'যেখানেই যাই, পিছারার খালের স্রোতের শব্দ একটানা সুরের মতো বুকের মধ্যে বাজতে থাকে! ...আমার শিকড়ে যেন আজও তার ধারা বহমান।' দেশ ছেড়ে চলে যাবার জন্য অশ্রুসিক্ত রক্তাক্ত মন যখন নিরুপায় হয়ে প্রস্তুত তখন মিহিরের মনে পড়ে যায় বাইবেলের এক্‌সোডাসের উপাখ্যান। 'আমার মনে হচ্ছিল আকাশের মেঘের আড়ালে থেকে এক্ষুণি একটা ঘোর নাদ ধ্বনিত হবে, আমি শুনতে পাব, হে মুসা, ভীত হবার হেতু নেই। তোমার সামনে যে বিস্তীর্ণ পাথার, তা তোমার পথ রোধ করতে পারবে না। তুমি তোমার দণ্ডের সাহায্যে সমুদ্রকে আঘাত কর। সে তোমাকে পথ করে দেবে। তোমার পেছনে ফেরাউন তার সৈন্যসামন্ত নিয়ে তাড়া করছে। তারা অচিরেই জলমগ্ন হবে।'

দেশকালের এক জঘন্য পরিস্থিতিতে এক বালকের বড় হয়ে ওঠার আখ্যানও এই 'বিষাদবৃক্ষ' স্মৃতিকথা। সে বাস করেছে এক বেশ পুরানো ধ্বংসোন্মুখ প্রাসাদে। এই প্রাসাদের প্রতিটি ইটের সঙ্গে জড়িয়ে আছে আভিজাত্যের কিংবদন্তি। গথিক ঘরানার থামওয়ালা বিশাল বাড়ির ঘরের সংখ্যা ষোল। এই বাড়ির বয়স দেড়শো বছর। যাদের চিকিৎসাবিদ্যা কুলকর্ম ছিল, তারা হয়েছিল তালুকদার। পূর্বপুরুষ জগৎমশাইয়ের ছিল লাঠিয়াল বাহিনী, সেই বাহিনীর প্রতাপে জমিতে দখল বাড়ে। পরবর্তী দুই পুরুষে বাগান, বৈঠকখানা, দিঘিপুকুর, গোলাঘর, নাটমন্দির, অভিনয়মঞ্চ নিয়ে, নবাবি ও সাহেবি ঘরানা মিলিয়ে গড়ে ওঠে এই প্রাসাদ। পাঁচটি মন্দির ছিল। সেইসব মন্দিরে পূর্বপুরুষের সমাধি। বৈঠকখানাটি প্রায় জাদুঘর—সেখানে নানা জন্তুর চামড়া, মাথা, শিং আর প্রপিতামহ 'জগৎস্যানমশায়'-এর তৈলচিত্র। রায়বাহাদুর ঠাকুরদা ছিলেন জেলাবোর্ডের মেম্বার। মধ্যস্বত্ববিলোপ আইনে তাদের জীবনে ধস নামে। ঠাটবাট উৎসব বজায় রাখতে হয়, নির্ভরশীল পোষ্যদের দেখতে হয়, কিন্তু কোনো উপার্জন নেই। উপার্জনের কোন দক্ষতাও অর্জন করেনি এরা, পুরুষানুক্রমে পরশ্রমজীবী হওয়ায়। ফলে পরিস্থিতি হয়ে ওঠে সংকটাপন্ন। জমিদারি লোপ পেলেও, খাসজমির উপস্বত্ব থেকে স্বচ্ছন্দে চলে যেতে পারত জীবন। কিন্তু জ্যাঠামশাই জানান, মেয়েদের বিয়ে দিতে নাকি খাসজমি বিক্রি হয়ে গেছে। সুতরাং শুরু হয় উঞ্ছবৃত্তি। দীয়তাং ভূজ্যাতাং-এর দিন গত, রসনাতৃপ্তিকারী আহারও অপ্রতুল। আজ দুর্দিনে, পতনের দিনে লেখকের বাবা 'যদুপতে কাঃ সা মথুরাপুরী, রাঘপতে কা গতোত্তর কোশলা' বলে বিলাপ করেন। বাড়ির সব সম্পদ বিক্রি করে দিন চলছে। বিক্রি হয়ে গেল সংগৃহীত বইপুস্তক। হাতির দাঁত, হরিণের শিং, বাঘের ছাল সব জলের দামে বিক্রি হয়। বিক্রি হয় যাবতীয় শৌখিন জিনিস। বাড়ির উঠোনে খুঁটিতে দাঁড়িপাল্লা বেঁধে শুরু হল বাসনপত্র বিক্রি। সোনা, রুপার গয়না, বাসনও বিক্রি হল। বিক্রি হল টিন কাঠ চেয়ার টেবিল তক্তপোশ। বাড়ির নাট্যমঞ্চের স্টেজ বিক্রি হয় সাধারণ কাঠের দামে। এমন হতদরিদ্র পরিস্থিতি হয় যে, মঞ্চের সিনগুলি কেটে মাকে সন্তানদের ইজের তৈরি করে দিতে হয়।

পিছারার খালের তিনটি গ্রাম যেন তিনটি বোন। সেখানে ছিল উচ্চ বিদ্যালয়, বালিকা বিদ্যালয়, সেলাইয়ের ইস্কুল, ফুটবল মাঠ; নিজেদের বাড়ি ছাড়াও আর এক বনেদি বাড়িতে ছিল নাট্যমঞ্চ। এক সুসজ্জিত সম্পন্ন গ্রামগুচ্ছ। বাজার-দোকান, লোকায়ত দেবদেবীর থান, বিভিন্ন ঋতুতে মেলা, গান, নীলের গাজন নিয়ে জমজমাট। এই ছন্দোময় জীবন দেশভাগে তছনছ হয়ে যায়। যাদের পক্ষে সম্ভব তারা গোড়াতেই দেশ ছাড়ে। থেকে যাওয়া হিন্দুরা হয়ে গিয়েছিল উঞ্ছবৃত্তিধারী। লক্ষ্মীছাড়া জীবনযাপনে অভ্যস্ত এই মানুষগুলির আচরণ হয়ে গিয়েছিল কুৎসিত সম্ভ্রমহীন। নৈতিকতাবোধ নষ্ট হয়ে গিয়েছিল তাদের, ক্ষুধানিবারণে যে কোনো নিকৃষ্ট উপায় অবলম্বনে দ্বিধা ছিল না। বাড়িঘরদুয়ার, বাগান, পুকুরে নজর নেই, নষ্ট হয়ে গিয়েছিল মধ্যবিত্ত মূল্যবোধ।

এই পরিস্থিতিতে লোকসংস্কৃতির সাহচর্যে বিকশিত হয়েছিল মিহিরের মন আর চৈতন্য। যে বয়সটায় মেয়ে পুরুষের বিভাজনবোধ থাকে না, সেই বয়সে পাড়ার ছেলের দঙ্গল ও গৌরীদের সঙ্গে সে মাঘমণ্ডলের ব্রতে অংশ নিয়ে নির্মল শৈশবের আনন্দের আস্বাদ পেয়েছে। পিসিমা জেঠিমারা সমাজকে নৈরাজ্যের হাতে ছেড়ে দেননি। ব্রত পার্বণ লোকাচারে জীবন উৎসবমুখর ছিল। হতো আপদনাশিনী, বিপদনাশিনী, আকুলাই, নিরাকুলাই, মঙ্গলচণ্ডী, গোকর্ণ ইত্যাদি অনুষ্ঠান। মুসলমান মেয়েরাও তফাতে দাঁড়িয়ে এইসব গ্রামীণ দেবদেবীর পূজার্চনা দেখতো; গোপনে পূজায় উপকরণ জোগাত, আশীর্বাদ আর প্রসাদ নিত। এক অন্ধ সঙ্গীতজ্ঞ জ্যাঠামশাই বাড়িতে থাকতেন, আশ্রিত। সুর শুনে রাগ নির্ণয় করতে পারতেন। গান করেন, তবলাও বাজান তিনি। লোকসঙ্গীত থেকে রাগসঙ্গীত এক বালকের মনকে পূর্ণতা দেয়।

একেবারে শৈশব থেকে মিহিরের মনে জন্মেছিল বইপুস্তকের প্রতি ভালোবাসা। সেই ভালোবাসার তীব্র তাড়নায় সে লেখাপড়া শিখেছে। নিজেদের বাড়ির বই বিক্রি হয়ে গেলে প্রতিবেশী ডাক্তার জ্যাঠা কিনে নিতেন। সেইসব বই মিহির পড়েছিল বিপুল আগ্রহে—রামায়ণ, মহাভারত, নানা লেখকের গ্রন্থাবলী, আর প্রবাসী, বঙ্গবাণী, ভারতবর্ষ প্রভৃতি পত্রিকার বাঁধানো খণ্ডগুলি। বাড়িতে ছিল বাবার সংগৃহীত অনেক নাটক গিরিশচন্দ্রের, ক্ষীরোদপ্রসাদের; সেগুলিও সে পড়ে ফেলে। বাড়িতে ছিল প্রধানত ধর্মগ্রন্থ ও পুরাণ। সেইসব পড়ে-পড়ে এবং বৃদ্ধবৃদ্ধাদের কাছে সনাতনী উপদেশ পেয়ে, মিহির লিখেছেন, কিশোর-মিহির কুসংস্কারাচ্ছন্ন, ধর্মভীরু, অকারণ নীতিবাগীশ এবং মানসিকভাবে বদ্ধ হয়ে ওঠে। কিন্তু তাই তো বিদ্যা যা বিমুক্ত করে। সেই মুক্তির পথের দিশাও মিহির পায় তরুণ বয়সে বই পড়েই। ইস্কুলে পড়ার সময় জনৈক যতীন কর্মকারের সঙ্গে তার পরিচয় হয়। যতীন কর্মকার তাঁর বইয়ের দোকানে রাখতেন বই ছাড়াও, খবরের কাগজ, ম্যাগাজিন। পাঠ্যপুস্তকের বাইরে কী কী পড়া উচিত তাঁর সঙ্গে আলাপ-আলোচনা থেকে তা বেরিয়ে আসত। অসামান্য রুচিশীল এই মানুষটার সংস্রবে এসে মিহিরের মনের দিগন্ত প্রসারিত হয়। সংস্কৃত সাহিত্যের প্রতি তার মনে ভালোবাসা জন্মায় প্রপালক অধ্যাপকের প্রেরণায়। বেশ কিছু সংস্কৃত কাব্যনাটক তার পড়া হয়ে গিয়েছিল। মিহির লিখেছেন, 'উজ্জয়িনীর কবির সেই মেঘ আমার পিছারার খালের আকাশে সেদিন যে স্নিগ্ধচ্ছায়া নিয়ে উপস্থিত হয়েছিল আজও তার সেই মেদুরতা আমাকে পরিত্যাগ করেনি।' এক বাড়িতে হঠাৎ পেয়ে সে মন দিয়ে প্রাক্-ইসলাম যুগের আরবদের ইতিহাস পড়ে ফেলে। তার মধ্যে সংকলিত কবিতার উদ্ধৃতি খুব আকৃষ্ট করে তাকে। দীনতম পরিস্থিতিতেও কবিতা তাকে সব সময় আকৃষ্ট করেছে।

লোকসংস্কৃতি, ইস্কুলের পড়া, ইস্কুলের বাইরের পড়া যেমন মিহিরের মনকে গড়ে তুলেছিল, তেমনি গড়ে তুলেছিল শ্রমের জীবন। বাবা উদাসীন অকর্মণ্য, পরশ্রমজীবী

শ্রেণীর প্রতিনিধি হওয়ায় কোনো কাজেই তার দক্ষতা নেই। ফলে অর্থনৈতিক পতনে মুখথুবড়ে পড়া বনেদিবাড়ির ছেলে মিহির এবং তার পরের ভাই ছোটনকে শ্রমের মাধ্যমে অর্জন করতে হয় পরিবারের জীবনযাপনের সংস্থান। পাকিস্তান হওয়ার পরে-পরে একটা সময় ছিল যখন গুরুজনদের আদেশে শূদ্রদের বাড়ি যাওয়া চলবে না, ছোটলোকদের এ বাড়ি আসা চলবে না। খেলা নেই, ফুল তোলা, মাছধরা বারণ। একেবারে দমবন্ধ অবস্থা। কলকাতায় ইস্কুলে পড়া দাদারা এলে আনন্দ, তারা চলে গেলে বিষাদ ও নিঃসঙ্গতা। আরও পরে বাড়ির এক দঙ্গল গোরুছাগলের রাখালির দায়িত্ব এসে পড়ে মিহিরের উপর। মাঠে নিয়ে যাওয়া, চরানো, জাবনা খেতে দেওয়া হয়ে ওঠে মিহিরের কাজ। অন্য নিম্নবর্গীয় রাখালদের সঙ্গে মিশে সে নিঃসঙ্গতার বিষাদ থেকে মুক্তি পেয়েছিল। পেটের দায়ে যখন গোরুছাগলও বিক্রি হয়ে যায় তখন চিরসমাপ্তি ঘটে তার আনন্দময় রাখালি জীবনের। কখনো কখনো তীব্র মর্মবেদনায় চিলেকোঠার এক কোণে দুই কানে আঙুল দিয়ে সে একা-একা কাঁদে। ১৯৫৮-র দুর্ভিক্ষের সময় যখন বাবা-জ্যাঠা মার্কিনি রিলিফের চালে নিজেদেরও মুশকিল আসান হবে বলে নিজেদের বাড়িতে সরকারি লঙ্গরখানা বসাবার ব্যবস্থা করেন, তখন চাকরবাকর নেই, কে প্রতিদিন এই হাজার মানুষের খাওয়ার ব্যবস্থা করে। মাকে নিতে হয় রান্নার ভার; জ্বালানি জোগাড়ের দায়িত্ব এসে পড়ে মিহির ও ছোটনের উপর। ছাত্র পড়িয়ে নিজের পড়াশুনো চালাতে হয়। মিহিরের কথায় 'আমার ছাত্র পড়ানোর ইতিহাস নিজের ছাত্র হওয়ার থেকেও প্রাচীন।' নিজে এবং পরের ভাই ছোটন এক আনা, দুই আনা রোজে অন্য গ্রামে মজুর খাটে। তারা সুপুরি কুড়িয়ে বিক্রি করে সংসারের চাহিদা মেটায়। নানারকম ফল ও শবজি জোগাড় করে সাংসারিক প্রয়োজনে। কখনো কখনো অনাহারে, একবার তিনদিন অন্নজাতীয় খাদ্য না খেয়ে ইস্কুলে যায় এই প্রাক্তন বনেদি বাড়ির সন্তান। বাড়ির এতজন মানুষের অন্নবস্ত্রের দায়িত্ব মিহির ও ছোটনের। ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিতে মিহির যখন বরিশাল শহরে যায় তখন 'মায়ের হাতে সেলাই করা একটি মার্কিন কাপড়ের ইজের, তদনুরূপ একটি জামা এবং একটি লুঙ্গিই ছিল সম্বল।' পড়াশুনোর জন্য নানা সময় এক-এক বাড়িতে আশ্রয় নিতে হয়েছে তাকে। তার জন্যে পীড়িত হয়েছে আত্মগ্লানিতে। সে সব বাড়ির বালকবালিকাদের কুৎসিত আচরণ তাকে ক্লেদাক্ত করে। জ্যাঠামশাই বরিশালে এক বাড়িতে যখন রেখে গেলেন তখন যেন তিনি হজরত ইব্রাহিমের মতো আচরণ করলেন, যেন শূন্য মরুতে স্থাপন করলেন। আর এখানে মাতা হাজেরাও নেই। মদ্যপ সমকামীর দ্বারা নির্যাতিত হয়ে সে স্থির করল তাকে পড়াশুনা করে মানুষ হবার চেষ্টা ছেড়ে পালাতে হবে। কখনো বা ক্ষিপ্ত আশ্রয়দাতার পদাঘাতে সে অজ্ঞান হয়ে যায়। সে স্থির করে আর পদলেহী হবে না, ভিক্ষাপ্রার্থী হবে না কোনোদিন। এইভাবে *শৈশবকাল থেকে দারিদ্রবশত সে শ্রমকেই পুঁজি করতে শিখেছে। 'শ্রমই আমার পুঁজি*

হোক, শ্রমই আমার ইষ্টদেবতা হোক।' শ্রমের দ্বারা যারা জীবিকা নির্বাহ করে তাদের সঙ্গে সে একাত্মতা বোধ করে। বাঙালি মধ্যবিত্ত যে শিক্ষা পায় না, শ্রমের জীবন মিহিরকে সেই দুর্লভ শিক্ষা দিয়েছিল। আবার মিহির অনুভব করেন, বাল্যকাল থেকে অসম্ভব দুঃখ-দারিদ্রে মানুষ হওয়ায় তিনি চারিত্রিক দৃঢ়তা ও আত্মবিশ্বাস অর্জন করতে পারেননি। দুর্দিনে সে কলকাতার দাদাদের কুৎসিত ভাষায় চিঠি লিখেছিল এক সময়ে। তাদের যে কিছু করার ছিল না তখন বোঝেনি সে। আসলে দেশে মাৎস্যন্যায়ে ব্যাপক নিরাপত্তাহীনতায়, দারিদ্র্যের যন্ত্রণায়, ভাইবোনদের ভবিষ্যৎ চিন্তায়, নিজের পড়াশোনার অনিশ্চয়তায় যেন সে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিল। দারিদ্র্যযন্ত্রণায় অন্যকে আঘাত করে, নিজেও আত্মহননে উদ্যত হয়। বাছুরের গলার দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করতে যায় মিহির। হিজলের রিক্ত ডাল তাকে বাধা দিতে পারছে না। শেষ পর্যন্ত মিহির নিরস্ত হয় কচি কণ্ঠের কলকাকলি শুনে। ছোট ভাইবোনরা তাকে খুঁজতে বেরিয়েছে। 'তার মধ্যে যার গলা আমাকে দড়িটা ছেড়ে দিতে বাধ্য করে সেটাই তখন সবচেয়ে কচি বোন আমার। আর একদণ্ডও আমার কোল ছাড়া চলে না।' সে মরে গেলে এই শিশুরা আশ্রয়হীন হবে। সে বুঝে যায় 'এমনকি আত্মস্বার্থে মৃত্যুও আমার স্বধর্ম নয়।'

মানুষের আত্মবিকাশে মানুষের অবদানই হয় সবচেয়ে বেশি। মিহিরের আত্মবিকাশে সর্বাগ্রে যাঁর কথা মনে আসে সে তার মায়ের কথা। তিন সন্তান রেখে বাবার প্রথমা স্ত্রী প্রায় বিনা চিকিৎসায় মারা যান। রোমান্টিক স্বভাবের বাবা আর বিয়ে করতে চাননি, কিন্তু তিনটি মাতৃহীন সন্তানের দেখাশুনোর বাস্তব প্রয়োজনে তিনি মিহিরের মাকে বিয়ে করতে বাধ্য হন। এই নতুন মাকে পরামর্শ দেওয়া হল, তিনি যেন এমন ভাব করেন যে, তিনি হাসপাতাল ফেরত সেই পুরানো মা। সুতরাং হলো না তাঁর বরণ, তিনি হতে পারলেন না নববধূ। মা না হয়েও হলেন তিনটি সন্তানের মা। আর একান্নবর্তী পরিবারের স্বার্থান্বেষীরা শিশুগুলির মন বিষিয়ে দিতেই থাকে। নিজের সন্তান জন্মালে অসভ্যতা আরও বেড়ে যায়। এই অভাগিনী নারী নিজের গর্ভজাত প্রথম সন্তানকে আদর পর্যন্ত করতে পারেননি। কারণ তাকে আদর প্রমাণ করবে সতিন সন্তানদের প্রতি অনাদর! মা গরিব ঘরের মেয়ে, শিক্ষাদীক্ষায় দীন। অভিজাত পরিবারে বিয়ে হয়ে তিনি যেন মরমে মরে থাকেন। এই রমণী কিন্তু সবার ভ্রুকুটি ও বিদ্রূপ তুচ্ছ করে অমাতৃক সন্তান তিনটির মাতৃত্বে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন এবং পারিপার্শ্বিক হীনতাকে তুচ্ছ করার মতো রুচিবোধের পরিচয় দেন। সকালে-বিকালে মৃত সতিনের উদ্দেশে চা নিবেদন না করে মা চা খেতেন না, তার ফটো পুজো করতে স্বামীর নির্দেশ ছিল। চূড়ান্ত আত্মনিবেদনে,প্রায় ক্রীতদাসীর মতো তিনি তাঁর সেবার জগৎ সাফল্যের সঙ্গে রচনা করেছিলেন। মা যেন অপরাধী হয়ে থাকতেন প্রথমার জায়গা দখল করেছেন বলে। তিনি ছেলের দেওয়া খাতায় লিখেছিলেন, 'আমি খুব অসহিষ্ণু ছিলাম না, ঝড় ঝাপটা ঝামেলা আমার জীবনে কম আসে নাই, কিন্তু সবই

আমি হজম করিয়া নিয়াছি। সাময়িক হয়তো কিছু সময় আমি দুঃখ পাইয়াছি, কিন্তু ঘরে অশান্তি না হয় এ চেষ্টা আমি সব সময়ই করিয়াছি। কারণ এ জিনিস আমি বেশি সময় সহ্য করিতে পারিতাম না।'

মা বাপের বাড়ি যেতে পারতেন না, মিহিরদের তাই মামাবাড়ি যাওয়া হতো না। স্নানের সময় নদীতে নেমে মা তাই গাইতেন—

আ গো ধ—লা জল
ভালো নি আছে গো আমার
বাপ ভাই সকল

মুই না দেখি বাপের মুখ
না দেখি ভাইধনের মুখ
মুই না হেরি মায়েরও দুঃকও
পানে হা হুতাশ ....

এই গানের মধ্য দিয়ে যেন বিয়ের নামে চিরনির্বাসিতা বাঙালি মেয়েদের মর্মবেদনা আর্ত হয়ে উঠেছে। মায়ের ছিল চমৎকার গানের গলা। কবি অতুলপ্রসাদ সেন ছিলেন তাঁর সম্পর্কিত মামা। মিহিরের মা বিয়ের আগে অন্য এক মামার বাড়ি আশ্রিতা ছিলেন। মামাতো বোনেরা গান গাইত, মিহিরের মায়ের কাজ ছিল হার্মোনিয়াম নামানো ও উঠিয়ে রাখা। মামি ও মামাতো বোনেরা বাড়ি না থাকলে হার্মোনিয়ামে সা ও পা টিপে মা ভয়ে ভয়ে গান গাইতেন। একদিন যখন তিনি 'ওগো নিঠুর দরদী' গাইছেন তখন কবি স্বয়ং হঠাৎ এসে হাজির হন। লজ্জায় মা গান বন্ধ করে দিয়েছিলেন। ইতিমধ্যে মামি ও মামাতো বোনেরা ফিরে আসে, তাদের কাছে মেয়েটির পরিচয় জানেন অতুলপ্রসাদ। এদিকে ভয়ে-লজ্জায় গান গাইবার গর্হিত অপরাধের জন্যে বারবার ক্ষমা চায় মেয়েটি। কবি তার পরিস্থিতি বুঝে তাকে আদর করেন, তার গান শুনতে চান এবং তাকে নিজে গান শেখাবার প্রতিশ্রুতি দেন। মিহিরের মা বলেছেন, 'ঐ রকম শান্তি আমি কোনোদিন পাইনি।' বাবা নাটক করতেন, সেই সূত্রে মা 'সিরাজদৌলা' নাটকের গানগুলি—'পথহারা পাখি কেঁদে ফিরি একা', 'অন্তরে বাহিরে ঝড় উঠিয়াছে' সুন্দর তুলেছিলেন।

এই 'মায়ের মধ্যে ছিল এক স্বাভাবিক স্বাদেশিকতার স্পন্দন।' তিনি ক্ষুদিরামকে নিয়ে প্রচলিত 'একবার বিদায় দে মা' গান গাইতেন। স্বদেশী করা মানুষদের গল্প শোনাতেন ছেলেদের। সুভাষচন্দ্রকে তিনি সুন্দর চিনেমাটির পেয়ালা-পিরিচে চা খাইয়েওছিলেন। সতীন সেনকে তিনি সতীনদা বলতেন এবং তাঁকে রান্না করে খাইয়েওছিলেন। শৈলেন দাশগুপ্তকে ডাকতেন বেচউয়া বলে, মা তাঁর মাসিমা

ছিলেন। বড় বড় নেতারা দেশভাগের আগে-পরে এ বাড়িতে এলে মিহিরের মা তাঁদের আপ্যায়ন করতেন প্রাচুর্যের দিনে। এই স্বাদেশিকতার দৌলতেই হয়তো এই রমণীর মধ্যে ছিল নিহিত তেজ। ১৯৫৮ সালে দুর্ভিক্ষের সময়ে মার্কিনি খয়রাতি চালে বাড়িতে সরকারি লঙ্গরখানা বসে এবং লঙ্গরখানা থেকেই জুটতো নিজেদের আহার। হাভাতে মানুষের দুঃখের অন্নে ভাগ বসাচ্ছি বলে বাবা ভাবালু সন্তাপে উথলে উঠলে, এই রমণী, যিনি ছিলেন স্বামীর ছায়া, তিনি যথোচিত জবাব দিয়েছিলেন। যদি এই অন্ন পাপের হয়, তাহলে তিনি ও তাঁর ছেলেরা এই ব্যবস্থার সঙ্গে জড়িত থাকবেন না। বাড়িতে কর্তারা অন্য ব্যবস্থা করুন। আর এই অন্ন খাওয়া যদি পাপ হয়, তাহলে এতদিন ধরে অন্যের শ্রমের অন্ন খাওয়াও পাপ। আর তিনি ও তাঁর ছেলেরা তো লঙ্গরখানার অন্নগ্রহণ করেছেন শ্রমের বিনিময়ে—তিনি নিজে লঙ্গরখানার রাঁধুনি আর তাঁর ছেলেরা গতরে খেটে জোগাড় করে জ্বালানি। এই সর্বংসহা মায়ের প্রতি ছেলের শ্রদ্ধার শেষ নেই। মায়ের দু'খানা শাড়ি, দুটোই ছেঁড়া। ক্লাস এইটে উঠে ছয় মাসে সব বই পড়া হয়ে গেছে। বইয়ের আর দরকার নেই। সব বই দশ টাকায় বেচে দিয়ে মিহির মা'র জন্য শাড়ি কেনে। মা তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে কাঁদেন। আত্মবিলোপী সর্বজয়া মা'র প্রতি এই শাড়ি মিহিরের সবচেয়ে মূল্যবান শ্রদ্ধার্ঘ্য।

যা কিছু হওয়া উচিত নয়, তার শিক্ষা মিহির বোধহয় পেয়েছিলেন জ্যাঠামশাইয়ের কার্যকলাপ দেখে। মিহিরের বাবা কখনো এই দাদার বিরুদ্ধতা করেননি। ছেলেকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেছেন, এই ক্রুশকাঠ তিনি সারাজীবন বহন করেছেন, ছেলেকেও হয়তো করতে হবে। এই জ্যাঠামশাই একদিন থলেতে পাঁচ সের চাল দিয়ে ভাইকে জানিয়েছিলেন, আজ থেকে পৃথগন্ন হলেন তাঁরা। সম্পত্তির অর্ধেক যে ভাইয়ের প্রাপ্য সেই প্রাপ্য নাকি মেয়েদের বিয়ে দিতে শেষ হয়ে গেছে। সিন্দুক খুলে দেখা গেল একেবারে ফাঁকা। বাবা ভেঙে পড়েন এই বিশ্বাসভঙ্গে। তালুকদারি থাকাকালীন কখনো তিনি খাজনার হিশেব পাননি, এজমালি সম্পত্তিরও না। যদিও এই জ্যেষ্ঠ তাঁর সহোদর নন, খুড়তুতো জ্যেষ্ঠ, তবু তাঁর হাতেই বিষয়-সম্পত্তির দায়িত্ব প্রশ্নাতীতভাবে ন্যস্ত ছিল। জ্যাঠার ছিল দুর্দান্ত প্রতাপ। ইউনিয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান যেই হোক, আসল ক্ষমতা, পাকিস্তানি আমলেও এই জ্যাঠার। সামরিক শাসনের আমলে বোর্ডের কাজকর্ম পরীক্ষা করতে এসে ফৌজি মেজর পর্যন্ত জ্যাঠার হাতে যৎপরোনাস্তি নাকাল হয়। ইনি সামন্তসুলভ আচরণে মুসলমানদের ও অন্ত্যজদের ঘৃণা করতেন। মিহির যে মিয়াদের ইস্কুলে পড়ছে এটা তাঁর আদৌ পছন্দ ছিল না। পদে পদে তিনি মিহিরকে অপমানিত করতেন। তাঁর ক্ষুরধার বুদ্ধি ও কর্মক্ষমতা শুধু অকাজে ও মানুষের অনিষ্টের জন্য ব্যয়িত হল, এই ভেবে দুঃখ করতেন মিহিরের বাবা। মিহির কিন্তু মনে করেন, 'উপযুক্ত ক্ষেত্রে বিকাশ লাভ করলে তিনি একজন ছোটোখাটো হিটলার হতেন....।'

জ্যাঠামশাইয়ের যদিও দয়ার শরীর ছিল না, তবু অল্পবুদ্ধি ধবলীদাসী, অজ্ঞাতপরিচয়, সম্ভবত মুসলমান যুবকের দ্বারা গর্ববতী হলে, তিনি তাকে তাড়াতে রাজি হননি। কারণ পশুরাও গর্ভবতী হয়, অল্পবুদ্ধি ধবলী পশু বই আর কী!

কিন্তু মিহিরের বাবা ছিলেন জন্ম-রোমান্টিক। মধ্যস্বত্বভোগী হিসেবে পরশ্রমজীবী হওয়ায় কাজে-কর্মে একেবারে অক্ষম তিনি। তিনি প্রায় সাংখ্যের পুরুষের স্তরে উঠে গেছেন। প্রয়াতা ও বর্তমান স্ত্রীর গর্ভে তেরোটি সন্তানের জনক, কিন্তু তাঁর যেন কোনো দায় নেই। 'তবে ঝাপট লাগছে তাঁর প্রকৃতির গায়ে, কেননা প্রকৃতিকে তো অনেকগুলি মুখে অন্ন জোগাতে হয়।' প্রথমা স্ত্রীর মৃত্যুর কারণ যে তাঁর মা-বোন ও পরিবারের অন্যদের অত্যাচার সেকথা বিয়ের পরই তিনি শোকার্তভাবে দ্বিতীয় স্ত্রীকে বলেন। আরও বলেন, নতুন স্ত্রীও হয়তো অত্যাচারিতা হবেন, কিন্তু স্বামী হিশেবে তিনি তার প্রতিরোধ করতে পারবেন না। দুর্বলচিত্ত এই মানুষটি নাটক করতেন,' ফুটবল খেলতেন, আর ছিলেন একেবারে বাস্তবজ্ঞানহীন। কবিতা লিখতেন তিনি, স্ত্রীর প্রতি অপরাধের বিবেকজ্বালা মেটাতেন পদ্য লিখে। গ্রামে জনৈক সিন্ধি পোস্টমাস্টার আসেন। ধর্মের গোঁড়ামিমুক্ত এই পোস্টমাস্টার বলতেন, ইসলামের একেশ্বরবাদ ও হিন্দুদের সোহহংতত্ত্ব একই কথা। মিহিরের বাবার শখ হওয়ায় এই পোস্টমাস্টার মিহিরের বাবাকে উর্দু-ফারসি ভাষাশিক্ষার তালিম দিতেন। নাটক-অভিনয়ে একদা জমজামাট নাট্যমঞ্চ আজ খাঁ খাঁ করছে দেখে মা কান্নায় যখন ভেঙে পড়েন, যখন গেয়ে ওঠেন 'ভেঙে গেছে মোর স্বপনের ঘোর/ছিঁড়ে গেছে মোর বীণার তার', তখন বাবা জিজ্ঞাসা করেন, "শ্মশান দেইখ্যা আইলা?" মিহিরের বাবা শেক্সপীয়র অধ্যয়ন করতেন, পরিস্থিতি বুঝে শেক্সপীয়রের নাটকের সংলাপ লাগসই উদ্ধৃত করতেন। এখন তিনি করলেন রাজা লীয়ারের সংলাপ আবৃত্তি, চমৎকারভাবে মূলের 'daughter' শব্দের পরিবর্তে স্থানকালে মাননসই wife শব্দ বসিয়ে। এই রোমান্টিক মানুষটি স্ত্রীকে মাঝেমধ্যেই গান গাইতে বলতেন, আর নিজে আবৃত্তি করতেন শেক্সপীয়রের, গিরিশচন্দ্রের নাটকের সংলাপ। 'তাঁর ধ্বনি এবং সুস্পষ্ট সুন্দর উচ্চারিত শব্দগুলি দরদালানের বিস্তৃতিতে গমগম করত।' এমন বাবা-মায়ের সন্তান বলেই মিহির সেনগুপ্ত হয়তো এমন অসামান্য স্মৃতিকথা লিখতে পেরেছেন। মিহির বাবা-মায়ের সম্পর্ক বিষয়ে লিখেছেন, 'এরকম গাঢ় দাম্পত্যসম্পর্ক আজ অবধি আমি দেখিনি।' এই দাম্পত্যসম্পর্কের নিবিড়তা অবশ্য গড়ে উঠেছিল মায়ের নিবেদিতচিত্ত আত্মবিলোপে, নিজ ব্যক্তিত্বের বিনাশে।

সাংসারিক দায়ে পরে মিহিরের বাবা ইস্কুলের শিক্ষকতায় যোগদান করেন। তখন থেকে তিনি আলস্যের জীবন ছেড়ে বেরিয়ে এলেন। দু মাইল হেঁটে ইস্কুলে যেতেন। ছাত্রদের পড়ানো ছাড়াও আবৃত্তি, জিমন্যাস্টিক, লাঠিখেলা, বর্শা ছোঁড়া শেখাতেন

তিনি। এই বিষয়ে তাঁর পারদর্শিতা এতদিন ছিল জনশ্রুতি, এবার তার বাস্তব প্রমাণ মিলল। মিহিরের দুঃখ, 'এতসব ধন নিয়ে তিনি কিনা দীর্ঘকাল এক শয্যাশায়ী মনুষ্য হয়ে থাকলেন।' মিহিরের পড়াশুনোয় তিনি কোনে উৎসাহ দেখাননি। এক মাসের পড়ায় ক্লাসে থার্ড হলে বাবা ব্যঙ্গ করে বলেন, তিনজনে থার্ড! ক্লাস এইটে উঠে ছয় মাসে সব বই পড়া হয়ে গেলে মিহির যখন বই বিক্রি করে মা'র জন্য শাড়ি কিনে আনে, তখন অবশ্য বাবার চোখেও জল। মিহির অবশ্য ভাবালু বাবার চোখের জল দেখতে খুব অভ্যস্ত ছিল। এতে সে বিচলিত হয় না, কিন্তু এই ঘটনার পর বাবা আর কখনো ছেলেকে অনাদর করেননি। ম্যাট্রিক পরীক্ষার ফল ভালো হলে মা তো সবচেয়ে খুশি হন। বাবাও খুশি হন, এমনকি জ্যাঠাও।

যে কোনো বালকের আত্মবিকাশের ইস্কুলের একটা খুব বড় ভূমিকা থাকে। মিহিরের ইস্কুলে ভর্তির ব্যাপারে বাবা ছিলেন উদাসীন। মায়ের তো সিদ্ধান্ত নেবার অধিকারই ছিল না। মিহির যে মুসলমান মহিলাকে দাদীআম্মা বলে ডাকত, তাঁরই আগ্রহে এই বালক ইস্কুলে ভর্তি হয়। এই দাদীআম্মার কথায় আমরা পরে আসব। ইস্কুলের এক পণ্ডিতমশাই দারিদ্র্যবশত জাত-যাওয়াকে গ্রাহ্য না করে দাদীআম্মার অন্ন মিহিরের মতোই গোপনে গ্রহণ করতেন। দু'জনের মধ্যে এক অব্যক্ত চুক্তি ছিল যে কেউ কারো তথাকথিত অনাচারের কথা বাইরে বলবে না। দাদীআম্মার কথায় এই পণ্ডিতমশাই মিহিরকে ইস্কুলে ভর্তি করে দেন। এর আগে সে খাপছাড়া পড়াশুনো করেছে নিজের উদ্যোগে, পড়েছে বাড়িতে সংগৃহীত নানা বই, প্রধানত প্রাচীন সাহিত্য ও পুরাণাদি। অন্য ছেলেরা ইস্কুলে-মাদ্রাসায় গেলে সে ঈর্ষা বোধ করেছে। ইংরেজিতে ভুল করলে বাবা অবজ্ঞা করে বলতেন, গোরু চরানোর দক্ষতায় এই ভাষা শেখা যায় না। কিন্তু বাবার খেয়াল থাকে না, মিহির গোরু চরাত বলে, কৃষিবিষয়ক কিছু কাজ করত বলে সবাই কিছু খেতে পেত। হতোদ্যম হয়ে মিহির ভেবেছে, কেউ তাকে কিছু শেখায় না কেন? দাদীআম্মার আগ্রহে ইস্কুলে ভর্তি হলে সে উত্তেজনা বোধ করে, সকলের সঙ্গে মিলে পাকিস্তানের জাতীয় সঙ্গীত গাইতে ভালো লাগে তার। হেডস্যারকে প্রণাম করতে গেলে হেডস্যার বন্ধুপুত্রের প্রণাম নেন, কিন্তু বলেন, ইসলামে কেউ কাউকে প্রণাম করতে পারে না। খোদাই একমাত্র প্রণম্য, আল্লাহ্‌র কোনো শরিক নেই। মিহির উত্তরে বলে, জ্ঞানাঞ্জন-শলাকার দ্বারা যিনি মর্মচক্ষু উন্মীলিত করেন, সেই গুরু তো অবশ্য প্রণম্য। তাই সে প্রণাম করেছে। হেডস্যার প্রণাম নেন, কিন্তু তাঁর মনে সংশয় থেকে যায়, গুনাহ্ করলাম না তো! মিয়াদের ইস্কুলে ভর্তি হওয়ায় জ্যাঠামশাই অপ্রসন্ন, তিনি মনে করতেন মোছলমান শেখদের শিক্ষা দেবার যোগ্যতা নেই। বাবা আপত্তি করেন না, কারণ ছেলে নিজের উদ্যোগেই ভর্তি হয়েছে ইস্কুলে। এই ইস্কুলে অবশ্য কিছু-কিছু কারণে এই ছাত্রটির দম বন্ধ হয়ে

আসছিল। বনেদি বাড়ির ছেলে হয়ে সে যে ইস্কুলের অনুগ্রহে বিনা বেতনে পড়ছে সেটা সহপাঠীরা ও ইস্কুলের কর্তারা কখনই ভুলতে দিত না। মাস্টার সাহেবরাও অহরহ 'বুতপরস্তি' এবং ইসলামের তুলনামূলক আলোচনার দ্বারা মিহিরকে অপ্রস্তুত করতেন। যে লাঞ্ছনা রাষ্ট্রবিধানে সংখ্যালঘুর প্রাপ্য তাই মিহিরকে ভোগ করতে হয়েছিল। আবার মিহির জানাচ্ছেন, তাঁর হিন্দুজনোচিত জাতিবিদ্বেষ ও ছুঁৎমার্গের অন্ত্যেষ্টিও এখানেই শুরু হয়েছিল।

গ্রন্থকার-জমিদার রোহিণী রায়চৌধুরী প্রতিষ্ঠিত প্রসন্নকুমার বিদ্যালয় ঐ এলাকার সবচেয়ে প্রাচীন ইস্কুল। ঐ ইস্কুলে ভর্তি হতে আগ্রহী ছিল মিহির। কিন্তু পুরানো ইস্কুল তাকে ছাড়তে চাইছিল না, যেহেতু সেই ছিল এই বিদ্যালয়ের সেরা ছাত্র। কিন্তু জ্যাঠার চক্রান্তে মোছলমানদের ইস্কুল ছেড়ে মিহিরকে প্রসন্নকুমার বিদ্যালয়ে যেতেই হল। এই বিদ্যালয়ের রেক্টর অশ্বিনীকুমার ছিলেন এক আদর্শ শিক্ষক। মিহিরের আত্মবিকাশে এই শিক্ষকের অবদানের মূল্য অসামান্য। এই চিরকুমার খেয়ালি মানুষটি ছিলেন অসম্ভব পণ্ডিত। প্রসন্নকুমার বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে এই মানুষটির সান্নিধ্য পেয়ে মিহির অপার আনন্দে অবগাহন করে। ইংরেজি অনুবাদে ব্যাকরণগত শুদ্ধিতে অশ্বিনীকুমার প্রীত হতেন না। তিনি বলতেন, ইংরেজি স্মার্ট ভাষা, অনুবাদকেও স্মার্ট হতে হবে। ইংরেজি ইতিহাস সংস্কৃত এই তিনি বিষয়ে মাস্টারডিগ্রিধারী এই বৃদ্ধ নিবিড় স্নেহে মিহিরকে আপন করে নেন। অশ্বিনীকুমারের ভাইরা দেশছাড়া, ছাত্ররাই তাঁর সব। স্যারের বাড়িতে গুরুগৃহবাসের মতো মিহির বাস করে। রাত্রিতে আরও অনেক ছাত্র বাড়িতে থাকে, স্যার তাদের বিনা বেতনে পড়ান। রাত্রে তাঁর অজ্ঞাতে সমবেত কিশোরেরা বয়সোচিত নানা অপকর্ম করত। একবার বড়ো ছাত্রদের প্ররোচনায় স্যারের ত্রুটিবিচ্যুতির অছিলায় ছাত্রেরা ক্লাস ছেড়ে বেরিয়ে ধর্মঘট করে। সদাশিব মানুষটি, যিনি ইস্কুলে বাড়িতে বিনা বেতনে ছাত্রদের পড়াতেন, এই ঘটনায় দারুণ আহত হন। ক্ষুব্ধ বৃদ্ধ ইস্কুলের সংশ্রব ত্যাগ করে বাড়ি চলে গেলেন। তিনি সকালে পান্তা খেয়ে নিজের গোরুদের মাঠে চরাতে নিয়ে যান। গোরু নিজের মনে চরে, আর তিনি গাছের তলায় বসে পড়েন ব্যাকরণ-কৌমুদী বা নেসফিল্ড বা কালিদাসের রচনা। পরে সবাই অনুতপ্ত হয়। মাস্টারমশাইদের কথায় স্থির হল ছাত্রেরা স্যারের পায়ে ধরে ক্ষমা চাইবে। হাকিম আর মুসা রাজি হয় না, কারণ পায়ে ধরা ইসলামে বারণ। সবাই স্যারের কাছে গেল, মৌলবি স্যারের ও অন্যান্য ছাত্রদের চাপে অন্যান্য ছাত্রদের সঙ্গে হাকিম-মুসাও স্যারের পা ধরতে যায়। স্যার তাদের ক্ষমা করে দেন, আর মুসলমান ছাত্রদের পায়ে ধরতে দেন না, যেহেতু ইসলামে নিষিদ্ধ। প্রণামের প্রথা, সিজদা, তসলিম ইত্যাদি বিষয়ে ব্যাখ্যা করে শিক্ষা দেন, এই সুযোগেও। তিনি ইস্কুলে আসতে সম্মত হলে ছাত্রেরা মিছিল করে তাঁকে নিয়ে আসে। অশ্বিনীকুমারের শিক্ষা ও সাহচর্যে

মিহিরের চিত্তের মুক্তি ঘটে, তার উত্তরণ ঘটে। স্যার নীরস মানুষ ছিলেন না, শুধু পাঠ্যপুস্তক পড়ার জন্য চাপ দিতেন না। তিনি সংস্কৃত কাব্য ও নাটক পড়ে শোনাতেন প্রিয় ছাত্রটিকে। তাঁরই শেখানো মেঘদূতের শ্লোক বৃষ্টিপাতের সঙ্গে মিলিয়ে মিহির কিশোরকণ্ঠে আবৃত্তি করত। স্যার খুশি হলে পাটালিগুড় খেতে দিতেন। বাড়ির দুরবস্থার খবর ছোটভাই ছোটন দিলে স্যারের কাছে বাড়ি যাবার অনুমতি চায় মিহির। স্যারের দুশ্চিন্তা মিহির বাড়ি নিয়ে ভাবলে তার পড়ার কী হবে। মিহিরের বাবার উপর স্যারের রাগ—সিগারেট খাবার জন্য, সন্তানাধিক্যের জন্য আর সামন্ততান্ত্রিক অকর্মণ্যতার জন্য। বাবার সঙ্গে আলোচনার পর সপ্তাহে দু'দিন বাড়ি থাকার অনুমতি দেন স্যার—কেননা মা ও ভাইবোনরা 'রোজই ফোঁপায়'। বুঝতে পারি, সত্তর সালের কোনো সময়ে পশ্চিমবঙ্গে চাকরিস্থলে বসে স্যারের মৃত্যুসংবাদ পেয়ে কেন মিহির, 'একটা দামড়া ছেলে', হাউহাউ করে তার ডেস্‌কে বসে কেঁদেছিল।

শেষে চলে আসি দু'জন নারীর কথায়, যাঁদের সান্নিধ্য মিহিরের জীবনকে, উপলব্ধিকে পুষ্টি দিয়েছিল। প্রথম জন দাদীআম্মা। কিশোর মিহিরকে পরিবারের জন্য অন্নের জোগাড় করতে হতো। পিছারার খালের নিকটবর্তী বড়খালে হিন্দু-মুসলমান ছেলেরা কুচো চিংড়ি ধরত। মিহির অন্যদের মতো দক্ষ ছিল না, তার কোঁচড়ে বেশি চিংড়ি জুটত না। মিহির ভাবত, 'আমি কেন ওদের ঘরে জন্মাইনি? আমি কেন ওদের মতো এইসব কাজের অন্ধিসন্ধি জানি না?' মিহিরকে দাদীআম্মা ডেকে নেন এবং তার পারিবারিক পরিচয় পেয়ে 'হায় আল্লাহ্' বলে আর্তনাদ করে ওঠেন। তাকে গা-হাত-পা মুছতে বলে এবং বিশ্রাম করতে বলে তামার পাত্রে মিষ্টান্ন, কাটা ফল ও ডাবের জল এনে দিলেন—'এগুলা খাও। এ খাবার খাইলে য়িন্দুগো জাইত যায় না। মুই জানি।' অনন্ত ক্ষুধায় কিশোর সব খায়। বিশ্রামের আদেশ দেন স্নেহময়ী বৃদ্ধা। সেই থেকে দাদীআম্মার সঙ্গে প্রগাঢ় আত্মীয়তার বন্ধনে বাঁধা পড়ে যায় মিহির। এরপর থেকে কখন তিনি জল থেকে উঠে আসতে বলবেন তার জন্য কাঙাল কিশোর অপেক্ষা করে থাকত। সারাদিন সে দাদীআম্মার বাড়িতে থাকতে শুরু করে, যা হাতে ধরে দেন তাই খায়। পাঁচ কান করতে বারণ করেন, জানাজানি হলেই জাত যায়। 'না মুই শরীয়তী মোমেন মোছলমানের বেওয়া, না তুই নিয়মের য়িন্দু। মোর গো হিসাবকিতাব বেয়াক আলাক্।' দাদীআম্মার সংসারে চতুর্থ নাতি হিসেবে প্রতিষ্ঠা পায় মিহির, কিন্তু এই খবর তার অভিভাবকেরা জানে না। মোছলমান বাড়িতে খায় জানলে জ্যাঠা কঠোর শাস্তি দিতেন, বাবাও প্রসন্ন হতেন না। দাদীআম্মার নাতনি শিরি দাওয়াত দেয় আউস চালের ফ্যানাভাত তাদের সবার সঙ্গে মিলে খাবার। দাদীআম্মা নাস্তা তৈরি করেন ঘুষাচিংড়ি, নারকেল বাটার বড়া আর ফ্যানাভাতের। সেই স্বাদ মুখে মরার আগের দিন পর্যন্ত লেগে থাকবে। হাপুশ-হুপুশ আহারের ফাঁকে জাত কোন দিকে দিয়ে চলে গেল জানা

গেল না। পিছারার খালের আশপাশের গ্রাম বসতিশূন্য হওয়ায় যে নিঃসঙ্গতা আর বিষাদে একটি বালক আচ্ছন্ন হচ্ছিল তা সে পরে খানিকটা ভুলে যেতে পারে দাদীআম্মার জগতে স্থাপিত হওয়ায়। পরবর্তীকালে এই দাদীআম্মার আগ্রহেই সে ইস্কুলে ভর্তি হতে পারে। আরও পরবর্তীকালে এমন দাদীর নাতনি শিরি ধর্মবাতিকগ্রস্ত হয়েছিল দেখে বেদনাবোধ করেছিলেন মিহির। 'মাথার চুলে সবিতৃচ্ছটা, লোলচর্ম ক্ষীণদৃষ্টি, শুভ্রবস্ত্র রমণীর ছবি সারা জীবন স্বপ্নেজাগরণে থেকে যায়।'

সব শেষে আর এক নারীর কথা, তিনি অবস্থা বিপাকে বাধ্য হয়েছিলেন পতিতার জীবন যাপনে। বন্ধু অহীন মিহিরকে এই নারীর কাছে নিয়ে গিয়েছিল। অহীন তাঁকে মাসিমা বলে ডাকত। মিহির বরিশালে যে দাদার আশ্রিত ছিল সেই দাদার সম্পর্কিত মাসিমা বলে তিনি পরিচিত ছিলেন, কিন্তু আদতে ছিলেন তাঁর আপন মাসিমা। কুখ্যাত বরিশাল রায়টে বাড়িতে আগুন লাগানো হলে এই মহিলার স্বামী অগ্নিদগ্ধ হয়ে মারা যান এবং এই মহিলা হন গণধর্ষিতা। যখন তাঁকে পাওয়া যায় তখন তিনি অজ্ঞান, শরীর তাঁর ক্ষতবিক্ষত এবং সেই শরীরে একগাছা সুতোও নেই। এক সহৃদয় ইসলাম-ধর্মাবলম্বী মানুষ তাঁকে আশ্রয় দেন। বাপের বাড়ির খোঁজ নিয়ে জানা যায় তারা সবাই হিন্দুস্থানে চলে গেছে। বঙ্গবাসী কলেজে পড়ুয়া ছেলেও মাকে নিতে আসেনি, কারণ তিনি ধর্ষিতা এবং মুসলমান বাড়িতে অন্নগ্রহণ করেছেন বলে জাতিচ্যুত। হিন্দুসমাজের এই নির্মমতায় ঐ আশ্রয়দাতা ভদ্রলোক দুঃখ প্রকাশ করেন। ব্যাংকে সঞ্চিত স্বামীর টাকাও তিনিই উদ্ধার করে দেন। সেই টাকা ফুরিয়ে যেতে সময় লাগে না। যতদিন ঐ সহৃদয় ধর্মে-মুসলমান মানুষটি বেঁচে ছিলেন ততদিন দু'মুঠো অন্ন জুটত। তাঁর মৃত্যুতে এই মাসিমা যথার্থই নিরাশ্রয় হলেন। তখন বাড়ি বেচে তিনি উঠে আসেন পতিতাপল্লীর পাশে সস্তার খুপরিতে। সেই বাড়ি বেচা টাকাও ফুরোলে 'কুপি হাতে দরজার কাছে একদিন দাঁড়াতেই হলো।' পতিতাবৃত্তি গ্রহণের জন্য দূর স্বজনেরা খুব ছিঃ ছিঃ করল। তাঁর নামে নানা গুজব রটল, এমনকি বলা হল যে স্বামীকে পুড়িয়ে মারার ব্যাপারে তিনি নিজেই জড়িত ছিলেন! তিনি যৌনরোগগ্রস্ত হলে সেই দাদা যিনি মিহিরকে আশ্রয় দিয়েছিলেন এবং যাঁর আপন মাসিমা ছিলেন এই মহিলা, তিনি মাসিমাকে চিকিৎসা করিয়ে রোগমুক্ত করেন। কিন্তু স্ত্রীর বাধায় তাঁকে আশ্রয় দিতে পারেননি, যদিও এই স্ত্রীও কোন সচ্চরিত্রা নারী ছিলেন না। এই বউদির অনুপস্থিতিতে মাঝে মাঝে দুপুরবেলা মিহিরের আশ্রয়দাতা দাদার বাড়িতে যেতেন তিনি। দাদার দুরন্ত ছেলেটি তাঁর কাছে শান্ত হয়ে বসে থাকত। বউদি এই মাসিমাকে 'খানকি' বললে দাদা চড় মারেন এবং বলেন, মাসিমা অভাবে তাই করেছেন যা তাঁর দুশ্চরিত্রা স্ত্রী স্বভাবে করছে। স্ত্রীকে চড় মারার জন্য এবং ঐ কথা বলার জন্য মাসিমাই এই দাদাকে তিরস্কার করেন। অহীন যখন মিহিরকে মাসিমার কাছে পতিতাপল্লী সংলগ্ন খুপরিতে নিয়ে যায়,

তখন মাসিমা তাকে জলবাতাসা দিয়ে অভ্যর্থনা করেন। মাসিমা ও তাঁর সহচরী অন্য বৃদ্ধ বারাঙ্গনাদের আজ ভিক্ষা করে দিন চলে। আজ এক দল ভিক্ষায় গেছে, অন্য দল ঘরে থাকবে। মাসিমার সম্বন্ধে শুনে এবং মাসিমার সঙ্গে আলাপ করে, 'আমি টের পাচ্ছিলাম আমার মধ্যে একটা যেন অন্য বোধের অঙ্কুরোদ্‌গম হচ্ছে। আমি ব্যক্তিক এবং পারিবারিক সুখদুঃখের সীমাবদ্ধতা কাটিয়ে বৃহত্তর দুঃখের জগতে প্রবেশ করতে চলেছি, অহীন হাত ধরে আমায় নিয়ে যাচ্ছে। ..... আমার এই নতুন বোধের গুরু অহীন, এবং তাত্ত্বিকগ্রন্থ মাসিমার অলিখিত জীবনসংগ্রামের কথা।'

পরীক্ষা দেওয়া হলো না, অথচ জলপানির অনেকগুলো টাকা হাতে এল। হতাশ মনে শহর ছেড়ে চলে যাবার আগে মিহির খোলা-হাতে খরচ করে। জীবনে প্রথম রেস্তোরাঁয় খায়, মা-বাবা-বোনের জন্য, নিজের জন্য জামাকাপড় কেনে। চলে যাবার আগে দুর্ভাগিনী মাসিমার কথা মনে পড়ে তার। স্থির করে, লোকাপবাদের ভয় না করে সে মাসিমার ঘরে শেষ রাত্রিটি কাটাবে। গরম তার পকেট, কার্পণ্য করল না সে বাজার করায়। মাসিমা আর তাঁর সহচরীরা তার কেনা সওদায় চমৎকার রান্না করেন। সন্ধ্যাযাপন করে মিহির তাঁদের সঙ্গে গল্পগুজবে। মানুষ কী বলল তার তোয়াক্কা যদিও আজ আর করে না মিহির, কিন্তু মাসিমা তা বুঝবেন না। তিনি খুব ভোরে মিহিরকে তুলে দেন, যাতে লোকের লক্ষ্যগোচর হওয়ার আগে সে পতিতাপল্লী থেকে বেরিয়ে যেতে পারে। যাতে কোনো কলঙ্ক এই কিশোরকে স্পর্শ করতে না পারে। মাসিমার সান্নিধ্যে মিহির এই শিক্ষা পেয়েছিল যে একটা জায়গায় সবার মিল আছে—পেটে আর পেটের জ্বালায়। আর সেই পেটের জ্বালা মেটাবার একটাই মূলধন, তা হল দৈহিক শ্রম। 'দেহই আমাদের অগতির গতি'। দৈহিক শ্রম দিয়ে মিহির পরিবারের সবার মুখে অন্ন তুলে দিয়েছিল, মাসিমাও দুর্দিনে বাঁচার তাগিদে দেহকে আশ্রয় করেছিলেন। এই জায়গায় মিল ছিল বলেই মিহির মাসিমা ও তাঁর সঙ্গিনীদের সঙ্গে 'এক কামারাদারি অনুভব' করেছিল।

সংখ্যাগুরু-সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সম্পর্কের রাজনৈতিক বোধ এই কিশোরের মনে জন্মেছিল পূর্ব পাকিস্তানের বিশেষ পরিস্থিতির বাধ্যতায়। কলেজে পড়তে-পড়তে পূর্ব পাকিস্তানের ভাষা-আন্দোলনে ও সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে প্রান্তিকভাবে জড়িয়ে পড়ে সে। সেই আমল জাঁদরেল প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খানের আমল। তিনি কলেজ পরিদর্শন করে কলেজকে ধন্য করবেন। ইউনিভার্সিটি ক্যাডেট কোরের সদস্য হিশেবে মিহিরকে সামরিক সাজে সারিবদ্ধ অভ্যর্থনায় যোগ দিতে হয়। মোট লাভ হয় দুই প্রস্থ পোশাক আর এক জোড়া জুতো। হোক না সামরিক, তাকে অনেক দিন জামা-কাপড়-জুতো কিনতে হবে না। লীগ চায় বরিশাল টাউন হলের নাম রাখা হোক আইয়ুব খান টাউন হল। এই সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে গড়ে ওঠে আন্দোলন।

জনমত অগ্রাহ্য করে সরকারিভাবে টাউনহলের নাম রাখা হয় এ কে টাউন হল। লোকে স্থির করে, এ কে মানে অশ্বিনীকুমার, সুতরাং হলের নাম, সরকার যাই বলুক, আদতে অশ্বিনীকুমার টাউনহল। ইতিমধ্যে ভাষা আন্দোলন তীব্রতা পায়, আইয়ুব খানের পতন আসন্ন হয়ে ওঠে। এইসব আন্দোলনে জড়িয়ে পড়ে প্রসারিত হয় এক কিশোরের রাজনৈতিক চেতনা।

ছোট-মিহির যা দেখে, বড়-মিহির যে-সব কথা লেখেন, তার সাক্ষী থাকে পিছারার খাল এবং সর্বংসহিষ্ণু এক বৃদ্ধ বৃক্ষদম্পতি। সজাগ সতর্ক ঐ বৃক্ষদম্পতি যেন কুলপতি ও কুলপত্নী; তারা উত্থানপতন সব দেখেছে। তাদের বয়স দুই শতক ছাড়িয়ে আরও খানিকটা। 'তাঁরা বাক্য বলেন না। ইশারা ইঙ্গিতে পাতা ঝরিয়ে শাখা কাঁপিয়ে নির্দেশ জারি করেন।' বড়খালের পাড়ের সেই বিশাল মহীরুহ, সেই জোড়া রেনট্রি, হিন্দু-মুসলমান দুই সমাজেরই নমস্য অতি বৃদ্ধ প্রপিতামহের মতো। সব স্মৃতি হয়ে যায়, সব ছায়া-ছায়া হয়ে যায়, শুধু মনের মধ্যে জেগে থাকে এই বিষণ্ন বৃক্ষদম্পতির কথা। 'ঘুমের গভীর থেকে মাথা তুলে দাঁড়ায় এক বিশালকায় দেবোপম বৃক্ষ। সময়ের খালের জলে তারই বিষণ্ন প্রচ্ছায়া। ঝুরুঝুরু করে বৃক্ষ তাঁর পাতা ঝরিয়ে যাচ্ছেন, যেন অঝোরে কাঁদছেন। যেন অসহায় এক প্রাচীন কুলপতি তাঁর অবাধ্য দুঃশাসনীয় গোষ্ঠীর আত্মঘাতী মাৎস্যন্যায়ী আচরণে মুহ্যমান। ....(এই জনপদের মানুষেরা) এই জনপদে আর তারা থাকবে না। থাকবে না এই কুলপতির ছত্রচ্ছায়ে। এই জনপদ আর তাদের নয়, এ রকম বার্তা।' উচ্ছিন্ন, এক জনগোষ্ঠীর মর্মঘাতী বেদনাময় বার্তা এই বিষণ্ন স্মৃতিকথার পৃষ্ঠায়-পৃষ্ঠায় দীর্ঘশ্বাস হয়ে জড়িয়ে আছে। সেই বার্তা আমরা পড়ি আর এক বিপন্ন বিষাদ আমাদের আচ্ছন্ন করে।

‘মানুষ মেরেছি আমি’

একদিকে ইয়াসিন হানিফ মহম্মদ মকবুল করিম আজিজ, অন্যদিকে গগন বিপিন শশী। কেউ মানিকতলার, রাজাবাজারের, খিদিরপুরের, কেউ পাথুরেঘাটার শ্যামবাজারের গ্যালিফ স্ট্রিটের। জীবনের ইতরশ্রেণীর মানুষ এরা যারা ছেঁড়া জুতো পরে বাজারের পোকাকাটা জিনিসের কেনাকাটা করে, তাদের দাঙ্গায় লিপ্ত করানো হয় আর রক্তনদী উদ্বেলিত হয়। সংশয়ে-সন্দেহে সমাজ দীর্ণ হয়ে যায় আর সেই ভাঙনের পথে, দেশভাগের পথে ভারতীয় উপমহাদেশে, যাকে এখন আমরা দক্ষিণ এশিয়া বলি, তার ঔপনিবেশিক অস্তিত্বের অবসান হয়ে, স্বাধীনতা আসে। এই দক্ষিণ এশিয়ার আধুনিক ইতিহাসে স্বাধীনতা ততো নয়, যতো স্বাধীনতার সঙ্গে জড়ানো দেশভাগ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক ঘটনা। এক-এক সময় মনে হয় ১৭৫৭ সালের পলাশি যুদ্ধ থেকে, ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহ থেকে, সমস্ত ইংরেজ আমল ধরে যেন ভিতরে-ভিতরে নানা কার্যপরম্পরার মধ্য দিয়ে চলছিল এই দেশভাগের প্রস্তুতি, দেশভাগের কারণগুলি যেন পারস্পরিক জটিলতায় গ্রন্থিবদ্ধ হচ্ছিল, আর ১৯৪৭ সালের পর থেকে যা-কিছু এই বিশাল ভূখণ্ডে ঘটেছে সবই যেন এই দেশভাগের পরিণাম। যখন বরফে-ঢাকা হিমালয়ের দুর্গমতায় সৈনিকের গুলিবিনিময় হয়, যখন জলবণ্টন নিয়ে বিরোধ বাধে, যখন শ্রীনগরে বিস্ফোরণ হয়, যখন চাকমারা দেশত্যাগ করে, যখন উর্দুর পাশাপাশি বাংলাকেও রাষ্ট্রভাষা করার জন্য আন্দোলন তীব্র হয়, যখন করাচির রাস্তায় আদিবাসিন্দাদের সঙ্গে উদ্বাস্তুদের দাঙ্গা বাধে, যখন অনুপ্রবেশ নিয়ে বিতর্ক শাণিত হয়, কাঁটাতারের বেড়া দেওয়া হয়, ছিটমহল বিনিময় নিয়ে অফুরন্ত আলোচনা চলতেই থাকে, যখন কিছু সাপুড়ে দুই সীমান্তের মাঝখানে মানবশূন্য ভূখণ্ডে আটকে পড়ে দিন কাটায় রাত কাটায়, তখন ১৯৪৭-এ ঘটে যাওয়া দেশভাগ আর অতীত থাকে না, ঘটমান বর্তমান হয়ে ওঠে।

এখনো বহু মানুষের সত্তার মধ্যে উপস্থিত, তিন দেশের রাজনৈতিক জীবনে, সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনে উপস্থিত দেশভাগের প্রচণ্ড অভিঘাত নিয়ে, অনেক সাহিত্য রচিত হয়েছে। যতো সাহিত্য রচিত হতে পারত, হওয়া উচিত ছিল ততো হয়নি, যে মহাকাব্যিক স্তরের সাহিত্য প্রত্যেক ভাষায় রচিত হতে পারত তা হয়নি। অনেক ক্ষেত্রে যেমন রাষ্ট্র, তেমনি বেসরকারি সমাজ, এমনকি সাহিত্য পরিকল্পিত মৌন পালন করেছে। ভয়ংকর সত্যের মুখোমুখি হতে ভয় পেয়েছে, অন্ধকার গহ্বরের

দিকে তাকাতে সাহস পায়নি, অথবা তাত্ত্বিক কারণে খাদের কিনারা থেকে পিছিয়ে এসেছে। যা ছিল অখণ্ড ব্রিটিশ ভারতবর্ষ তার পশ্চিমাংশ নিয়ে, সেখানকার দাঙ্গা, প্রতিরোধ, মানবিকতা-অমানবিকতা, হিংসা-প্রেম, মাইগ্রেশন নিয়ে পাঞ্জাবি, ইংরেজি, উর্দু, হিন্দি, সিন্ধিতে অনেক উপন্যাস ছোটগল্প লিখেছেন ওইসব ভাষার কথাসাহিতিকেরা। লিখেছেন সাদাত হোসেন মান্টো, কৃষণ চন্দর, ইসমৎ চুগতাই, কুরতুলেইন হায়দার, খুশ্‌বন্ত সিং, ভীষম্ সাহনি, রাজিন্দর সিং বেদী, কর্তার সিং দুগ্‌গাল, খাজিদা মসতুর, অমৃতা প্রীতম্, যশপাল, আবদুল্লা হুসেন, বালচন্দ্রন রাজন ইত্যাদি ইত্যাদি। পূর্ব ভারতেও দেশভাগের অমোঘ খড়্গ নেমে এসেছিল। বিভক্ত হয়েছিল বঙ্গদেশ। সেই বাংলা, যার অখণ্ডতা বজায় রাখার জন্য পঞ্চাশ বছর আগে ঘটেছিল স্বদেশি আন্দোলন। আসামের শ্রীহট্ট জেলাকে কেটে জুড়ে দেওয়া হয়েছিল পূর্ব পাকিস্তানের সঙ্গে। পুব বাংলা থেকে হিন্দু বাঙালির উৎখাত হওয়া নিয়ে, তার গণ-প্রব্রজন নিয়ে, ছিন্নমূল লক্ষ-লক্ষ মানুষের নতুন করে ভারতবর্ষে বসতিস্থাপন নিয়ে বাংলায় বেশকিছু উপন্যাস ছোটগল্প লেখা হয়েছে, কিছু নাটক লেখা হয়েছে, চলচ্চিত্রও নির্মিত হয়েছে। অসমীয় ভাষাতেও কিছু কথাসাহিত্য এই বিষয়ে মেলে। পশ্চিম বাংলা থেকে পূর্ব পাকিস্তানে বাঙালি মুসলমান উদ্বাস্তুর চলে যাওয়া নিয়ে দেশভাগের কথাসাহিত্য তুলনায় কম লেখা হয়েছে। সেই চলে-যাওয়া মানুষের সংখ্যা যেহেতু ছিল তুলনায় কম, তাদের পুনর্বাসনে অসুবিধা হয়েছিল যেহেতু কম এবং যেহেতু দেশভাগের যন্ত্রণা ও ছিন্নমূল হওয়ার বেদনার চেয়ে তাদের মধ্যে বড়ো হয়ে উঠেছিল ইংরেজশাসন ও হিন্দু-আধিপত্য থেকে মুক্ত এক নতুন স্বদেশ গড়ে তোলার স্বপ্ন। কিন্তু ১৯৪৬-৪৭ এবং পরবর্তীকালের দাঙ্গার ফলে বিহারি মুসলমানরা যে ভারত ছেড়ে পাকিস্তানে চলে গিয়েছিল, তাদের কথা একেবারে অনুক্ত থেকে গেছে, যেমন ইতিহাসে তেমনি সাহিত্যে। কেমন করে তারা উৎখাত হলো, কীভাবে তারা পথে নামল, কীভাবে বেরোল নতুন শিকড়ের সন্ধানে, কী হলো তাদের উত্তরকালের নিয়তি, তার উত্তর খোঁজেনি বাংলাসাহিত্য তো বটেই, হিন্দি সাহিত্যও। পশ্চিম ভারতের দেশভাগ নিয়ে লেখা বিরাট উর্দু সাহিত্যের মধ্যে পূর্বভারতের দেশভাগ নিয়ে, বিহারি মুসলমান মানুষদের নিয়ে একটিমাত্র উর্দু উপন্যাস আমার নজরে এসেছে। সেটি আবদুস সামাদের লেখা 'দো গজ জমিন' যার সাহিত্য অকাদেমি প্রকাশিত বাংলা অনুবাদের নাম 'সাড়ে তিন হাত ভূমি'। আর পড়েছি উম্-এ-উম্মারার দু-একটি গল্প।

মুসলিম লীগের প্রত্যক্ষ সংগ্রামের ডাকে কলকাতায় নরক নেমে এসেছিল। তাকে দাঙ্গা বললে কমিয়ে বলা হয়, পরিস্থিতি বর্ণনা করতে গিয়ে স্টেটসম্যান পত্রিকা মধ্যযুগের ইতিহাস থেকে একটা শব্দ তুলে এনে একে বলেছিল 'fury'। কিন্তু 'fury' শব্দটি স্বতঃস্ফূর্ততা বোঝায়, কিন্তু কলকাতা হত্যাকাণ্ড স্বতঃস্ফূর্ত ছিল না, ছিল পরিকল্পিত। কলকাতায় জাহাজে, জাহাজঘাটে কাজ করত নোয়াখালির অনেক

মুসলমান লস্কর। কলকাতার দাঙ্গার প্রত্যাঘাতে তারা কেউ-কেউ নিহত, ক্ষতিগ্রস্ত হয়, অনেকে ফিরে যায় নিজের জেলায়। এবং প্রতিক্রিয়ায়, কলকাতায় প্রত্যাঘাতের প্রতিশোধ নেবার উদ্যোগে, সেখানে শুরু হয় হিন্দু-বিরোধী দাঙ্গা। এই ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার তত্ত্ব আমরা বারেবারে পাব। শুধু সম্প্রতিকালের গোধরা-পরবর্তী দাঙ্গায় ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার তত্ত্বের মুখোমুখি হইনি আমরা। এই ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার তত্ত্ব চলে আসছে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-বিসংবাদের ক্ষেত্রে অনেক আগে থেকে। কিন্তু ক্রিয়াও যেমন নিজে-নিজে ঘটে না, তাকে পরিকল্পিতভাবে ঘটানো হয়, প্রতিক্রিয়াও তেমনি। বানানো-ক্রিয়াকে অজুহাত করে সচেতনভাবে প্রতিক্রিয়া ঘটানো হয়। নিরপরাধের ভঙ্গিতে সব পক্ষই মুখ মুছে দুঃখিতভাবে বলতে চায়, যা ঘটেছে, প্রতিক্রিয়ায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে ঘটে গেছে। ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় চলে পশুত্বের প্রতিযোগিতা। এইভাবে কলকাতার 'প্রতিক্রিয়া'-য় নোয়াখালিতে দাঙ্গা বাধে। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ফিরিয়ে আনতে সেখানে তিনি হাজির হন, যাঁকে মাউন্টব্যাটেন আখ্যায়িত করেছিলেন One-Man Boundary Force বলে, যাঁকে পেয়ারেলাল বলেছিলেন খালি-পায়ের তীর্থযাত্রী। গ্রামের পর গ্রাম গান্ধিজি কর্দমাক্ত মেঠোপথ দিয়ে হাঁটছিলেন, সাঁকো পার হচ্ছিলেন, মানুষের মনে একদিকে আস্থা, অন্যদিকে শুভবুদ্ধি জাগানোর চেষ্টা করছিলেন।

নোয়াখালি যাত্রার আগেই গান্ধিজির কাছে খবর আসতে থাকে বিহারে দাঙ্গা শুরু হয়েছে। সেখানে ভূমিকা বদলে গেছে, বিহারে আক্রমণকারী হিন্দু আর আক্রান্ত মুসলমান ধর্মের মানুষ। এখানে রক্তপাত হচ্ছে মুসলমানের, পূর্বপুরুষের ভিটে থেকে উৎখাত হচ্ছে মুসলমান। নোয়াখালি থেকে ত্রিপুরায় যখন প্রবেশ করছেন গান্ধিজি তখন তাঁর নজরে পড়ে গাছে ঝোলানো পোস্টার—এখানে কেন, তিনি বিহারে যান, জাতভাইদের নিরস্ত করুন। বিহারে প্রকৃত অবস্থা কী বারবার প্রধান কংগ্রেসনেতা ও মন্ত্রী ডা. সৈয়দ মাহমুদের কাছে গান্ধিজি জানতে চাইলে তিনি গোড়ায় উত্তরে মৌন থাকেন। পরে তিনি তাঁর সচিবের মাধ্যমে এক দীর্ঘ চিঠি লেখেন, জানান মুসলমানদের উপর অবর্ণনীয় অত্যাচার হয়েছে। তিনিও চান, গান্ধিজি নোয়াখালি ছেড়ে এবারে বিহারে আসুন এবং মুসলমানদের দাঙ্গার হাত থেকে বাঁচান। গান্ধিজির কাছে অন্য সূত্রেও রিপোর্ট আসে বিহারে হিন্দুরা যা ঘটিয়েছে তাতে 'happenings of Noakhali seemed to pale into insignificance'। খিলাফত আন্দোলনের সময় হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক বিহারে ভালো ছিল। অনেক শ্রদ্ধেয় মুসলমান ধর্মের মানুষ কংগ্রেসনেতা ছিলেন। কিন্তু পরে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের অবনতি হয়। কংগ্রেস প্রাদেশিক সরকার গঠন করলে তার বিরুদ্ধে মুসলিম লীগ প্রচার করতে থাকে এই সরকার মুসলিম বিদ্বেষী। ১৯৩৯ সালে দেশের মানুষের সম্মতির তোয়াক্কা না করে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে মিত্রপক্ষে ভারতবর্ষের যোগদানের সিদ্ধান্ত নেয় ইংরেজ সরকার। তার

প্রতিবাদে প্রদেশে-প্রদেশে কংগ্রেস মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করলে লীগ যেভাবে মুক্তিদিবস পালন করে তাতে হিন্দু-মুসলমান বিভাজন তীব্র হয়। ডা. সৈয়দ মাহমুদ, অধ্যাপক আবদুল বারির মতো নেতা থাকা সত্ত্বেও ক্রমেই কংগ্রেস হয়ে উঠেছিল হিন্দুর পার্টি, আর লীগ মুসলমানের পার্টি। ১৯৪২-এর ভারত ছাড়ো আন্দোলনে কংগ্রেসের ডাকে মূলত হিন্দুরাই যোগ দিয়েছিল, তাদেরই উপর বর্ষিত হয়েছিল সাম্রাজ্যবাদী দমনপীড়ন। এই সময় মুসলিমরা নীরব দর্শক থাকায় হিন্দুদের মনে ধারণা জন্মেছিল তারা স্বাধীনতার শত্রু, 'tool of British power'। স্বামী সহজানন্দের নেতৃত্বে কৃষক আন্দোলনও পরোক্ষে সাম্প্রদায়িক সম্পর্কের অবনতি ঘটায়। হিন্দু প্রজারা মুসলমান জমিদারদের জমিদারি আক্রমণ করেছিল। ওদিকে মুসলিম লীগের উত্তেজক প্রচারও ইন্ধন জোগায়। তারা মোগল-পাঠান শাসনের পরম্পরার কথা শোনায়; বলে, তারা তরবারি আস্ফালনে সক্ষম বিজয়ী জাতি।

শুকনো বারুদ যখন স্ফুলিঙ্গের অপেক্ষায় তখন কলকাতা ও নোয়াখালির দাঙ্গার খবর এসে পৌঁছতে থাকে বিহারের শহরে গ্রামে। বিহারের বহু মানুষ কলকাতায় কর্মরত ছিল, তারা কলকাতার দাঙ্গায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বিহারের বাসিন্দা বাঙালিদের আত্মীয়স্বজনও সেই Great Calcutta Killing-এ বিপন্ন হয়। সেই দাঙ্গার গল্প 'gruesome, sometimes exaggerated', বিহারে এসে পৌঁছয় এবং দারুণ উত্তেজনা সৃষ্টি করে। হিন্দু মহাসভার পক্ষ থেকে, ভূস্বামীদের পক্ষ থেকে প্রচারপত্র বিলি করা হয়, বাংলার সরকার হিন্দুদের রক্ষার জন্য কিছুই করছে না এই অভিযোগ করে। হিন্দু মহাসভা কলকাতা ও নোয়াখালিতে মুসলমানদের অপকর্মের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেবার আহ্বান জানায়। কংগ্রেসের নেতৃত্বে বিরাট-বিরাট আক্রমণাত্মক সশস্ত্র মিছিল বেরোয় বিহারের শহরগুলিতে। ১৯৪৬ সালের ২৫ অক্টোবর কলকাতার ও পূর্ববঙ্গের ঘটনার বিরুদ্ধে অনেক প্রতিবাদসভা সংগঠিত হয়। সংবাদপত্রগুলি দায়িত্বহীনভাবে উত্তেজনা বাড়ায়। ওই সালের ২৬ অক্টোবর তারিখে সার্চলাইট পত্রিকায় লেখা হয়, 'East Bengal is a challenge to India's manhood'। ওই বছর বাংলায় দাঙ্গার দরুন বিহারে অন্ধকার দেওয়ালি পালন করা হয়। আর মসজিদে-মসজিদে বলা হয়, ওদের শোক আমাদের উৎসব। দাঙ্গা লেগে গেলে বিহারে হাজার-হাজার মুসলমান ধর্মের মানুষের মৃত্যু হয়। ডা. মাহমুদের প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, দাঙ্গার হত্যাকাণ্ডে নির্যাতনে উৎখাত হয়ে সাড়ে তিন লক্ষ মুসলমান বিহার ছেড়েছে বাড়ি জমি গহনা নগণ্য দামে বেচে দিয়ে। তিনি নিজে একটি গ্রামে মৃত মানুষে ভরাট পাঁচটি কুয়ো দেখেন, অন্য এক গ্রামে দশ-বারোটি। আর সব সময় দাঙ্গায় যেমন হয়ে থাকে বিহারের দাঙ্গায়ও তেমনি মারা যায় বুড়ো মানুষ, নারী আর শিশু। তারা বেশির ভাগই গরিব ঘরের মানুষ। মায়ের কোলে থাকা অবস্থায় কীভাবে শিশুদের হত্যা করা হয় মায়েদের মুখে সেই বিবরণও শোনা যায়। বিহারের মুখ্যমন্ত্রী

শ্রীকৃষ্ণ সিংহ এবং ডা. মাহমুদ বিমান থেকে দেখেন, একটি কুঁড়েঘরে নারীশিশুদের বন্দী করে আগুন জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে আর তাদের ঘিরে নারকীয় উল্লাসে লিপ্ত দশ হাজার দাঙ্গাবাজ। এক জায়গায় হিন্দু মহাসভাপন্থী মিল মালিক সাইরেন বাজিয়ে হিন্দু-জনতা জড়ো করে এবং শরণার্থী মুসলমানদের নিয়ে-যাওয়া ট্রেন তাদের হাতে আক্রান্ত হয়। ঠান্ডা মাথায় ঘটানো হয় গণহত্যা। ওই অঞ্চলেরই আর এক জায়গায় ছাদের উপর জড়ো হয় মুসলমানেরা এবং নিজেদের রক্ষায় সচেষ্ট হয় 'with the courage of despair'। যাতে দাঙ্গাবাজদের হাতে না পড়ে সেই কারণে সম্ভ্রমরক্ষায় মেয়েদের হত্যা করে তারা। আত্মরক্ষাকারীদের বন্দুকের গুলি ফুরিয়ে গেলে বিশ হাজার দাঙ্গাবাজের জোয়ার ভাসিয়ে নেয় তাদের। কেউ আত্মরক্ষা করতে পারে না। দেখেশুনে গান্ধিজি বিহারের হত্যাকাণ্ডকে জালিয়ানওয়ালাবাগের নৃশংসতার সঙ্গে তুলনা করেছিলেন।

কিন্তু এই হত্যার বীভৎস উৎসবের মধ্যেও সংবেদনশীল শুভবুদ্ধির মানুষ ছিল। জনৈক হেডমাস্টার ছাত্রদের ও অন্যান্যদের নিয়ে অতন্দ্র পাহারায় থাকেন যতোদিন না এলাকার সব মুসলমানকে জেহানাবাদের নিরাপত্তায় পাঠানো গেছে। তারপরেও তারা পরিত্যক্ত বাড়িগুলিতে পাহারা জারি রেখেছে। পরে একজন মুসলমান গান্ধিজিকে জানায়, তার রেখে-যাওয়া গাজরটি শুকিয়ে গেছে, কিন্তু চুরি যায়নি। এক গ্রামে গোয়ালারা ছয়শো মুসলমানকে রক্ষা করেছে, এক গ্রামের হিন্দুরা প্রতিবেশী গ্রামের চারশো মুসলমানকে আশ্রয় দিয়েছে। দাঙ্গাবাজরা অন্য এক গাঁয়ের মুসলমানদের হত্যা করতে এলে সংঘবদ্ধ হিন্দুরা প্রতিরোধ করেছে। রাজপুত ও মুসলমানদের মিশ্র গ্রামে রাজপুতেরা প্রতিবেশী মুসলমানদের বাইরের আক্রমণ থেকে বাঁচিয়েছে। জনৈক রাজপুত রমণীর বীরত্বে আক্রমণকারী হিন্দু দাঙ্গাবাজেরা প্রতিহত হয়েছে এমন কাহিনী পড়লে মন স্নিগ্ধ হয়।

এই দাঙ্গায়, যেমন অতীতে নোয়াখালিতে এবং সম্প্রতি গুজরাটে হয়েছিল, তেমনি বিহারে 'custodian of law' প্রশাসনের নিরপেক্ষতা তো ছিলই না, বরং ছিল সক্রিয় পক্ষপাত। এই দাঙ্গায় বিহার সরকার ও কংগ্রেসের ভূমিকার তীব্র নিন্দা করেছিলেন সমাজতন্ত্রী নেতা জয়প্রকাশ নারায়ণ। যদিও দাঙ্গা শুরু হয় ২৫ অক্টোবর, পয়লা নভেম্বরের আগে সৈন্যবাহিনীকে ডাকা হয়নি, ৭ নভেম্বরের আগে সেই বাহিনীকে কাজে লাগানো হয়নি। মোমিন সম্প্রদায়ের মুসলমানেরা ছিল কংগ্রেসের একনিষ্ঠ সমর্থক, কিন্তু দাঙ্গায় তাদেরও বিস্তর ক্ষতি হয়। তারা অভিযোগ করে, বহু কংগ্রেস নেতা, কংগ্রেসের ঘোষিত নীতির কথা ভুলে, এই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় সোৎসাহে যোগ দেয়। তাদের অভিযোগের সমর্থন সমকালীন বিবরণ থেকে অনেক মেলে। অল্প দিন পরেই যিনি ভারতের প্রথম রাষ্ট্রপতি হবেন, সেই ড. রাজেন্দ্রপ্রসাদ বলেন, সর্বত্র ধারণা হয়েছে বিহারের দাঙ্গা বাংলার দাঙ্গাপীড়িত হিন্দুদের বাঁচিয়েছে। বিহারের

ভয়ঙ্কর প্রতিক্রিয়া না হলে বাংলার হিন্দুনিধন থামত না। অর্থাৎ বিহারের দাঙ্গার একটা সদর্থক ভূমিকা ছিল! কংগ্রেসের সমর্থকদের দাঙ্গায় অংশগ্রহণের পক্ষে ড. রাজেন্দ্রপ্রসাদ, শ্রীকৃষ্ণ সিংহ, বিনোদানন্দ ঝা যুক্তিবিস্তার করে বলেন, বিহারের দাঙ্গা বাংলায় হিন্দুবিরোধী দাঙ্গার প্রতিক্রিয়ামাত্র। আবার সেই প্রতিক্রিয়ার তত্ত্ব! গান্ধিজি এই যুক্তি মানতে রাজি হননি। জহরলাল নেহরু বলেন, 'There can be no justification for stooping to bestiality, simply because some fellows have lost their heads elsewhere.' ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার তত্ত্বে তাঁর কোনো সায় ছিল না। পূর্বাঞ্চলের সেনাধ্যক্ষ সার ফ্রান্সিস টুকারের হিশাবে বিহারের দাঙ্গায় সাত-আট হাজার মানুষের মৃত্যু হয়, কারো-কারো মতে অনেক বেশি। বিহারের নিকটবর্তী তৎকালীন যুক্তপ্রদেশের গড়মুক্তেশ্বরে এক ভয়ংকর হত্যাকাণ্ড ঘটে। টুকার জানান, এই হত্যার বীভৎসতা তখনই 'stopped solely because the Muslim men, women and children were either dead, or had ran away.' এই দাঙ্গায় বিহারে যুগ-যুগ ধরে বসবাসকারী মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষের অস্তিত্বের ভিত আমূল নড়ে যায়। তারা চলে আসে গ্রাম থেকে শহরে, আশ্রয় নেয় শরণার্থী শিবিরে, তারপর শুরু হয় তাদের বিহারত্যাগ। যেমন ঘটেছিল পাঞ্জাবের দুই অংশে, যেমন ঘটেছিল পুব বাংলা থেকে পশ্চিমে বড়ো আকারে, পশ্চিম বাংলা থেকে পুবে তুলনায় ছোট আকারে। বিহারে মুসলিম উদ্বাস্তুদের মধ্যে লীগ প্রচার করতে থাকল তারা বাংলায় চলুক, বাংলায় তাদের জমি দেওয়া হবে। মুসলিম লীগের সদস্য বণিক ইস্পাহানির ট্রাক গ্রামে ঘুরে-ঘুরে ছিন্নমূলদের বাংলায় যেতে উৎসাহ দেয়, কেননা বাংলাই হলো তাদের পক্ষে 'land of promise'। দেশভাগের পর পশ্চিম থেকে গণপ্রব্রজনে যারা পুব বাংলায় চলে গিয়েছিল তাদের একটা বড়ো অংশই ছিল অবাঙালি মুসলমান, মূলত বিহারি মুসলমান। এরা সবাই যে বিহারি ছিল তা নয়, তবে ভারত থেকে চলে যাওয়া প্রায় দশ লক্ষ উর্দুভাষী মুসলমানদের 'বিহারি' বলেই পূর্ব পাকিস্তানে চিহ্নিত করা হতো। এদের পরিস্থিতি পরে হয়েছিল 'most tragic and deplorable.'

বিহার শরিফ থেকে কিছু দূরে একটা গ্রামের নাম বিন। এই বিনে জন্মেছিল শেখ ইলতাফ হোসেন। তাঁর উত্তরপুরুষের কাহিনী নিয়ে, বিহারের দাঙ্গার পটভূমিকায় লেখা হয়েছে আবদুস সামাদের 'দো গজ জমিন'। শেখসাহেব খেলাফত আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন, সেই সূত্রে বিন গাঁয়ে আসেন মৌলানা শওকত আলি, মৌলানা মহম্মদ আলি, গান্ধিজি। শেখসাহেব বড়ো জমিদারির মাত্র ছয় আনার শরিক ছিলেন, কিন্তু সম্মানে ছিলেন ষোল আনার অধিকারী। তাঁর ঠাকুরদার ইচ্ছে ছিল নাতবউ যেন খাঁটি সৈয়দবংশীয়া হয়। তেমনি বধূ ঘরে এলেন। তাঁর আচার-আচরণে ফুটে উঠত ঐতিহ্যের নিখাদ পরিচয়, তাতে বাড়ির অন্য বউদের চালচলন যেন ম্লান হয়ে গেল।

তিনি বিবিসাহেবা অভিধা পেলেন, সারা জীবন পেলেন প্রগাঢ় মান্যতা। সংসারে শ্রী ফিরে এল, ছেলেমেয়েদের পড়াশুনার দিকে নজর দেওয়া হলো। কালক্রমে তিনি হলেন আটটি সন্তানের জননী। গ্রামের শিক্ষার ও চিকিৎসার ভালো সুযোগ ছিল না বলে বিবিসাহেবার পরামর্শে বিহার শরিফে এক হাবেলি নির্মাণ করা হলো, যার নাম বিনহাউস। ইলতাফ হোসেন পরবর্তীকালে স্বাধীনতা আন্দোলনেও যোগ দিলেন, যখন খেলাফত আন্দোলন স্বাধীনতা আন্দোলনে রূপান্তরিত হলো। বিনহাউস হয়ে উঠল ওই এলাকায় স্বাধীনতা আন্দোলনের কেন্দ্রবিন্দু। যারা আন্দোলনে যোগ দিয়ে কারাগারে যেত জাতিধর্মনির্বিশেষে তাদের পরিবারবর্গকে অর্থসাহায্য দিতেন শেখসাহেব। শহরে থাকার ফলে তাঁর রাজনৈতিক ব্যস্ততা বেড়ে গেল। অতিথিতে বাড়ি গমগম করত, দিনরাত্রি উনুন জ্বলত, বাবুর্চিখানা সর্বদাই ব্যস্ত।

শেখসাহেবের বড়ো ছেলে সরোয়ার হোসেন প্রাইভেটে এনট্রান্স পরীক্ষা দিয়ে ভালো ফল করে ও প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়তে যায়। মেজছেলে আসগার হোসেন এনট্রান্সের জন্য তৈরি হচ্ছে। সরোয়ার হোসেন ছুটিতে বাড়ি এলে শেখসাহেব নিজের অনাথ ভাইঝির সঙ্গে তার বিয়ে দেন। বয়সে বড়ো, যাকে সরোয়ার বিয়ের আগে দিদি বলে ডাকতেন, তার সঙ্গে এই বিয়ে একেবারেই সুখের হয়নি। এই স্ত্রী অপ্রকৃতিস্থা হয়ে যান, ঘৃণা করতে থাকেন নিজের স্বামীকে। পরবর্তীসময়ে সরোয়ার এক উকিলবন্ধুর মেয়েকে বিয়ে করেন। দ্বিতীয় বিবাহে আহত বিবিসাহেবা ছেলের সঙ্গে সব সম্পর্ক ছিন্ন করেছিলেন। শেখসাহেবের ভাগনে আখতার হোসেন কলকাতায় বি.এ. পরীক্ষা দিয়ে এলে তার সঙ্গে নিজের বড়ো মেয়ের বিয়ে দিলেন। আখতার হোসেন তাই হলেন শেখসাহেবের ভাগনে এবং জামাই। ইনিই হলেন উপন্যাসের প্রথমাংশের প্রধান চরিত্র। অন্যদিকে মেজ ছেলে আসগার হোসেন এনট্রান্স পরীক্ষা দিয়ে বাড়ি ফিরলে তাকে শেখসাহেবের ইসলামপুরবাসী মামা নিমন্ত্রণ করেন এবং নিজের পিতৃমাতৃহীন নাতনির সঙ্গে, শেখসাহেবকে না জানিয়ে, বিয়ে দিয়ে দেন। এই মামা ছিলেন ইংরেজদের ধামাধরা। নিজের ছেলেকে ব্যারিস্টার করার জন্য বিলেতে পাঠিয়েছিলেন, ইসলামপুরে আমেরিকার রাষ্ট্রপতির সরকারি ভবনের আদলে হোয়াইট হাউসের মতো এক বিরাট হাবেলি বানিয়েছিলেন। তিনি খাওয়ার জন্য কাঁটাচামচ ব্যবহার করতেন। তাঁর বাড়িতে একবার ইংরেজ লাটসাহেব এলে তিনি মাইলের পর মাইল লাল কার্পেট বিছিয়ে আনুগত্য জানিয়েছিলেন। এই মামা তাঁর ভাগনে শেখ ইলতাফ হোসেনের ইংরেজ বিদ্বেষকে ঘৃণা করতেন, তাই ভাগনের বাড়ি যাতায়াত বন্ধ করে দিয়েছিলেন। কৃতকর্মের জন্য তিনি সরকারের কাছ থেকে খানবাহাদুর খেতাব পেলে, অন্য আত্মীয়স্বজনেরা তাঁকে অভিনন্দন জানাতে গেলেও শেখসাহেব যাননি। এই সর্বজনশ্রদ্ধেয় শেখসাহেবের অকালমৃত্যু হলো। বিবিসাহেবার বয়স কম, ছেলেমেয়েরা পড়াশুনো করছে। সংসারের কর্তৃত্ব এসে পড়ল ভাগনে তথা

জামাই আখতার হোসেনের উপর। শেখসাহেবের বাড়ির চৌহদ্দির একাংশে নিজের বাড়ি বানিয়েছিলেন তিনি। সেই বাড়িতে মক্কেলদের সঙ্গে ওকালতির কাজ করতেন, বাকি সবকিছুই শেখসাহেবের বাড়িতে। আখতার হোসেনও শেখসাহেবের মতো খেলাফত ও স্বাধীনতা আন্দোলনের দ্বারা আকৃষ্ট হয়েছিলেন। পরে তিনি হয়ে ওঠেন ওই অঞ্চলে কংগ্রেসের অন্যতম প্রধান নেতা।

নেহরু রিপোর্ট প্রকাশের পর থেকে কংগ্রেসের সঙ্গে মুসলমানদের দূরত্ব বেড়ে গেল আর প্রাণপ্রতিষ্ঠা হলো মুসলিম লীগের। সুচতুর সুবিধাবাদী নেতারা মুসলমানদের মাথায় এই চিন্তা ঢুকিয়ে দিল যে সাত শো বছর যারা রাজত্ব করেছে কংগ্রেস সেই মুসলমানদের হিন্দুর গোলাম বানাতে চায়। কংগ্রেসের মুসলমান নেতাদের প্রতিপত্তি মুসলমানপ্রধান এলাকাতে দ্রুত কমতে লাগল। দশ বছরের মধ্যে দেশে দুটো রাজনৈতিক মঞ্চ তৈরি হয়ে গেল। আখতার হোসেন কংগ্রেসের নেতা আর শেখসাহেবের মেজ ছেলে আসগার হোসেন ইংরেজপ্রেমী দাদাশ্বশুরের প্রভাবে হয়ে উঠলেন লীগের সমর্থক। তিনি তাঁর প্রাক্তন সহপাঠী যিনি বর্তমানে লীগনেতা, তার জন্য বিন হাউসে আড়ম্বরপূর্ণ সংবর্ধনার আয়োজন করেন। বাড়ি মুসলিম লীগ ও পাকিস্তানের জয়ধ্বনিতে, কংগ্রেস ও গান্ধিজির মুর্দাবাদ ধ্বনিতে মুখর হয়। খদ্দরের কুর্তা-পায়জামা-টুপিতে আখতার হোসেন সেই বাড়িতে বিচ্ছিন্ন বোধ করেন। আসগার হোসেন লীগে যোগ দিয়ে জেলাস্তরের নেতা হয়ে ওঠেন। বাড়ি এখন লীগ-সমর্থকদের ভিড়ে জমজমাট। বাড়িতে কংগ্রেসীদের সমাবেশ কমে যাচ্ছিল। স্যুটকেস তৈরিই থাকত, আখতার হোসেন প্রায়ই জেলে যেতেন। আর আসগার বিবিসাহেবার কাছে অনুযোগ করতেন, 'ভাইজান কেন প্রকাশ্যে ইংরেজ সরকারবাহাদুরের শত্রু হয়ে উঠছেন?' দুই নিকট আত্মীয়ের মধ্যে এখন সৌজন্য-বিনিময় ছাড়া কোনও সংযোগ নেই। সর্বংসহা বিবিসাহেবা যেন ভারতবর্ষের প্রতীক, আর বিন হাউসের ভাঙনের মধ্যে যেন আসন্ন ভারতভাগের পূর্বাভাস। নির্বাচন এলে কংগ্রেস ও লীগ দুই পক্ষই প্রার্থী করে মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষকে, যেহেতু এলাকাটি মুসলমান প্রধান। এতদিনকার কংগ্রেস এলাকায় লীগ জিততে মরিয়া। পরিস্থিতি এমন হলো যে প্রার্থী মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও কংগ্রেসনেতা ও কর্মীদের নিয়ে আখতার হোসেন শুধুমাত্র হিন্দু এলাকায় যেতে পারতেন আর মুসলমান এলাকায় গেলে আক্রান্ত হতেন। নির্বাচনে মুসলিম লীগ জয়ী হলো। হিন্দু মহাসভার দ্বিতীয় স্থান, কংগ্রেসের তৃতীয় স্থান। লীগ উৎসবে মাতোয়ারা, বিন হাউসের পরিস্থিতিতে আখতার হোসেন আরও অন্তর্মুখী হয়ে গেলেন।

বিবিসাহেবার নির্বন্ধে আখতার হোসেন দ্বিধা সত্ত্বেও জমিদারি দেখাশোনার দায়িত্ব পালন করছিলেন। শেখসাহেবের মতো আখতারও ছিলেন আদর্শ জমিদার। তাঁর প্রভাবে সমস্ত এলাকা স্বাধীনতা আন্দোলনে যেন সমর্পিত ছিল। এই এলাকার মানুষ

মুসলিম লীগ বা হিন্দু মহাসভাকে এই অঞ্চলে নাক গলাতে দেয়নি এতোদিন। কিন্তু ভোটের সময় থেকে পরিবেশ বিষাক্ত হয়ে গেল। পাঞ্জাব-বাংলার দাঙ্গার খবর ছড়িয়ে পড়ছিল। লীগ মুসলমানদের পাকিস্তানের স্বপ্ন দেখিয়েছে। দেশভাগের আগে বিহারের মুসলিম লীগ নেতৃত্ব দাবি করছিল হিন্দুস্থানের অন্তর্গত বিহারে একটা এলাকা চাই যেখানে একটা 'independent homeland' গড়ে উঠবে, যেখানে বিহারের মুসলমানেরা একত্রিত হতে পারবে। তাদের তরফে আর একটা দাবি উঠছিল বিহারের মুসলমান-প্রধান পুর্ণিয়া, উত্তর ভাগলপুর, উত্তর মুঙ্গের জেলা বাংলার সঙ্গে জুড়ে দেবার, এই আশায় যে গোটা বাংলাই পাকিস্তানের অন্তর্গত হবে। হিন্দুদের মধ্যেও সাম্প্রদায়িক মনোভাব তীব্র থেকে তীব্রতর হচ্ছিল। কলকাতায় দাঙ্গা লাগল এবং নোয়াখালিতে। শোকার্ত গান্ধিজি দেওয়ালি পালন না করবার আবেদন জানালেন। বিহারের গ্রামে-গ্রামে সাংকেতিক ভাষায় চিরকুট বিলি হচ্ছিল, দাঙ্গা বাধানোর জন্যেই নাকি এই চিরকুট বিলি। এই কাজের সঙ্গে কংগ্রেসের কোন-কোন নেতার যোগসাজশের খবর মিলছিল। জমিদারেরা দাঙ্গায় বড়ো ভূমিকা নিয়েছিল। এক গ্রামের লোক অন্য গ্রামে গিয়ে হানা দিচ্ছিল। মদ খাইয়ে হরিজনদের হত্যায় লুঠে প্ররোচিত করা হচ্ছিল। উৎকণ্ঠিত আখতার পাটনায় গিয়ে গান্ধিজির অনুগামীদের সঙ্গে ও প্রশাসনিক কর্তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করলেন। সাম্প্রদায়িক প্রীতির শপথ নেওয়ান হল জনসভায়, কিন্তু দাঙ্গা থামান গেল না। শত-শত মানুষ হতাহত হলো, বাড়িঘর জ্বালিয়ে দেওয়া হলো আগুন লাগিয়ে। বাস্তুচ্যুত গাঁয়ের মানুষ বিহার শরিফে আসতে লাগল। স্টেশন মসজিদ মাদ্রাসা দরগা ভরে গেল উদ্বাস্তুতে। উদ্ভ্রান্ত আখতার সেবার কাজে, দাঙ্গা বিধ্বস্ত এলাকায় শান্তি ফেরানোর কাজে ছুটে বেড়াতে লাগলেন। আজাদসাহেবের শিষ্য, আখতার হোসেনের সুহৃৎ, বিখ্যাত কংগ্রেস নেতা মৌলানা আইয়ুব আনসারি, কারো কথা না শুনে একা দাঙ্গা-পর্যুদস্ত বেলছিতে যান। এই অজাতশত্রু মানুষের বিশ্বাস তাঁর কেশাগ্র কেউ স্পর্শ করবে না। কিন্তু জনপিণ্ডের কোন বিচার-বিবেক থাকে না। বর্বর দাঙ্গাকারীরা তাঁকে হত্যা করে, তাঁর মৃতদেহ পর্যন্ত লোপাট করে দেয়। আখতার হোসেন পরিদর্শনে বেরিয়ে দেখলেন পাড়ার পর পাড়া উজাড়। 'জনশূন্য এলাকা তার স্তব্ধতার ভাষা দিয়ে নিশ্চিহ্ন হবার কথা জানাচ্ছিল।' জখম মানুষ চিকিৎসার সুযোগ পায়নি, এখানে-ওখানে লাশ। বেশ কিছুদিন আগে থেকে রাতে ঝনঝনাৎ আওয়াজ আর জয় বজরংবলী ধ্বনি শুনছিল মানুষেরা। আক্রান্ত পুরুষেরা একত্র হয়ে প্রতিরোধের জন্য, মৃত্যুর জন্য তৈরি হচ্ছিল। আর পাঞ্জাবের কিংবদন্তী হয়ে যাওয়া থোয়াখালসার শিখ রমণীদের মতো বিহারেও মুসলমান 'মেয়েদের কুয়োয় গণঝাঁপ দিতে বলা হলো। সম্ভ্রমের বিনিময়ে এই মৃত্যুকে তারা মেনে নিল।' ডিমওয়ালি ফুপু বিবিসাহেবার বাড়িতে ডিম দিয়ে যেত, দুদণ্ড বসে অনেক গল্প করে যেত। তার প্রাণধারণের উপায় মুরগিদের বাঁচাতে গিয়ে সে ঘর

ছেড়ে বেরোতে পারেনি, মুরগিদের সঙ্গে একত্রে ঘরে পুড়িয়ে মারা হয় তাকে। সেই শোকে বিবিসাহেবা মুহ্যমান। জলের দরে জমি বেচে গ্রামের মানুষ শহরের নিরাপত্তায় যেতে চায়, শহরেও তাদের কোনও নিরাপত্তা নেই। যেমন পূর্ব বাংলায় হিন্দুদের, তেমনি বিহার-প্রদেশে মুসলমানদের পায়ের তলার মাটি আলগা হয়ে গিয়েছিল।

গান্ধিজির ও কংগ্রেসের উদ্বাস্তুদের গ্রামে ফেরানোর উদ্যোগ বিফলে গেল। লীগ ছিন্নমূল স্বজনহারা মানুষদের বোঝাল তাদের আত্মদানে পাকিস্তান ত্বরান্বিত হবে। তারা ইন্‌শা আল্লাহ্ নতুন দেশের স্বপ্নের দেশের নাগরিক হবে। একদিকে পাকিস্তানের স্বপ্ন, অন্যদিকে পাঞ্জাবের ও বিহারের অন্যান্য অঞ্চলের দাঙ্গার খবর উপদ্রুত মানুষকে প্ররোচিত করল লীগের কথা মেনে নিতে। এদিকে ক্রিপস মিশন, ক্যাবিনেট মিশন এল আর গেল। গান্ধিজি বলেছিলেন দেশভাগ মানবেন না, লীগ বলেছিল পাকিস্তান কেউ রুখতে পারবে না। মুসলমানেরা সাতশো বছর ভারত শাসন করেছে, তারা হিন্দুর গোলাম হতে পারে না। তাঁর স্ত্রীর দুঃখ হিন্দুপ্রীতির জন্য স্বামী আখতার হোসেন আজ সবার বিরাগ-ভাজন। বিবিসাহেবা তাঁর সরলতায় লীগপন্থী আসগার আর কংগ্রেসপন্থী আখতার, দুজনের প্রতি সমান আস্থাবতী। যে পাকিস্তান তাঁর শবদেহের উপর দিয়ে হবে বলেছিলেন গান্ধিজি, সেই পাকিস্তান হলো। তখন তিনি বললেন, এই হওয়াটা অনিবার্য ছিল। আখতার হোসেনের মতো কংগ্রেসী মুসলমান, যাদের জাতীয়তাবাদী মুসলমান বলা হতো, আজ তাঁরা চূড়ান্ত হতাশ আর একেবারে পরাস্ত।

পাকিস্তান কায়েম হতেই আসগার হোসেন সেখানে চলে যান। যাবার আগে আখতারের সঙ্গে দেখা করতে গেলে তাঁকে শুভেচ্ছা জানান তিনি, আর 'তাঁর চোখের সামনে শুধু আসগার হোসেন ছিলেন না, অগণিত মুসলমান ভেসে উঠছিল যারা জায়গাজমি সম্পত্তি নানান জিনিসপত্র বিক্রি করে পাকিস্তান চলে যাচ্ছে।' স্থির হলো বড়ো ভাই সরোয়ার হোসেন পরে পাকিস্তান যাবে আসগার গুছিয়ে বসলে। বিবিসাহেবার সংসার ভেঙে যায়, আপাতত ভারতবর্ষ দুটো রাষ্ট্রে বিভক্ত হয়। অবস্থাপন্নরা চলে গেল, কিন্তু বহু খেটে খাওয়া মানুষ, যারা লীগের সমর্থক ছিল দেশভাগের আগে, তারা থেকে যেতে বাধ্য হলো। তাদের পাকিস্তানি বলে গালি দেওয়া হয়, তাদের শুনতে হচ্ছে মুসলমানেরা বিশ্বাসঘাতক। তারা পাকিস্তান চেয়েছিল, পাকিস্তান হবার পরে তারা এদেশে থেকে যাচ্ছে কেন? 'ভয়ের ব্যাধি তাদের মধ্যে শুধু সংক্রামিতই হচ্ছিল না, স্থায়ীভাবে গেড়ে বসেছিল দিনের পর দিন।' জীবিকার ক্ষেত্রে নাজেহাল হয়ে যারা থেকে গিয়েছিল তারাও পাকিস্তানে চলে যাবার কথা ভাবত। জমিদারি প্রথা রদ হওয়াতেও অনেক সম্পন্ন মুসলমান ক্ষতিগ্রস্ত হয়। জমিদারি ছিল তাদের সম্মান আর গ্রাসাচ্ছদনের উপায়। অন্য কোন কাজ তারা না জানায়, তাদের অবস্থান অনিশ্চিত হয়ে গেল। কিন্তু পাসপোর্ট-ভিসা চালু হবার পর বৈধভাবে পাকিস্তানে যাওয়া কঠিন হয়ে গিয়েছিল। বরং ঘাড়ধাক্কা পাসপোর্টে পূর্ব

পাকিস্তানে যাওয়া সহজ ছিল। দেশভাগ হবার সময় বাঙালি মুসলমানের সঙ্গে বহু অবাঙালি মুসলমান, বিহারের মুসলমান পূর্ব পাকিস্তান অর্থাৎ পুব বাংলায় চলে গিয়েছিল। সেখানে চাকরি জোগাড়ও সহজ। অলস বাঙালির চেয়ে শ্রমশীল বিহারিকেই নাকি নিয়োগকর্তাদের পছন্দ।

করাচিতে আসগার হোসেন জমিয়ে বসলেও, সরোয়ার হোসেন সেখানে গিয়ে ভালো নেই। পাকিস্তানে সবকিছুতে স্থানীয়দের অগ্রাধিকার, বাকি যা থাকছে পাঞ্জাবিরা কবজা করছে। সরোয়ারের খবরে দুঃখিত বিবিসাহেবা তাঁকে চলে আসতে পরামর্শ দেন। সরোয়ার দ্বিতীয় বিয়ের অন্যায়ের জন্য বিবিসাহেবার মার্জনা চায়, কিন্তু জানায় সে যেহেতু আজ অন্য দেশের নাগরিক সেইজন্য সে চিরকালের জন্য চলে আসতে পারবে না। বিবিসাহেবা অবস্থাটা বুঝতে পারেন না। সরোয়ারের বাড়ি এখানে, এই মাটিতে তার পূর্বপুরুষের কবর, সে কেন এখানে থাকতে পারবে না। তাঁর স্বামী শেখ সাহেব বেঁচে থাকলে তিনি হয়তো পাকিস্তান হতে দিতেন, কিন্তু তাকে কিছুতেই বিদেশ হতে দিতেন না! সরোয়ার এসে জমি বেচে টাকা নিয়ে যেতে চায়। বিবিসাহেবার সায় নেই, কারণ জমিবেচা অসম্মানের কাজ। সরোয়ার বলে জমি রাখা যাবে না, হিন্দু সরকার ছোটলোকদের মাথায় তুলছে। ছোটলোকরা একদিন সরকারও দখল করে নেবে। উত্তরে বিবিসাহেবার দার্শনিক বক্তব্য, 'কাল যখন পাশ ফিরে শোয় তো ছোট-ছোট পাথর উপরে উঠে যায়, আর বড়ো-বড়ো পাথরগুলো নীচে থেকে যায়।'

ছেলে হামিদ বাবা আখতার হোসেনের উপর খুব ক্ষুব্ধ। আখতার হোসেন উপমন্ত্রী হয়েছেন, কিন্তু বি. এ. পাশ ছেলের জন্য চাকরির ব্যবস্থা করছেন না। অথচ সে দেখছে সুপারিশের জোরে কতোজনের চাকরি হয়ে যাচ্ছে। হামিদ বিবিসাহেবাকে বলে, সেও পাকিস্তান চলে যাবে। বিবিসাহেবা ভয় পেয়ে যান, 'আল্লার নামে পাকিস্তান শব্দটা মুখে আনবে না। আরে ভাই তুমি জান না, পাকিস্তানে আমি কতোকিছু খুইয়েছি।' বাড়ির একদা দাসীর ছেলে চামু, এখন কলকাতাবাসী হয়ে দারুণ করিতকর্মা হয়েছে। সে দায়িত্ব নেয় গলাধাক্কা পাসপোর্টের মাধ্যমে হামিদকে পূর্ব পাকিস্তানে পাঠিয়ে দেবার। চামুমামা পাঠিয়েও দেয় হামিদকে। উপন্যাসের হামিদ সহজেই চলে যায়, কিন্তু বিহারের উৎখাত মুসলমানেরা পূর্ব পাকিস্তানে পুনর্বাসিত হবে এটা মেনে নিতে পূর্ব পাকিস্তান সরকার খানিকটা দ্বিধান্বিত ছিল। তাতে উদ্বাস্তু অবাঙালি মুসলমানেরা আহত হয়। বিহারি শহিদদের রক্তে পাকিস্তানের ভিত্তিপ্রস্তর গড়ে উঠেছে, আর তাদেরই কিনা ভুলে যাওয়া হচ্ছে! পুনর্বাসিত হতে গিয়ে তাদের দালালের হাতে হেনস্থা হতে হচ্ছে, বাঙালি প্রাদেশিকতার মুখোমুখি হতে হচ্ছে। আর তাই জিন্নাহ্‌কে বলতে হচ্ছে নতুন পাকিস্তানি রাষ্ট্র সব মুসলমানের—'It does not belong to a Punjabi, or a Sindhi, or a Pathan or a Bengalee...' উপন্যাসের দ্বিতীয় অংশের আখ্যান

হামিদকে কেন্দ্র করে। এইভাবে বিবিসাহেবার সংসার ভেঙে ভাঙা উপমহাদেশের তিনভাগে ছড়িয়ে পড়ে। পূর্ব পাকিস্তানে গিয়ে 'হামিদ অন্য দেশের শীতল বাতাস বুকের ভেতর ঢুকিয়ে নেয়।' উম্-এ-উম্মারার গল্পের কথকনারীও বিহার থেকে পূর্ব পাকিস্তানে গিয়ে রাস্তায় একলা হাঁটতে-হাঁটতে প্রথম স্বাধীনতার স্বাদ পেয়েছিল। চামুর বড়ো সম্বন্ধী বদরুল ইসলামের বাড়িতে ওঠে হামিদ, তিনিই হামিদের চাকরি জুটিয়ে দেন আদমজি জুট মিলে। বিহারি মুসলমানেরা বাঙালিদের কুঁড়ে, আরামপ্রিয় মনে করে। মনে করে এরা নামেই মুসলমান, আচার-আচরণ আদতে হিন্দুদের মতো। পাকিস্তানের নাম এরা নেয় না, সব সময় বাংলা-বাংলা করছে। জনৈক আজিমুদ্দিন মনে করে, অলস বাঙালিদের পাকিস্তানে থাকতে দিয়ে জিন্নাহ্সাহেব খুব ভুল করেছেন। বাঙালিদের বিশ্বাস করা উচিত নয়, এদের শরীরে হিন্দুর রক্ত বহমান। মেরে-মেরে এদের ইসলামি সবক শেখানো উচিত। বাঙালিরা রাষ্ট্রভাষা উর্দুকে ঘৃণা করে। ক্ষমতা থাকলে এই নামে-মুসলমান বাঙালিরা একদিন কোরাণশরিফও বাংলায় পড়তে শুরু করবে। হামিদ অন্যদের সঙ্গে তর্কের সময় বাঙালিপক্ষ নেবার চেষ্টা করে হার মানে।

ওদিকে বিহারেও তুচ্ছ উপলক্ষে সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি তীব্র হয়ে ওঠে। মিটমাট করা হয়, কিন্তু কতোদিন সম্প্রীতি টিকবে তাই নিয়ে আখতার হোসেনের মনে সংশয় জন্মায়। পূর্ব পাকিস্তান থেকে হিন্দুরা উন্মূলিত হয়ে চলে এসেছে। তার প্রতিক্রিয়ায় কলকাতায়, রাউরকেল্লায়, জামশেদপুর, রাঁচিতে দাঙ্গা বাধে। বিহারশরিফেও সন্ত্রস্ত পরিবেশ, কারণ এখানকার অনেক মানুষ ওইসব শহরে কাজ করে। এই আতঙ্কের পরিস্থিতিতে বিবিসাহেবার বারণ না শুনে আখতার হোসেন বিন গাঁয়ে চলেছেন। বাসে যাচ্ছেন, 'বাসে নীরবতা নিরবচ্ছিন্ন ছিল। কিন্তু সেই নৈঃশব্দ আর্তনাদের মতো শোনাচ্ছিল। আখতার হোসেনের মতো মিতভাষী মানুষের পক্ষেও সেই নৈঃশব্দের আর্তনাদ কানের পর্দা ফাটিয়ে দিচ্ছিল।' সহযাত্রীদের সঙ্গে আলাপে বোঝেন তিনি মুসলমানদের বিরুদ্ধে অনেক অভিযোগ—যখন চায় পাকিস্তানে চলে যায়, পালাবার জন্য পাকিস্তান তৈরি করেছে। এদিকে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনার ফলে মুসলমান যুবকেরা পাকিস্তান চলে গেলে একটা প্রজন্ম দেশ থেকে নিরুদ্দিষ্ট হয়ে যাবে, এই সমস্যা বোঝাতে গেলে আখতার হোসেন উত্তরে শোনেন—চাকরি মেলে না, যদিবা মেলে কেড়ে নেওয়া হয়, ব্যাবসা-জমি থেকে বঞ্চিত তারা, পাকিস্তান না গিয়ে কী করবে? ১৯৬৫ সালের ভারত-পাক যুদ্ধের পর চিঠিপত্র আদানপ্রদান একেবারে বন্ধ হয়ে গেল, বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল পাকিস্তানে চলে যাওয়া আত্মীয়-স্বজনেরা। মুসলমানদের পাকিস্তানের এজেন্ট বলা হয়। এতোদিনের প্রবীণ জাতীয়তাবাদী কংগ্রেসী আখতার, তার বাড়িতেও পুলিশ তল্লাশি চালায়। অযোধ্যাবাবুর মতো বন্ধুরা এই ঘটনায় ক্রুদ্ধ হলেন, মুখ্যমন্ত্রী দুঃখ প্রকাশ করলেন। কিন্তু বহু বছর ধরে দেশপ্রেম আর আদর্শ দিয়ে

সাজানো মহিমা ধুলোয় লুটিয়ে পড়ল। অন্তর্মুখী আখতার হোসেন বাড়ির বাইরে বেরোন বন্ধ করে দিলেন।

কলকাতায়, জামশেদপুরের ইস্পাত কারখানায়, রাঁচির হাটিয়া কারখানায় দাঙ্গার ফলে বহু বিহারি মুসলমান উদ্বাস্তু হয়ে পূর্ব পাকিস্তানে চলে আসে এবং ছড়িয়ে পড়ে সেই দেশের নানা শহরে। দেশভাগের পরিণামের নতুন এক অধ্যায় শুরু হয়ে যায়। ঢাকা, কুমিল্লা, রংপুর, সঈদপুর, খুলনা, চট্টগ্রামে গড়ে ওঠে শরণার্থী শিবির। তাদের জন্য চাঁদা তোলা হচ্ছে। ইতিমধ্যে বদরুলের মেয়ে নাজিয়ার সঙ্গে হামিদের বিয়ে হয়ে যায়। শরণার্থীদের ত্রাণের জন্য কমিটির সক্রিয় সদস্য হামিদ। কিন্তু কিছু মেকি শরণার্থীও ভারত থেকে চলে এসেছে। এখানে সুযোগের আশায় শরণার্থী সেজে চলে এসেছে। দাঙ্গায় ক্ষতিগ্রস্ত বলে গল্প বানিয়েছে। কিছুদিন পরে পূর্ব পাকিস্তানে নতুন উত্তেজনা দেখা দিল। পূর্ব পাকিস্তানের জনসংখ্যা বেশি হলেও, রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ছিল এতোদিন পশ্চিম পাকিস্তানীদের হাতে। এবারের নির্বাচনে বাঙালিদের হাতে ক্ষমতা আসবার সম্ভাবনা দেখা দিল। এমন অবস্থায় বিহার থেকে আগত উদ্বাস্তুদের মধ্যে রটানো হলো, ক্ষমতায় এলে বাঙালিরা তাদের তাড়াবে। বিহারিরাও বাঙালিতে আপন মনে করেনি। পাকিস্তানী সৈন্যবাহিনী যখন পুব বাংলায় আক্রমণ ও গণহত্যা শুরু করে, তখন অনেক বিহারি শরণার্থী তাদের সাহায্যও করে। ফলে বাঙালিদের চোখে এই উর্দুভাষী বিহারি মুসলমানরা হয়ে ওঠে পাকিস্তানি সৈন্যবাহিনীর 'stooges' এবং 'collaborators.' 'স্থায়ী বাসিন্দা আর শরণার্থীদের মধ্যে বিভেদ ভয়ানক সত্যের চেহারায় বেরিয়ে পড়ল।' আদমজি জুট মিল বাঙালিরা আক্রমণ করায় অনেক উদ্বাস্তু বিহারির মৃত্যু হয়। রেল, ব্যাংক, সরকারি দপ্তরের উচ্চপদস্থ বিহারিদের খুন করা হলো। ওদিকে সৈন্যরাও বাঙালিদের উপর অত্যাচার চালিয়ে যাচ্ছে। উৎপীড়িত মানুষ ভারতে পালাচ্ছে। আদমজি জুট মিল বন্ধ হয়ে যাওয়ায় হামিদ কর্মহীন। বদরুল ইসলামের উভয়সংকট, মিলিটারির কালো তালিকায় তাঁর নাম, আবার জামাই বিহারি বলে বাঙালিরা তাঁকে বিদ্রূপ করে। সৈন্যদের হাতে তিনি সস্ত্রীক গ্রেপ্তার হয়ে যান। পরে মুক্তিবাহিনীর লোকেরা এসে সন্তানসহ হামিদ আর নাজিয়াকে ধরে নিয়ে যায়। মুক্তিবাহিনীর হাতে বন্দী বহু বিহারি ও অন্য পাকিস্তানিরা। 'জয় বাংলা' ধ্বনি ওঠে, আর বাছা-বাছা বন্দীদের নিয়ে গিয়ে হত্যা করা হয়। লোপাট হয়ে যাচ্ছিল যুবতীরা। পাক-সেনাদের নিষ্ঠুরতায় অজস্র বাঙালিদের মৃত্যু ঘটেছে, এক কোটি বাঙালি হয়েছে ছিন্নমূল। আবার বাঙালিদের হাতে অনেক বিহারির মৃত্যু হয়েছে, হাজার হাজার বিহারি প্রাণভয়ে ভারতে পালিয়ে এসেছে। যেমন পাক-সেনা তেমনি মুক্তিবাহিনী নিষ্পাপ সরল মানুষদের রক্তে হোলি খেলছে। একপক্ষের নিষ্ঠুরতার প্রতিশোধ নিয়েছে অন্যপক্ষ সমান নিষ্ঠুরতায়।

চামুমামার দৌলতে মুক্তিবাহিনীর হাতে ধরা পড়েও হামিদ সপরিবারে সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে আসতে পারে। হামিদ কলকাতা ছেড়ে বিহারশরিফ যেতে চায়।

পাকিস্তান থেকে পলাতক জানলে সমূহ বিপদ। আত্মীয়-স্বজনও পুলিশকে খবর দিয়ে দেয়, পাছে ছিন্নমূলরা এখানে এসে আবার সম্পত্তির ভাগ চায়। দ্বিতীয়বার উদ্বাস্তু বিহারিরা লুকিয়ে বেড়াচ্ছে, তাদের আশ্রয় দেবার কেউ নেই। বাংলাদেশে ফেরার পথ বন্ধ, ভারতে থাকতে পারবে না, অবশিষ্ট-পাকিস্তানেই যেতে হবে তাদের। বিহারি শরণার্থীদের জন্য ভারতবর্ষে কারো স্নিগ্ধ মনোভাব নেই। তাদের সবাইকে মনে করা হয় পাকিস্তান সরকারের সগোত্র আর চর। হামিদ বিহার শরিফে এলে বাবা আখতার হোসেন আর দাদিমা বিবিসাহেবা তাকে আলিঙ্গন করেন। পাকিস্তান থেকে এসেছে জেনে বিবিসাহেবা জানতে চান সে কেন মামাকে সঙ্গে আনেনি? হামিদ জানায় মামা থাকেন পশ্চিম পাকিস্তানে আর সে এসেছে পূর্ব পাকিস্তান থেকে। বিবিসাহেবা হতবাক, কতোগুলো পাকিস্তান হয়েছে! তিনি পাকিস্তানকে গালি দেন, সে তাঁর ছেলেদের হরণ করেছে। পরমুহূর্তেই তিনি পাকিস্তানকে আশীর্বাদ করেন, কারণ সেখানেই তাঁর প্রয়াত বড়ো ছেলে সরোয়ার মাটি নিয়েছে। ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের সময় বিবিসাহেবার অবস্থা পাগলের মতো, কখনো তিনি ভারতের জয় কামনা করেন, কখনো পাকিস্তানের। হামিদের মায়ের মৃত্যু হয়। মেয়ের মৃত্যুর খবর না জানানো হলেও বিবিসাহেবা তার অনুপস্থিতি টের পেয়ে যান। তিনি প্রশ্ন করেন, 'তাকে পাকিস্তান নিয়ে চলে যায়নি তো?' তিনি হাত জোড় করে পাকিস্তানের উদ্দেশে বলেন, 'রে পাকিস্তান, এখন আমার পেছন ছাড়, আমি তোর কোনো ক্ষতি করিনি, কোন্ অপরাধে আমাকে শাস্তি দিচ্ছিস, পাকিস্তান, ও পাকিস্তান।'

যুদ্ধের সময় ভারতের বিহারিরা, তাদের আনুগত্যে সন্দেহ হতে পারে জেনেও, রেডিয়ো পাকিস্তান শুনতো। তারা আশা করতো মার্কিন সপ্তম নৌবহর আর চিনের মদতে পাকিস্তান জিতবে। কারণ পাকিস্তান হারার অর্থ বাংলাদেশের লক্ষ-লক্ষ জাতভাই বিহারির মৃত্যু। সেটা মানতে মন চাইত না তাদের। পাকিস্তানি সেনা আত্মসমর্পণ করলে মুহ্যমান বিহারের মুসলমানেরা। 'জয়ীরাও মুসলমান, পরাজিতরাও মুসলমান।' 'মুসলমানদের চোদ্দ শো বছরের ইতিহাস এটা সাক্ষ্য দেয় যে অবশ্যই তারা পরাজিত হয়েছে, কিন্তু এতো সেনা নিয়ে আত্মসমর্পণ কখনো তারা করেনি।' গ্লানি, নীরবতা, অরন্ধন ঘরে-ঘরে। হামিদের বউ বাঙালি জানলে গোলমাল হতে পারে, তাছাড়া হামিদরা পাকিস্তানের নাগরিক। এখানে তাদের অবস্থান অবৈধ। হামিদের ভাই সাজিদ দাদার সঙ্গে দেখা করতে আসে। সাজিদ বিহার সরকারের উচ্চপদে আসীন। শত্রুদেশের নাগরিক হামিদ অবৈধভাবে এখানে থাকায় সাজিদ আশঙ্কা করে তার বিপদ হতে পারে। এবারেও মঞ্চে নামে চামুমামা, সে বদরুলের ঢাকার বাড়ি বিক্রি করাতে পারে। সেই টাকায় হামিদরা নেপাল হয়ে উড়োজাহাজে চলে যেতে পারে পাকিস্তানের নিরাপত্তায়। হামিদ চলে যেতে পারে, কিন্তু বাংলাদেশে থেকে যায় বহু-বহু বিহারি। করাচিতে হামিদ প্রথমে আশ্রয় নেয় মামা আসগার হোসেনের কাছে। হামিদের স্ত্রী বাঙালি জেনে তিনি যারপরনাই বিরক্ত। তাঁর মতে

ঢাকার বাঙালিরা মুসলমানই নয়। তিনি জানিয়ে দেন, নাজিয়ার নাচগান করা চলবে না—আল্লাসৃষ্ট পাকিস্তানে ওইসব অসৈরণ আচরণ আপত্তিকর। মৃত বড়োভাই সরোয়ারের পরিবারের সঙ্গে আসগারের পরিবারের যোগাযোগ নেই। 'দেশটা ভাগ হতে হতে তিন টুকরো হয়ে গেল। তাতে আমাদের পরিবার ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে।' করাচিতেও মোহাজিরদের সঙ্গে স্থায়ী বাসিন্দাদের সম্পর্ক ভালো নয়। যে-কোন সময়ে উদ্বাস্তুদের মোহাজিরদের সঙ্গে সিন্ধিদের দাঙ্গা বেধে যেতে পারে। হামিদ আবার সঞ্চরমান হয়, চলে যায় আরবে, যেখানে বিলাসিতার অভাব নেই, কিন্তু মানুষের কোনো মূল্য নেই। এই উপমহাদেশ আদম রফতানি করেই চলেছে; হামিদ সেই অজস্র মানুষদের একজন, যারা বিদেশে উপমহাদেশের ডায়াস্পোরা গড়ে চলেছে, স্বেচ্ছায় বা বাধ্যত। 'হে সময়, কোথাও তো থামবে।' সময় থামে না, কিন্তু একটা সময়খণ্ডকে নিয়ে লেখা উপন্যাসকে একটা সময়ে থামিয়ে দিতেই হয়।

হামিদের কাহিনী শেষ হয়, কিন্তু বাংলাদেশের বিহারিদের কাহিনী চলতেই থাকে। পূর্ব পাকিস্তানে পাকিস্তানি সৈন্যবাহিনী হিংস্র আক্রমণে নামে ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ তারিখে। প্রাথমিক লক্ষ্য ছিল আক্রমণের বুদ্ধিজীবীরা, ছাত্রেরা, পরে সব বাঙালি। অগণিত মানুষের মৃত্যু হয়, এক কোটি মানুষ ভারতে চলে আসে, ধর্ষিতা হয় বহু নারী। পাকিস্তানি সৈন্যবাহিনীর অপকর্মে সহযোগিতা করে বাঙালি-অবাঙালি রাজাকার, আল্-বদর্, আল্-শামস্ ইত্যাদি সংগঠন। শহর-গ্রাম ধূলিসাৎ হয়, বিপুল পরিমাণ সম্পদ লুণ্ঠিত হয়, আবার ১৯৭১ সালেই ৩-৪ মার্চ তারিখে চট্টগ্রামে ওয়্যারলেস কলোনিতে বাঙালি জনতা লুঠ, অগ্নিকাণ্ড, হত্যা ও ধর্ষণ চালায়। ফিরোজশাহ কলোনির সাত শো বিহারি বাড়িতে আগুন লাগানো হয়, তিনশো বাসিন্দা পুড়ে মারা যায়। গৃহযুদ্ধের শেষের দিকে বাঙালি দাঙ্গাবাজরা প্রতিশোধ নিতে শুরু করে পাকিস্তানিদের সহযোগীদের, বিশেষ করে বিহারিদের বিরুদ্ধে। মুক্তিবাহিনী ও সশস্ত্র অসামরিক সংগঠনগুলি যুগ্মভাবে প্রতিশোধমূলক আক্রমণে হত্যা করে অনেক বিহারিকে। যতোদিন আওয়ামি লীগ এই হত্যাকাণ্ড বন্ধের নির্দেশ না দেয়, ততোদিন হত্যা চলতেই থাকে। যে বিহারিরা আক্রান্ত হয়েছিল, মারা গিয়েছিল তারা সকলে বাঙালি হত্যার দায়ে দায়ি ছিল না। এই বিহারি জনগোষ্ঠী হিন্দুদের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে ১৯৪৬-৪৭ সালে বিহার ছেড়েছিল; বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পর সেই বিহারি মুসলমানেরা স্বধর্মের পাকিস্তানিদের দ্বারা পরিত্যক্ত হলো, অথবা শিবিরে-শিবিরে অন্তরীণ হয়ে থেকে দশকের পর দশক কালাতিপাত করতে থাকল।

এই শিবিরবাসী মানুষদের কথা লিখেছেন মাইনরিটিস রাইটস্ গ্রুপ ইন্টারন্যাশনালের পক্ষে বেন হুইটেকার *The Biharis in Bangladesh* নামে এগারো নম্বর প্রতিবেদনে। তার থেকে আমরা, বাঙলাদেশ ও পাকিস্তান কোনো দেশেরই নাগরিক নয়, এই ত্রিশঙ্কু মানুষগুলির পরিস্থিতির কথা জানতে পারি।

আড়াই-তিন লক্ষ উর্দুভাষী তথাকথিত বিহারি মুসলমান বা পরিত্যক্ত পাকিস্তানি বাংলাদেশে রয়ে গেছে ছেষট্টিটি শিবিরে আন্তর্জাতিক কৃপার উপর নির্ভর করে অন্তরীণ হয়ে। মুক্তিযুদ্ধের পর যে প্রায় সাড়ে পাঁচ লক্ষ পাকিস্তানি পাকিস্তানে চলে যাবার আবেদন করেছিল, তার মধ্যে প্রায় দেড় লক্ষ জনকে পাকিস্তান গ্রহণ করেছিল। ১৯৯০ সালে পাকিস্তান কথা দিয়েছিল আরও আড়াই লাখ মানুষকে সেই রাষ্ট্র নেবে। কিন্তু পাকিস্তান সেই কথা রাখেনি। আফগান যুদ্ধের পর ত্রিশ লক্ষ আফগান পাকিস্তানের স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে গেছে, ইরাক-কুয়েতি যুদ্ধে উৎখাত তিন লাখ পাকিস্তানিকে পাকিস্তান ফেরত নিয়েছে, কিন্তু পাকিস্তানের জন্য সব-খোয়ানো বাংলাদেশে পরিত্যক্ত বিহারিদের পাকিস্তান ফিরিয়ে নিল না। পাকিস্তান মনে করে এদের ফিরিয়ে নিলে দেশে সামাজিক- রাজনৈতিক উত্তেজনা দেখা দেবে, কেননা এমনিতেই দেশের জনমণ্ডলী বহুধা বিভক্ত। গৃহযুদ্ধের সময় যেহেতু সাধারণভাবে এরা পাকিস্তানিদের পক্ষ সমর্থন করেছিল, তাই তারা বাংলাদেশের মানুষের চোখে শত্রুপক্ষ। এই পরিত্যক্ত অন্তরীণ মানুষগুলির কথা আমরা আরও পড়েছি লোরেন মির্জার প্রবন্ধে। এই বিস্মৃত মানুষগুলি গাদাগাদি করে শিবিরে বাস করে, তাদের শিক্ষা ও চিকিৎসার ব্যবস্থা নেই। ন্যূনতম প্রয়োজন যে জল তার সরবরাহও সামান্য। একটা শিবিরে সাড়ে ছয়শো পরিবারের জন্য দুটোমাত্র কুয়ো। শিবিরের বাসিন্দা বিশ হাজার তরুণী নারীপাচারকারীদের সহজ শিকার। এই শিবিরবদ্ধ মানুষগুলি বছর-বছর মিছিল করছে, বিক্ষোভ দেখিয়ে জেলে যাচ্ছে; সর্বশেষ মিছিল করেছে ১৪ আগস্ট ১৯৭১ তারিখে। তাদের দাবি, হয় পাকিস্তানে ফিরিয়ে নিয়ে যাও, অথবা বাংলাদেশের নাগরিকত্ব দাও। প্রথম প্রজন্মের মানুষেরা এখনও পাকিস্তানে চলে যেতে উৎসুক, তাদের সন্তানেরা কিন্তু দেশ বলতে জন্মাবধি বাংলাদেশকেই জানে। এখানেই তারা থাকতে চায়। বাংলা জবান তাদের আয়ত্ত, তারা অনেকে বাঙালিকে বিয়েও করেছে। যারা ছিল কট্টর পাকিস্তানপন্থী, সত্যকার যুদ্ধপরাধী, তাদেরই হয়তো পাকিস্তান ফিরিয়ে নিয়েছে, সত্যকার আপনার মানুষ মনে করে। কিছু বিহারি পাকিস্তানে নিজেদের উদ্যোগে চলে যেতেও পেরেছিল নেপাল, শ্রীলঙ্কা, মায়ানমার, থাইল্যান্ড হয়ে, যেমন হামিদ গিয়েছিল ভায়া নেপাল। অনেকে সীমান্তের ফাঁকফোকর দিয়ে ঢুকে পড়েছিল ভারতে, যেমন গোড়ায় হামিদও ঢুকেছিল। এই মানুষগুলির অস্তিত্বের দীর্ণতার কথা আমরা পেয়ে যাই প্রফুল্ল রায়ের দু-একটি গল্পে। বিহারের মনপত্থল গাঁয়ের মানুষেরা ১৯৪৬-৪৭ সালের দাঙ্গায় ভারত ছেড়ে পূর্ব পাকিস্তানে চলে গিয়েছিল। বাংলাদেশ রাষ্ট্রের আত্মপ্রকাশের পর তারা সেখানে অবাঞ্ছিত হয়ে যায়। পূর্বপুরুষের ছেড়ে-যাওয়া বিহারে এখন তারা ফিরে আসবার ফিকির খুঁজছে। তারা একসময়ে ছিল ব্রিটিশ ভারতীয়, তারপরে পাকিস্তানি, পরে বাংলাদেশী হতে না পেরে বাংলাদেশ ছেড়ে এসে ভোটার তালিকায় নাম তুলে, রেশনকার্ডের ব্যবস্থা করে আবার ভারতীয়। 'দেশহীন পরিচয়হীন অভিযানকারীর মতো তারা চলেছে একটি স্বদেশের

জন্য, একটি সুনিশ্চিত আইডেনটিটির সন্ধানে।' সেই সন্ধানের গল্প প্রফুল্ল রায়ের 'অনুপ্রবেশ'। যে বিহারিরা থেকে গিয়েছে শিবিরে-শিবিরে তাদের নিয়ে কোনো গল্প-উপন্যাস নেই। এই 'forgotten minority'-র কথা সাহিত্যে অকথিত থেকে গেছে। এই মানুষগুলির বেশিরভাগ পাকিস্তান বাহিনীর সহযোগী হয়ে গণহত্যায় অংশ নেয়নি, এরা বেশির ভাগ নিরপরাধ মানুষ, দুর্বল শ্রেণীর মানুষ।

'মৃত্যু হয়তো মিতালি আনে,' সমর সেন লিখেছিলেন, নোয়াখালির হিন্দু আর বিহারের মুসলমানে।

বাঙলায় বিহারে গড়মুক্তেশ্বরে
বিকলাঙ্গ লাশ কাঁধে
লোক চলে গোরস্থানে
কিম্বা পোড়াবার ঘাটে। (জন্মদিনে)

সব ধর্মীয় গোষ্ঠী, জাতিগোষ্ঠী সকলেই সকলকে আড়চোখে দেখে। সৃষ্টির মনের কথা, কখনো-কখনো মনে হয়, দ্বেষ। এই দ্বেষ-ঘৃণা থেকে হিংসা, জাতিবৈর, দাঙ্গা, রক্তপাত। ভুলে যাই, গোষ্ঠীর ভিতরে থাকে ব্যক্তি, থাকে মানুষ। ভুলে যাই, এক গোষ্ঠীর কিছু মানুষ অন্যায় করলেও সব মানুষ অন্যায় করে না, তাই গোটা গোষ্ঠীর সব মানুষ অন্য গোষ্ঠীর আক্রমণের লক্ষ হতে পারে না। 'মানুষ মেরেছি আমি' অথবা দাঙ্গার দিনে নরহত্যাকালে প্রতিরোধ করিনি, তাই হত মানুষের রক্তে আমার শরীর ভরে গেছে। মুসলমান যখন হত্যা করছে হিন্দুকে, হিন্দু যখন হত্যা করছে মুসলমানকে, শিখ যখন হত্যা করছে মুসলমানকে, হিন্দু বা মুসলমান যখন হত্যা করছে শিখকে, সিন্ধি যখন হত্যা করছে বিহারি মোহাজিরকে, বাংলাদেশে পাঞ্জাবি আর বিহারি যখন হত্যা করেছে বাঙালিকে, আবার বাংলাদেশে বাঙালি যখন হত্যা করছে বিহারিকে, তখন প্রত্যেক ক্ষেত্রে 'মানুষ মেরেছি আমি'। পৃথিবীর পথে পথে নিহত ভ্রাতাদের ভাই আমি। ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার অনর্গল শৃঙ্খলে, এই পাপচক্রে আমিই হত, আমিই হন্তা। সেই পাপের কোন্ কথা সাহিত্য বলবে, আর কোন্ কথা বলা থেকে বিরত থাকবে, তার মধ্যে প্রচ্ছন্ন থাকে গূঢ় রাজনীতি। বিজেতারাই ইতিহাসের প্রণেতা, বিজেতারাই নির্ধারণ করে ইতিহাসের রাজনীতি। সেই রাজনীতির চাপে দেশভাগে পূর্বভারতের উদ্বাস্তু বাঙালিদের কথা সাহিত্যে কিছু বলা হলেও, বিহারিদের কথা বলা হয় না। অথচ সাহিত্য তো স্বভাবত ক্ষমতার প্রতিপক্ষ। ক্ষমতাবান বিজেতার তৈরি ইতিহাসের রাজনীতির চাপে সাহিত্য কেন বোবা হয়ে থাকবে? অথচ উদ্বাস্তু বিহারিদের বিষয়ে সাহিত্য বোবা হয়ে থেকে স্বধর্মভ্রষ্ট হয়।
